জীব-বিজ্ঞান

কুণ্ডু • দাশ • কুণ্ডু

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যনির্ঘণ্ট অনুসারে, উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের **নবম** শ্রেণীর জন্য লিখিত।

জীব-বিজ্ঞান

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীমতী দেবী কুণ্ডু, এম্. এস্-সি.,
গবেষণা-সহায়িকা, ইন্‌স্টিটিউট অফ অপ্‌থ্যাল্‌মোলজি (লণ্ডন);
প্রাক্তন গবেষিকা, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়;
জীব-বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষিকা, বিনোদিনী গার্লস হাই স্কুল এবং
মুরলীধর গার্লস হাই স্কুল।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ, এম্. এস্-সি.,
জীব-বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক, অক্ষয় শিক্ষায়তন, হাওড়া।

শ্রীকল্যাণ কুমার কুণ্ডু, এম্. এস্-সি. (সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত), ডি. ফিল.,
গবেষক, বেডফোর্ড কলেজ (লণ্ডন);
প্রাক্তন গবেষক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়;
প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ।

প্রাপ্তিস্থান:
ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

T

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৬৪
একাদশ সংস্করণ : মার্চ, ১৯৭৩

চিত্রসজ্জা : ডঃ কল্যাণ কুমার কুণ্ডু।
৺মনোমোহন চক্রবর্তী।
শ্রীপরেশ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীসব্যসাচী দাশগুপ্ত।

মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

২০৯-এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীরতিকান্ত ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৭-বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে এইচ. কে. বারিক কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত একাধিক জীব-বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক থাকা সত্ত্বেও আর একটি নূতন সংযোজন হয়ত কিছু কৈফিয়তের দাবি রাখে। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হওয়ার প্রায় সুরু থেকেই নানাভাবে কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। তারই ফলশ্রুতি এই **'জীব-বিজ্ঞান'**।

এই পুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য লেখা হ'লেও যতদূর সম্ভব সর্বাধুনিক স্বীকৃত তথ্য দেওয়ার চেষ্টা আমরা করেছি। বলা বাহুল্য, নির্ভুল তথ্য-পরিবেশনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছি, যতদূর সম্ভব কাছে-পিঠে-দেখা গাছপালা বা জীবজন্তুর উদাহরণ দিয়েছি, অবশ্য অনন্যোপায়ে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। বিজ্ঞানে বহুল ব্যবহৃত ও ভারতে অধুনা প্রচলিত দশমিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরিমাপ দেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলি ধ্রুপদী ধাঁচের হওয়ায় পরিভাষার সঙ্গে তাল রেখে কতকটা বাধ্য হয়েই আমাদের বক্তব্য সাধুভাষায় আশ্রয় নিয়েছে।

পুস্তকের প্রস্তুতির বিভিন্ন ধাপে বহুজনের কাছ থেকে নানাভাবে স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পেয়েছি। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান অংশের পাণ্ডুলিপির কয়েকটি স্থানে পরিকল্পনা দিয়ে ও সংশোধন করে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু সমাজপতি এবং অম্বুজ পাল। প্রাণি-বিজ্ঞান অংশে অনুরূপ সহায়তা করেছেন সর্বশ্রী অমল ভট্টাচার্য, প্রবোধ মাইতি, কেদার বৈদ্য এবং যুধিষ্ঠির চতুর্বেদী। প্রুফ সংশোধনে সহায়তা করেছেন সর্বশ্রী দীপক গুপ্ত, শিবদাস ঘোষ, সুজিত দত্ত এবং কুন্তল চট্টোপাধ্যায়। এঁদের সকলের কাছেই আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ। প্রাণি-বিজ্ঞান অংশে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের সময় শ্রীমতী মঞ্জুষা দাশ তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। কতকগুলি পরিভাষা প্রস্তুতিতে ও শুদ্ধি-বিচারে তাঁর কাছে আমরা ঋণী।

আমাদের অজ্ঞাতসারে হয়ত অনেক ত্রুটি থেকে গেল। সেইজন্য মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী, সহৃদয় ছাত্রছাত্রী তথা সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট থেকে পরিকল্পনা ও তথ্যের ত্রুটি সম্পর্কিত সর্বপ্রকার সমালোচনা আশা রাখি। সর্বমহলে জীব-বিজ্ঞানের সমাদর হবে—এই আশা নিয়েই আমাদের বক্তব্য শেষ করলাম। শুভমিতি।

কলিকাতা,
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৪।

গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'জীব-বিজ্ঞান' প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এই সংস্করণে তথ্যগত ত্রুটি সংশোধনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। কিছু কিছু নূতন ছবিও এই সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। 'অবতরণিকা' অংশটি নূতন করে সাজিয়ে লেখা হয়েছে, বিশেষতঃ উদ্ভিদ ও প্রাণীর তুলনামূলক আলোচনাটি। নির্ভুল তথ্য পরিবেশনার জন্য বহুজনের কাছ থেকে আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি। এঁদের সকলের কাছেই আমরা ঋণী।

পূর্ববর্তী সংস্করণের মতো বর্তমান সংস্করণও মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীমহলে সমাদৃত হবে—এই আশা পোষণ করি।

কলিকাতা,
৭ই জানুয়ারী, ১৯৬৮।

গ্রন্থকার

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

'জীব-বিজ্ঞান' প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশনায় বিলম্ব হওয়ার জন্য আমরা খুব দুঃখিত। প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি একটি পৃথক পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; ভাষা সহজ করার চেষ্টা হয়েছে। এই সংস্করণে অনেকগুলি চিত্র সংশোধিত ও পরিবর্তিত, কয়েকটি নূতন চিত্র এবং প্রাণি-দেহের প্রতিসাম্য নামক অনুচ্ছেদ সংযোজিত হ'ল।

পরিকল্পনায় সাহায্য করেছেন কুরামনোরাজ স্কুলের শিক্ষক শ্রীশশাঙ্কশেখর কর্মকার। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি, বর্তমান সংস্করণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আরও উপযোগী হবে।

কলিকাতা,
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০।

গ্রন্থকার

নবম সংস্করণের ভূমিকা

'জীব-বিজ্ঞান' প্রথম খণ্ডের নবম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এই সংস্করণে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ছাড়া উদ্ভিদ-বিজ্ঞান অংশের অন্য সব পরিচ্ছেদ নূতন করে লেখা হয়েছে। এই অংশের অধিকাংশ ছবিই নূতন। অনেক ছবি সংশোধনও করা হয়েছে। প্রাণি-বিজ্ঞান অংশে অনেকগুলি ছবি বদলে দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী সংস্করণের ত্রুটি-নির্দেশ করেছেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের জীব-বিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ পাল। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি, নবম সংস্করণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আরও উপযোগী হবে।

কলিকাতা,
২১শে মার্চ, ১৯৭২। **গ্রন্থকার**

দশম সংস্করণের ভূমিকা

'জীব-বিজ্ঞান' প্রথম খণ্ডের দশম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এই সংস্করণ নবম সংস্করণের মোটামুটি পুনর্মুদ্রণ—তবে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। অনেকগুলি উদ্ভিদের বিজ্ঞান-সম্মত নাম যোগ করা হয়েছে।

আশা করি, দশম সংস্করণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আরও উপযোগী হবে।

কলিকাতা,
৬ই অক্টোবর, ১৯৭২। **গ্রন্থকার**

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

॥ অবতরণিকা ॥

॥ উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ॥

বিষয় পৃষ্ঠা

GENERAL REMARKS

A. BOTANY :

Course Content	Demonstration	Practical	Field Class
	1. Primarily with specimens —fresh (preferable) or preserved, dry or in liquid, slides through microscope or micro-projector.	Draw and label	When possible—collect and preserve.
		Experiment	
		Record	
	2. Secondarily with—Charts. Models.		
	3. Experiment.		

B. ZOOLOGY :

1. *Excursion & field study.*

   Class IX—Collection of common specimens available in the locality.
   Class X—Collection of common aquatic specimens from pond.
   Class XI—Collection and preservation of the life stages of mosquito and various insects available in the locality.

2. Visit to Entomological laboratory, Bee-keeping and silk producing centres, local Fisheries & Fish-market, local Poultry & Dairy firm.

3. Frequent references are to be made to the human anatomy and functions when dealing with the Vertebrate Specimens.

4. References are to be made about the similarity of structure and function of plants and animals.

SYLLABUS

A. BOTANY :

Course Content	Demonstration	Practical	Field Class
Diversity of Life (in plants) *Habitat, Habit* Distribution on the earth (elementary) aquatic, terrestrial	Charts		Instruction—to preserve specimens (specially in dry condition). Encourage to collect plants or parts of plants from field and to preserve dry.
Different substratum	Charts—Type specimens Protococcus, Spirogyra, Yeast, Mucor (Agaricus) Moss, Fern		
Creeping, climbing (by means of tendril, twining) Erect Herb, Shrub, Tree	Water Lily, Bladderwort		
Duration of life	Jaba (Mango), Pea (Aparajita)		
Autophyte, Heterophyte—Epiphyte, Parasite, Saprophyte, Insectivorous plants. Flowering, Non-flowering.	Cuscuta, Tulsi, Orchid, Grass (Paddy), Cocoanut		
* *Microscope*	Instrument—chart Instruction to—scrape, strip off, cut section of the specimen, examine	Draw Take note, observe and practice.	

Course Content	Demonstration	Practical	Field Class
	through the microscope use, care and precaution.		
Similarity of life in internal structure (in plants) Unicellular plant Multicellular plant	Protococcus, yeast, spirogyra Slide chart	Draw	
* *Unit of life* Cell		Examine under microscope cells of Onion or Tomato or Guava and draw.	
Protoplasm	Movement in a strip of the leaf of Vallisnerie and staminal hair of the filament of Tradescantia.	Draw	
Protoplasmic contents Cytoplasin, Nucleus Plastids Non-protoplasmic cell contents	Chemical test in a test tube	Record	
Vacuole Starch grains	Charts, specimens	Examine under Microscope potato scrapings and section and draw.	
Sugar	Test tube experiment	Record	
Proteid grains	Section endosperm of castor examine under microscope	Draw	

Course Content	Demonstration	Practical	Field Class
Fat and oil	Specimen—Castor	See that the endosperm of the specimens burns when placed over flame. Leaves a greasy mark on paper when rubbed on it.	
Cystolith	Slide chart	Draw	
Raphide	Slide chart	Draw	
Cell wall	Test for cullulose and Lignin	Record	
* *Increase in the number of unit*			
Cell division Broad outlines of Mitosis	Chart, model, slide	Draw	
* *Division of labour* among the units *Tissues* (in plants)			
Meristematic, Permanent, Parenchyma, Collenchyma, Sclerenchyma, Vascular Laticiferous	Slides, charts	Draw	
Tissue system (in plants) in Root, Stem, Leaf	Slides, charts	Draw the systems separately as found in Root Stem and Leaf	

B. ZOOLOGY :

Course Content	Demonstration	Experiment
I. A general survey of the animal kingdom and distinctive external features of the following specimens :— (1) Guinea-pig, (2) Pigeon, (3) Lizard, (4) Toad, (5) Frog, (6) Rohu, (7) Shingi, (8) Magur, (9) Koi, (10) Snail, (11) Spider, (12) Centiped, (13) Cockroach, (14) Prawn, (15) Earthworm, (16) Hydra.	(1) Animal kingdom by charts. (2) *Actual specimens* of the animals mentioned in the course content. (3) Life history of mosquito and butterfly. (4) Drowning experiments with airbreathing fishes.	Collection of animals in the field and grouping them. Culture of mosquito and buttefly.
II. Elementary idea about the habit, habitat and gross external features (detail excluded) with a general idea about their functions of the following :— (1) Earthworm, (2) Cockroach, (3) Prawn (including appendages), (4) Fish (any common bony fish), (5) Toad and frog, (6) Bird, (7) Guinea-pig.	Living specimen, and their locomotion, mentioned in the course content. Gills of a common bony fish.	Examination and sketching of the external features of a toad and a fish.

* *Having regard to the ages of students in a school, teachers in Biology may interchange the topics marked with asterisks in the syllabus of Class IX with that of Class X.*

অবতরণিকা

বস্তুজগতে বৈচিত্র্যের শেষ নাই। নদী স্রোতের টানে বেগে বহিয়া যায়; অটল পাহাড় নির্দিষ্ট স্থানে নিশ্চল; পাখি বায়ুতে স্বচ্ছন্দে উড়িয়া চলে এবং ভূ-সংলগ্ন উদ্ভিদ আমৃত্যু আপন নির্দিষ্ট স্থানে থাকে। বৈচিত্র্যময় বস্তুনিচয়কে অতি সহজে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়ঃ **জড় বস্তু (Non-living objects)** অর্থাৎ যাহাদের জীবন নাই, যেমন—পাহাড়, জল, লোহা, কাচ ইত্যাদি; এবং **সজীব বস্তু (Living objects)** বা **জীব (Organisms)** অর্থাৎ যাহাদের জীবন আছে, যেমন—গাছ, লতা, মাছ, পাখি, গরু, মানুষ প্রভৃতি।

সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of living objects)

সজীব বস্তুর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলিই জীবনের অভিব্যক্তি। নিচে সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হইল।

(১) **আকার ও আয়তন (Shape and size)**—প্রত্যেক সজীব বস্তুর নিজস্ব নির্দিষ্ট আকার ও সীমিত আয়তন থাকে। বট গাছ, ধান গাছ, ব্যাঙ, কেঁচো—ইহাদের সবারই আকার নির্দিষ্ট। ব্যাঙের আকার কখনই কেঁচোর মতো হয় না, সবসময় ব্যাঙের মতোই হয়। আবার, পরিণত বট গাছের আয়তন ধান গাছের মতো নয়; ইঁদুর বড় হইলেও, আয়তনে হাতির মতো হয় না।

(২) **প্রোটোপ্লাজ্‌ম (Protoplasm)**—জীবের দেহ মূলতঃ জেলির মতো ঈষদচ্ছ* (Translucent) একরকম পদার্থ দিয়া গঠিত। ইহাকে **প্রোটোপ্লাজ্‌ম (Protoplasm**; গ্রীক *protos* = প্রথম + *plasma* = আকার) বলে। ইহা কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সাল্‌ফার ও ফস্‌ফরাস নামক মৌলিক পদার্থ দিয়া প্রস্তুত এক অভিনব জৈব যৌগ। প্রোটোপ্লাজ্‌ম-ই জীবনীশক্তির উৎস ও আধার। প্রোটোপ্লাজ্‌মের ধর্মই জীবন। ইহা ছাড়া, জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব।

(৩) **সংগঠন (Organisation)**—সজীব বস্তুমাত্রেই খুব ছোট ছোট প্রকোষ্ঠের মতো একটি অথবা একটির বেশি অংশ দিয়া গঠিত। এই প্রকোষ্ঠগুলি

* যে বস্তুর মধ্য দিয়া অল্প পরিমাণে আলোক যাইতে পারে, তাহাকে ঈষদচ্ছ বলে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না। এইরকম এক-একটি প্রকোষ্ঠকে **কোষ** বা **সেল** (Cell ; ল্যাটিন *cella*=ছোট প্রকোষ্ঠ) বলে। কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজ্‌ম থাকে। কোষই **জীবনের একক** (Unit of life); অর্থাৎ, কোষে সজীব বস্তুর সব ধর্মই থাকে।

উন্নততর জীবের দেহ একের বেশি কোষ দিয়া গঠিত। ইহাদের **বহুকোষী জীব** (Multicellular organisms) বলে। অধিকাংশক্ষেত্রে কোষগুলি বিশেষ রীতিতে সজ্জিত থাকিয়া, **কলা** বা **টিস্যু** (Tissue ; ল্যাটিন *texo*= বয়ন করা), **অঙ্গ** বা **অর্গ্যান** (Organ ; গ্রীক *organon*=যন্ত্র) তথা **অঙ্গ-তন্ত্র** বা **অর্গ্যান সিস্টেম** (Organ system) গঠন করে এবং বিভিন্ন কলা অথবা অঙ্গ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ছন্দোবদ্ধভাবে জীবদেহের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে। অনেক জীবের দেহ একটিমাত্র কোষ দিয়া গঠিত। ইহাদের **এককোষী জীব** (Unicellular organisms) বলে। এককোষী জীবের বিভিন্ন অংশও একইভাবে দেহের বিভিন্ন কাজ করিয়া থাকে।

(৪) **চলন** (Movement)—প্রয়োজনের তাগিদে জীব স্বেচ্ছায় এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় যাইতে পারে, অথবা দেহের অংশবিশেষ নাড়াইতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে **চলন** বা **মুভ্‌মেন্ট** (Movement) বলে। প্রাণী খাদ্যের খোঁজে শত্রু ও প্রতিকূল পরিবেশ হইতে আত্মরক্ষার জন্য অথবা বংশরক্ষার প্রয়োজনে স্থানান্তরে যায়। অধিকাংশ উদ্ভিদ এক স্থানে আবদ্ধ। কিন্তু ইহাদের শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি নড়াচড়া করিতে পারে। কিছুসংখ্যক এককোষী উদ্ভিদ আবার স্থানান্তরে যাইতে পারে। ইহা ছাড়া, প্রোটো-প্লাজ্‌মের মধ্যেও সবসময়ে চলন দেখা যায়।

(৫) **উত্তেজিতা** (Irritability)—উষ্ণতা অথবা আলোকের হ্রাস-বৃদ্ধি, স্পর্শন, আঘাত, রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শ ইত্যাদি পরিবেশের যে অবস্থাগত পার্থক্য জীবদেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহাকে **উদ্দীপক** বা **স্টিমুলাস** (Stimulus) বলে। উদ্দীপক জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহাকে **উত্তেজিত্ব**, **উত্তেজিতা** বা **ইরিট্যাবিলিটি** (Irritability) বলা হয়। জীবদেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তনও জীবদেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আভ্যন্তরীণ অবস্থার এইরকম পরিবর্তনকেও উত্তেজিতা বলে। উত্তেজিতা অর্থাৎ উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্ধকার ঘরের একটি-মাত্র জানালা খুলিয়া, জানালার পাশে টবসমেত একটি সতেজ গাছ রাখিলে,

কয়েক দিন পরে গাছটির শাখা-প্রশাখাগুলিকে জানালার বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া যাইতে দেখা যায়। কেন্নোকে স্পর্শ করিলেই, কুণ্ডলী পাকাইয়া যায়। শামুককে আঘাত করিলে, দেহ খোলকের মধ্যে গুটাইয়া নেয়। গোক্ষুরা সাপ উদ্দীপিত হইলে, ফণা বিস্তার করে। কোনও বস্তু চোখের মধ্যে প্রবেশ করার উপক্রম হইলে, চোখ বন্ধ হইয়া যায়। এগুলি সবই উত্তেজিতার উদাহরণ।

(৬) **বিপাক** (Metabolism)—প্রোটোপ্লাজ্‌মের নানারকম ক্রিয়া-কলাপের বহিঃ-প্রকাশেই জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে সবসময়েই নানা ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। এই সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়াকে একসঙ্গে **বিপাক** বা **মেটাবলিজ্‌ম** (**Metabolism** ; গ্রীক *metabolos* = পরিবর্তনশীল) বলে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য শক্তি প্রয়োজন। একধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যস্থ খাদ্যে স্থৈতিক শক্তি(Potential energy)-রূপে শক্তি জমা হয়। আর একধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ঐ শক্তি গতীয় শক্তি(Kinetic energy)-রূপে বাহির হইয়া, যাবতীয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। প্রথমোক্ত বিক্রিয়াকে **উপচিতি** বা **অ্যানাবলিজ্‌ম** (**Anabolism** ; গ্রীক *ana* = উপরে + *ballo* = নিক্ষেপ করা) এবং শেষোক্ত ধরনের বিক্রিয়াকে **অপচিতি** বা **ক্যাটাবলিজ্‌ম** (**Catabolism** ; গ্রীক *kata* = নিচে + *ballo* = নিক্ষেপ করা) বলা হয়। সুতরাং, উপচিতি এবং অপচিতি নামক দুই ধরনের বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার সমন্বয়ে বিপাক গঠিত। উপচিতির ফলে শক্তি জমা হওয়া ছাড়া, সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত সরল যৌগ পদার্থ হইতে জটিল রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষিত হয়। কাজেই, ইহা গঠন-মূলক (Constructive) প্রক্রিয়া। ইহা দ্বারা সজীব বস্তুর ওজন বাড়ে। আবার, অপচিতির ফলে জটিল যৌগ বিশ্লিষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত সরল যৌগে পরিণত হয় এবং শক্তি বাহির হয়। অপচিতি দ্বারা জীবের ওজন কমিয়া যায়। সুতরাং, ইহা ধ্বংসাত্মক (Destructive) প্রক্রিয়া। উপচিতি এবং অপচিতির অর্থাৎ বিপাকের মাধ্যমে জীবদেহে শক্তির সামঞ্জস্য বজায় থাকে। বিপাক, প্রোটো-প্লাজ্‌ম তথা সজীব বস্তুর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিচে জীবের প্রধান কয়েক রকম বিপাক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

(ক) **পুষ্টি** (Nutrition)—জীবদেহে সৃষ্ট অথবা বাহির হইতে গৃহীত খাদ্যই জীবদেহের সমস্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস। জটিল খাদ্য প্রথমে এক বিশেষ উপায়ে সরল ও তরল খাদ্যে রূপান্তরিত হয়। এই

প্রক্রিয়াকে **পরিপাক** বা **ডিজেশান** (Digestion) বলে। সরল খাদ্য শেষে প্রোটোপ্লাজ্‌মের অংশবিশেষে পরিণত হয়। ইহাকে **আত্তীকরণ** বা **অ্যাসিমিলেশান** (Assimilation ; ল্যাটিন *ad*=তে+*similis*=সদৃশ) বলা হয়। পরিপাক ও আত্তীকরণ পুষ্টির দুইটি বিভিন্ন পর্যায়। পুষ্টির ফলে প্রোটোপ্লাজ্‌মে শক্তি জমা হয় বলিয়া, ইহা উপচিতি প্রক্রিয়া।

(খ) **শ্বসন** (Respiration)—প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যস্থ খাদ্য সচরাচর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ার অর্থাৎ জারণ(Oxidation)-এর ফলে, অথবা, ক্ষেত্র-বিশেষে অক্সিজেন ছাড়াই আপনা-আপনি বিশ্লিষ্ট হয়। ইহা দ্বারা খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তি গতীয় শক্তিরূপে বাহির হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon di-oxide) উৎপন্ন হয়। ইহাকে **শ্বসন** বা **রেস্‌পিরেশান** (Respiration ; ল্যাটিন *re*=পিছন+*spiro*=শ্বাসকর্ম) বলে। আগে বলা হইয়াছে, এই বহির্গত শক্তি প্রোটোপ্লাজ্‌মের নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। শ্বসনের ফলে শক্তি বাহির হয় এবং জটিল রাসায়নিক যৌগ বিশ্লিষ্ট হইয়া সরল যৌগে পরিণত হয়। সুতরাং, ইহা একধরনের অপচিতি।

(গ) **রেচন** (Excretion)—বিপাকের ফলে প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে জল, ইউরিয়া (Urea), ইউরিক অ্যাসিড (Uric acid), অ্যামোনিয়া (Ammonia), কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি ক্ষতিকারক পদার্থ সৃষ্টি হয়। ইহারা জীবের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে লাগে না (অর্থাৎ, বিপাকে অংশগ্রহণ করে না) ; বরঞ্চ বেশিক্ষণ থাকিলে প্রোটোপ্লাজ্‌মের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা দেয়। ইহাদের **রেচন-পদার্থ** (Excretory products) বলে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, জীব রেচন-পদার্থগুলিকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। যে প্রক্রিয়ায় রেচন-পদার্থ প্রোটোপ্লাজ্‌ম তথা জীবদেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহাকে **রেচন** বা **এক্‌স্‌ক্রীশান** (Excretion ; ল্যাটিন *excreno*=পৃথক করা) বলে। রেচন ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া। সুতরাং, ইহাও একধরনের অপচিতি।

(ঘ) **ক্ষরণ** (Secretion)—বিপাকের ফলে কতকগুলি খুব দরকারী পদার্থ সৃষ্টি হয়। যেমন—উৎসেচক বা এন্‌জাইম (Enzymes), খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন (Vitamins), উদ্বোধক বা হর্‌মোন (Hormones) ইত্যাদি। ইহারা শ্বসন প্রভৃতি বিপাকীয় ক্রিয়া (Metabolic activities), বৃদ্ধি এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া (Physiological processes) নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ অথবা

পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহাদের **ক্ষরণ-পদার্থ** (Secretory products) বলে। দুধ, মকরন্দ (Nectar) ইত্যাদিও ক্ষরণ-পদার্থ। যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহে ক্ষরণ-পদার্থ ক্ষরিত হয়, তাহাকে **ক্ষরণ** বা **সিক্রীশান** (Secretion ; ল্যাটিন *secretus* = পৃথক) বলে। ক্ষরণও একরকম অপচিতি।

(৭) **বৃদ্ধি** (Growth)—স্থায়িভাবে আয়তনে বাড়িয়া যাওয়াকে **বৃদ্ধি** (Growth) বলে। পুষ্টির মাধ্যমে জীবদেহ আয়তনে বাড়ে। বিদ্যমান পদার্থের মধ্যে নূতন নূতন সজীব পদার্থ সংযোজনের ফলে জীবের বৃদ্ধি হয়। এইরকম বৃদ্ধিকে **পৃষ্ঠবৃদ্ধি** বা **ইন্‌টুস্‌সাসেপ্‌শান**(Intussusception)-এর দ্বারা বৃদ্ধি বলে।

(৮) **জনন** (Reproduction)—যে প্রক্রিয়ায় জীব আপন দেহাংশ দিয়া নিজের মতো জীব সৃষ্টির মাধ্যমে বংশরক্ষা করে, তাহাকে **জনন** বা **রিপ্রোডাক্‌শান** (Reproduction) বলে। জনন জীবের বৈশিষ্ট্য।

(৯) **ছন্দ** (Rhythm)—জীবের ক্রিয়াকলাপ ছন্দঃপূর্ণ। জীবদেহের কোনও অংশ কিছুক্ষণ খুব বেশি সক্রিয় থাকার পর, অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে এবং ইহার পর আবার সক্রিয় হয়। সক্রিয়তা এবং নিষ্ক্রিয়তা ক্রমান্বয়ে আবর্তিত হইয়া থাকে।

(১০) **স্থিতিকাল** (Duration)—জীবের জীবনকাল সীমিত। জন্মের পর, নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহের বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং সক্রিয়তাও বাড়িতে থাকে। তাহার পর ক্রমে ক্রিয়াশীলতা কমিয়া আসে। এই অবস্থাকে **জরা** (Senescence) বলে। সবশেষে জীবনের সব লক্ষণই লোপ পায়। ইহাই **মৃত্যু** (Death)। জন্ম হইতে স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত জীবের জীবনকাল প্রায় নির্দিষ্ট।

পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি দ্বারা প্রায় সমস্ত জীবকে জড় বস্তু হইতে সহজে পৃথক করা যায়। তবে ভাইরাস (Virus) নামক একধরনের সূক্ষ্মদেহী বস্তু আছে। ইহাদের ধর্ম কতকটা জীবের মতো, আবার জড়ের মতোও বটে। জীবদেহের বাহিরে ইহারা জড়ের মতো গুণসম্পন্ন, কিন্তু জীবদেহে প্রবেশ করার পর ইহারা জীবের মতো জননের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে। বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগের কারণ ভাইরাস।

পরের পৃষ্ঠায় জড় ও জীবের পার্থক্যগুলি ছকের আকারে দেওয়া হইল।

জীব (Living)	জড় (Non-living)
(১) জীবের আকার নির্দিষ্ট ও আয়তন সীমিত।	(১) জড়ের আকার ও আয়তন অনির্দিষ্ট। ব্যতিক্রম ঃ কেলাস (Crystal) জড় বস্তু। কিন্তু নির্দিষ্ট মৌলিক অথবা যৌগিক পদার্থের কেলাসের আকার ও আয়তন নির্দিষ্ট।
(২) জীবের দেহ প্রোটোপ্লাজ্‌ম দিয়া গঠিত।	(২) জড় বস্তুতে প্রোটোপ্লাজ্‌ম থাকে না।
(৩) জীবদেহ একটি অথবা একটির বেশি কোষ দিয়া গঠিত। উন্নততর জীবের দেহে কোষগুলি কলা, অঙ্গ ইত্যাদি সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন কলার অথবা অঙ্গের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেহের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়।	(৩) জড় বস্তুতে এইরকম সংগঠন দেখা যায় না। উপাদানের পার্থক্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জড় বস্তুর সংগঠন বিভিন্ন ধরনের।
(৪) জীব চলনে সক্ষম ; অর্থাৎ, ইহারা দেহকে নাড়াচাড়া করিতে পারে, অথবা স্থানান্তরে যাইতে পারে।	(৪) জড় বস্তু চলনে অক্ষম। তবে বাহির হইতে বল প্রযুক্ত হইলে ইহারা স্থানান্তরিত হইতে পারে। অবশ্য, এইরকম স্থানান্তরকে চলন বলা যায় না।
(৫) উদ্দীপকের (অর্থাৎ, পরিবেশের অবস্থাগত পরিবর্তনের) প্রভাবে জীবদেহে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ইহাকে উত্তেজিতা বলে।	(৫) উষ্ণতা, আলোক ইত্যাদি পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তনে জড় বস্তুর ভৌত পরিবর্তন অথবা রাসায়নিক পরিবর্তন হইতে পারে। তবে এই পরিবর্তনকে উত্তেজিতা বলা যায় না।
(৬) পুষ্টি, শ্বসন, রেচন, ক্ষরণ ইত্যাদি বিপাকের দ্বারা জীবের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকে।	(৬) প্রোটোপ্লাজ্‌ম না থাকায়, জড় বস্তুতে বিপাক দেখা যায় না।
(৭) বিদ্যমান পদার্থের মধ্যে নূতন সজীব পদার্থ যোজনের ফলে জীবদেহে বৃদ্ধি হয়। জীবদেহের বৃদ্ধি ভিতর হইতে হয়। ইহাকে পূর্ণবৃদ্ধি বা ইন্‌টুস্‌সাসেপ্‌শান(Intussusception)-এর দ্বারা বৃদ্ধি বলে।	(৭) জড় বস্তুতে এইরকম বৃদ্ধি দেখা যায় না। তবে তলের উপর নূতন পদার্থ জমা হইয়া অনেক জড় বস্তু আয়তনে বাড়ে। ইহাকে উপলেপ বা অ্যাক্রীশান(Accretion)-এর দ্বারা বৃদ্ধি বলে।
(৮) জীব জননের দ্বারা বংশরক্ষা করে।	(৮) জড় বস্তু জননে অক্ষম।
(৯) জীবের ক্রিয়াকলাপ ছন্দঃপূর্ণ; অর্থাৎ, কখনও ক্রিয়ার হার দ্রুত, পর-মুহূর্তে মৃদু, তাহার পর আবার দ্রুত—এইভাবে চলে।	(৯) জড় বস্তুতে এইরকম দেখা যায় না।
(১০) জীবের স্থিতিকাল সীমিত। জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু—এই বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া জীবের জীবনকাল শেষ হয়।	(১০) জড়ের স্থিতিকাল সীমাহীন। ইহাদের জরা অথবা মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই।

জড় ও জীবের মধ্যে এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, উভয়েই কিন্তু মৌলিক পদার্থ দিয়া গঠিত। মৌলিক পদার্থগুলি জীবদেহে বিশেষ রীতিতে বিন্যস্ত হইয়া, প্রোটোপ্লাজ্‌ম সৃষ্টি করে; কিন্তু জড় বস্তুতে ঐ মৌলিক পদার্থগুলি প্রোটোপ্লাজ্‌ম সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহাই জীব ও জড়ের মৌলিক পার্থক্য। পার্থক্য সত্ত্বেও, জড় বস্তু ও সজীব বস্তু পরস্পর নির্ভরশীল। জীব ছাড়া জড় বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হইলেও, জড় বস্তু ছাড়া জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। কারণ, জড় বস্তু দিয়াই প্রোটোপ্লাজ্‌মের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি হয়। আবার, জীব মরিয়া অবশেষে জড় বস্তুতে পরিণত হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণী
(Plants and animals)

সজীব বস্তু দুই ধরনের : উদ্ভিদ (Plants) ও প্রাণী (Animals)। আদিম জীবনের অভিব্যক্তির ফলে এই দুই ধরনের জীব সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী খুব উত্তপ্ত ছিল। তখন জীবনের অস্তিত্ব কল্পনার বাহিরে। ক্রমে ভৌত প্রক্রিয়ায় তাপ বিকিরণ করিয়া, পৃথিবী অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হইল। এই সময়ে, কোনও এক শুভ মুহূর্তে কতকগুলি জড় বস্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে মিলিত হইয়া, জেলির মতো থক্‌থকে **প্রোটোপ্লাজ্‌ম** (Protoplasm) সৃষ্টি করিল—সেই জীবনের সূত্রপাত। কেমন করিয়া প্রথম জীবনের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে কিছু বলিতে অক্ষম। তবে এ-কথা ঠিক যে, জীবনের সৃষ্টি হইয়াছিল জলে।

প্রথম সৃষ্ট সেই জীব, প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ, তাহা নির্ধারণ করা যায় নাই। বস্তুতঃপক্ষে, ঐ জীব হইতে ক্রমে একদিকে প্রথম উদ্ভিদ সৃষ্ট হইল, অপরদিকে সৃষ্ট হইল প্রথম প্রাণী।

প্রথম সৃষ্ট জীবের গঠন ছিল খুবই সরল। মাত্র একটি কোষ দিয়া উহার দেহ গঠিত। ক্রমে লক্ষ লক্ষ বছরের অভিব্যক্তির ফলে ঐ সরল, এককোষী জীব হইতে বহুকোষী, জটিলতর এবং উন্নততর অনেক জীব সৃষ্টি হইল। এককোষী উদ্ভিদ হইতে সৃষ্টি হইল বহুকোষী উদ্ভিদ, আর এককোষী প্রাণী হইতে বহুকোষী প্রাণী।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর তুলনা (Comparison of plants and animals)

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই জীব। সুতরাং, ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক।

আবার, ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। নিচে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইল।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাদৃশ্য (Similarities between plants and animals)

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই সজীব বস্তু বলিয়া, উভয়ের মধ্যেই (১ পৃষ্ঠা হইতে ৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বর্ণিত) সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ইহা ছাড়া, উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়কেই বাঁচিয়া থাকার জন্য সবসময় সংগ্রাম করিতে হয়। পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া নেওয়ার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের মধ্যে নানারকম অভিযোজন (Adaptation) দেখা যায়। উভয়েই জীবনযাপনের উপায় হিসাবে অন্যোন্যজীবিত্ব (Symbiosis) অথবা পরজীবিতা (Parasitism) পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈসাদৃশ্য (Differences between plants and animals)

উন্নততর উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাধারণ পার্থক্যগুলি নিচে ছকের আকারে দেওয়া হইল।

উদ্ভিদ (Plants)	প্রাণী (Animals)
স্বভাবগত পার্থক্য (Differences in habit)	
(১) অধিকাংশ উদ্ভিদ মাটির সঙ্গে আট্‌কাইয়া থাকায়, স্থানান্তরে যাইতে পারে না। ব্যতিক্রম ঃ ক্লামাইডোমোনাস (*Chlamydomonas*), প্রোটোকক্কাস (*Protococcus*) প্রভৃতি এককোষী উদ্ভিদ স্থানান্তরে যাইতে পারে।	(১) অধিকাংশ প্রাণী স্বাধীনভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে। ব্যতিক্রম ঃ স্পঞ্জ (Sponge), হাইড্রা (*Hydra*), ওবেলিয়া (*Obelia*), প্রবাল (Coral), সাগর-কুসুম (Sea anemone), অ্যাসিডিয়া (*Ascidia*) ইত্যাদি প্রাণী পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এক স্থানে আট্‌কাইয়া থাকে।
বসতিগত পার্থক্য (Differences in habitat)	
(২) উদ্ভিদের বাসস্থান স্থল অথবা জল। বায়ুতে উদ্ভিদ পাওয়া যায় না; তবে কয়েক রকম উদ্ভিদের স্পোর (Spore) অথবা বীজ বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়।	(২) জল, স্থল এবং বায়ু—এই তিন মাধ্যমেই প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়। অবশ্য, কোনও প্রাণী সবসময়ের জন্য বায়ুতে থাকিতে পারে না।

উদ্ভিদ (Plants)	প্রাণী (Animals)
বহিরাকৃতিগত পার্থক্য (Differences in external features)	
(৩) উদ্ভিদের নির্দিষ্ট আকার নাই। **ব্যতিক্রম :** ডায়াটম (Diatom), প্রোটোকক্কাস, স্পাইরোগাইরা (*Spirogyra*), ঈস্ট (Yeast) ইত্যাদি উদ্ভিদের আকার নির্দিষ্ট।	(৩) প্রাণীর নির্দিষ্ট আকার থাকে। **ব্যতিক্রম :** অ্যামিবা(*Amoeba*)-র আকার নির্দিষ্ট নয়।
(৪) উদ্ভিদের দেহ অপ্রতিসম (Asymmetrical) ; অর্থাৎ, দুই অথবা তাহার বেশি সমান অংশে ভাগ করা যায় না। **ব্যতিক্রম :** ডায়াটম, প্রোটোকক্কাস ইত্যাদি উদ্ভিদ প্রতিসম ; অর্থাৎ, সমান দুই অংশে ভাগ করা যায়।	(৪) প্রাণি-দেহ প্রতিসম (Symmetrical) ; অর্থাৎ, দুই অথবা তাহার বেশি সমান অংশে ভাগ করা যায়। **ব্যতিক্রম :** শামুক অপ্রতিসম।
(৫) উদ্ভিদের দেহে শাখা-প্রশাখা থাকে। **ব্যতিক্রম :** তাল, খেজুর, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি গাছের শাখা হয় না।	(৫) প্রাণি-দেহে শাখা-প্রশাখা হয় না। **ব্যতিক্রম :** স্পঞ্জ, ওবেলিয়া ইত্যাদি প্রাণী উদ্ভিদের মতো শাখাযুক্ত।
(৬) উদ্ভিদ-দেহের ভরের তুলনায় সাধারণতঃ আয়তন বেশি।	(৬) প্রাণি-দেহের আয়তনের তুলনায় ভর সাধারণতঃ বেশি।
আভ্যন্তরীণ গঠনে পার্থক্য (Differences in internal structures)	
(৭) উন্নততর উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে শ্রম-বিভাগ স্পষ্ট নয় ; ইহাদের অঙ্গগুলি অঙ্গতন্ত্র সৃষ্টি করে না ; চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় (Sense organ) থাকে না।	(৭) উন্নততর প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে স্পষ্ট শ্রম-বিভাগ দেখা যায়। বিবিধ অঙ্গ মিলিয়া বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গতন্ত্র সৃষ্টি করে ; চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি বিশিষ্ট জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে।
(৮) উদ্ভিদের কোষ সেলুলোজ(Cellulose)-নির্মিত, শক্ত, পুরু ও স্পষ্ট কোষ-প্রাচীর (Cell wall) দিয়া সীমাবদ্ধ। কোষ-প্রাচীর কোষের জড় অংশ।	(৮) প্রাণি-কোষে এইরকম কোষ-প্রাচীর থাকে না। ইহা প্লাজ্মা মেমব্রেন (Plasma membrane) নামক একটি খুব সূক্ষ্ম পর্দা দিয়া সীমাবদ্ধ। ইহা সেলুলোজ-নির্মিত নয়। প্লাজ্মা মেমব্রেন কোষের সজীব অংশ।
(৯) উদ্ভিদ-কোষের সাইটোপ্লাজ্মে সাধারণতঃ একটি বড় ভ্যাকুওল (Vacuole) থাকে। ইহার মধ্যে কোষ-রস (Cell sap) থাকে।	(৯) প্রাণি-কোষে সাধারণতঃ ভ্যাকুওল থাকে না ; অথবা থাকিলেও, সংখ্যায় একের বেশি এবং আকারে খুব ছোট।

উদ্ভিদ (Plants)	প্রাণী (Animals)
(১০) উদ্ভিদ-কোষে প্লাস্টিড (Plastids) থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টিড (Chloroplastid) নামক এক-রকম প্লাস্টিডে ক্লোরোফিল (Chlorophyll) নামক সবুজ রঙ্গক-কণা থাকে। সেইজন্য উদ্ভিদের রঙ সবুজ।	(১০) প্রাণি-কোষে প্লাস্টিড থাকে না। কয়েক রকম ফড়িং, ব্যাঙ, গিরগিটি ও সাপের রঙ সবুজ। তবে ইহাদের কোষে ক্লোরোফিল থাকে না। অন্য কারণে ইহাদের সবুজ দেখায়।
ব্যতিক্রম ঃ ছত্রাক (Fungi) এবং স্বর্ণলতা (*Cuscuta*) প্রভৃতি কয়েকটি উদ্ভিদে ক্লোরোপ্লাস্টিড তথা ক্লোরোফিল থাকে না বলিয়া, ইহাদের রঙ সবুজ নয়।	**ব্যতিক্রম ঃ** ইউগ্লিনা (*Euglena*), ভল্‌ভক্‌স (*Volvox*) ইত্যাদি এককোষী প্রাণীতে ক্লোরোপ্লাস্টিড তথা ক্লোরোফিল থাকে।
(১১) উদ্ভিদ-কোষে সেন্‌ট্রোসোম (Centrosome) অথবা সেন্‌ট্রিওল (Centriole) থাকে না।	(১১) প্রাণি-কোষের নিউক্লিয়াসের কাছে সেন্‌ট্রোসোম নামক গোলকাকার একধরনের বস্তু থাকে। সেন্‌ট্রোসোমের কেন্দ্রে একটি অথবা দুইটি সূক্ষ্ম কণিকা থাকে। ইহাদের সেন্‌ট্রিওল বলা হয়।
ব্যতিক্রম ঃ কয়েক ধরনের শেওলায় এবং ছত্রাকে সেন্‌ট্রোসোম থাকে।	**ব্যতিক্রম ঃ** কয়েক ধরনের প্রাণীর কোষে সেন্‌ট্রোসোম থাকে না।
(১২) উদ্ভিদের কোষে গল্‌জি বস্তু (Golgi material) থাকে না।	(১২) প্রাণি-কোষের নিউক্লিয়াসের কাছে আরও একধরনের বস্তু দেখা যায়। ইহাদের গল্‌জি বস্তু বলে।

শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য (Physiological differences)

উদ্ভিদ (Plants)	প্রাণী (Animals)
(১৩) উদ্ভিদে অপচিতির চেয়ে উপচিতি বেশি।	(১৩) প্রাণীর অপচিতি উপচিতির চেয়ে বেশি।
(১৪) উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করিয়া থাকে; অর্থাৎ, খাদ্য-বিষয়ে উদ্ভিদ আত্ম-নির্ভরশীল। সেইজন্য, উদ্ভিদের পুষ্টি-পদ্ধতিকে **অটোট্রোপিক নিউট্রিশান (Autotropic nutrition)** বলা হয়।	(১৪) প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহারা খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। সেই কারণে, প্রাণীর পুষ্টি-পদ্ধতিকে **হেটারোট্রোপিক নিউট্রিশান (Heterotropic nutrition)** বলে।
ব্যতিক্রম ঃ ছত্রাক, স্বর্ণলতা ইত্যাদি কয়েক ধরনের উদ্ভিদ নিজ খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না।	**ব্যতিক্রম ঃ** ইউগ্লিনা, ভল্‌ভক্‌স ইত্যাদি প্রাণী খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে।
(১৫) ক্লোরোফিল থাকায়, উদ্ভিদ জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে	(১৫) ক্লোরোফিল না থাকায়, প্রাণী সালোক-সংশ্লেষ করিতে পারে না।

উদ্ভিদ (Plants)	প্রাণী (Animals)
সালোকসংশ্লেষ বা ফোটোসিন্থিসিস (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate)-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে।	
ব্যতিক্রম : ক্লোরোফিল না থাকায়, ছত্রাক, স্বর্ণলতা ইত্যাদি উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে না।	**ব্যতিক্রম** : ইউগ্লিনা, ভল্‌ভক্‌স ইত্যাদি ক্লোরোফিল-যুক্ত প্রাণী সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে।
(১৬) মাটি হইতে গৃহীত নাইট্রেট লবণ হইতেই উদ্ভিদ নাইট্রোজেনের সরবরাহ পাইয়া থাকে।	(১৬) নাইট্রোজেনের জন্যও প্রাণী উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।
ব্যতিক্রম : ঘটপত্রী, ঝাঁঝি, সূর্য-শিশির ইত্যাদি উদ্ভিদ পতঙ্গের দেহ হইতে নাইট্রোজেনের সরবরাহ পায়।	
(১৭) উদ্ভিদ তরল ও গ্যাসীয় সরল অজৈব খাদ্যোপকরণ গ্রহণ করে। ইহারা জটিল, কঠিন ও জৈব খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য, উদ্ভিদের পুষ্টি-পদ্ধতিকে **হোলোফাইটিক নিউ-ট্রিশান** (**Holophytic nutrition**)-ও বলা হয়।	(১৭) প্রাণী কঠিন, জটিল ও জৈব খাদ্য গ্রহণ করে। এই কারণে, প্রাণীর পুষ্টি-পদ্ধতিকে **হোলোজোইক নিউট্রিশান** (**Holozoic nutrition**) বলা হয়। প্রাণী অজৈব তরল খাদ্যও গ্রহণ করে, তবে গ্যাসীয় খাদ্য গ্রহণ করে না।
ব্যতিক্রম : ঘটপত্রী, ঝাঁঝি, সূর্য-শিশির ইত্যাদি পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ কঠিন, জটিল ও জৈব খাদ্য গ্রহণ করে। অনেক ছত্রাক তরল জৈব খাদ্য শোষণ করে।	**ব্যতিক্রম** : মনোসিস্টিস, যকৃৎ-কৃমি, ফিতা-কৃমি ইত্যাদি প্রাণী তরল জৈব খাদ্য শোষণ করে। ইহারা কঠিন খাদ্য খাইতে পারে না।
(১৮) উদ্ভিদের খাদ্যের কোনও কঠিন অবশেষ থাকে না।	(১৮) পরিপাক হওয়ার পর, প্রাণীর খাদ্যের কম-বেশি কঠিন অবশেষ থাকে। ইহা দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।
(১৯) উন্নততর উদ্ভিদে শ্বসনের প্রয়োজনে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করার জন্য কোনও বিশিষ্ট শ্বাস-অঙ্গ (Respiratory organ) থাকে না। সাধারণতঃ পত্রই এই কাজ করে।	(১৯) উন্নততর প্রাণীর দেহে শ্বসনের প্রয়োজনে অক্সিজেন সংগ্রহ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করার জন্য ফুলকা (Gills), ফুস্‌ফুস্ (Lungs) ইত্যাদি বিশিষ্ট শ্বাস-অঙ্গ থাকে।
(২০) উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন গ্রহণ করে। আবার, ঐ দুইটি গ্যাস ত্যাগও করে।	(২০) প্রাণী শুধু অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। ইহারা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে না, অথবা অক্সিজেন-ও ত্যাগ করে না।
(২১) দ্রুতহারে এবং নিয়মিতভাবে রেচন-পদার্থ দূর করার জন্য উদ্ভিদের দেহে কোনও বিশিষ্ট	(২১) অপেক্ষাকৃত দ্রুতহারে এবং নিয়মিতভাবে রেচন-পদার্থ দূরীকরণের জন্য উন্নততর প্রাণীর

উদ্ভিদ (Plants)	প্রাণী (Animals)
রেচন-অঙ্গ (Excretory organ) থাকে না। উদ্ভিদের রেচন-পদার্থ সাধারণতঃ পত্রে অথবা বল্কলে জমা হয়। পত্র অথবা বল্কল খসিয়া পড়িলে, রেচন-পদার্থও বিদূরিত হয়।	দেহে বৃক্ক (Kidneys), শুঙ্গ-গ্রন্থি (Antennary glands) ইত্যাদি বিশিষ্ট রেচন-অঙ্গ থাকে।
(২২) উদ্ভিদের বৃদ্ধি কতকগুলি নির্দিষ্ট বর্ধনশীল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।	(২২) প্রাণি-দেহের প্রায় সব অংশেই একই সময়ে বৃদ্ধি হয়।
(২৩) আমৃত্যু উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয়।	(২৩) মৃত্যুর অনেক আগে প্রাণীর বৃদ্ধি বন্ধ হয়।
(২৪) উদ্ভিদের উত্তেজিতা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট এবং সাধারণতঃ উদ্দীপক দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।	(২৪) প্রাণি-দেহের উত্তেজিতা খুব স্পষ্ট এবং উদ্দীপকের প্রভাব সমস্ত দেহে অনুভূত হয়।
(২৫) উন্নততর উদ্ভিদে অঙ্গজ জনন এবং যৌন জনন—এই দুই পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার হয়।	(২৫) উন্নততর প্রাণীতে সাধারণতঃ যৌন জননের দ্বারা বংশ-বিস্তার হয়।
(২৬) উন্নততর উদ্ভিদের ভ্রূণ কিছুকাল সুপ্ত অবস্থায় থাকে।	(২৬) উন্নততর প্রাণীর ভ্রূণ সচরাচর সুপ্ত অবস্থায় থাকে না।
রাসায়নিক পার্থক্য (Chemical differences)	
(২৭) রাসায়নিক বিশ্লেষণে উদ্ভিদ-দেহে সেলুলোজ, লিগ্‌নিন (Lignin), সুবেরিন (Suberin) ইত্যাদি পাওয়া যায়।	(২৭) রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে, প্রাণি-দেহে সেলুলোজ, লিগ্‌নিন প্রভৃতি পাওয়া যায় না।
(২৮) উদ্ভিদ-দেহে শ্বেতসার বা ষ্টার্চ (Starch) পাওয়া যায়, কিন্তু গ্লাইকোজেন (Glycogen) পাওয়া যায় না। ব্যতিক্রম ঃ ছত্রাকে গ্লাইকোজেন পাওয়া যায়।	(২৮) প্রাণি-দেহে গ্লাইকোজেন পাওয়া যায়, কিন্তু শ্বেতসার পাওয়া যায় না।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পূর্বোক্ত পার্থক্য হইতে উন্নততর জীবদের উদ্ভিদ অথবা প্রাণী বলিয়া সহজেই শনাক্ত করা যায় ; কিন্তু কতকগুলি অনুন্নত জীব উদ্ভিদ অথবা প্রাণী তাহা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। ইউগ্লিনা এইরকম একটি জীব। ইহার দেহে উদ্ভিদের মতো ক্লোরোফিল আছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ইহা প্রাণীদের মতো। সেই কারণে প্রাণি-বিজ্ঞানীরা ইহাকে প্রাণী বলিয়া মনে করেন। আবার, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা ইউগ্লিনাকে উদ্ভিদরূপে গণ্য করেন। প্রকৃতপক্ষে, জীব-জগতে ইউগ্লিনার স্থান এখনও অমীমাংসিত।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরতা
(Interdependence of plants and animals)

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনযাত্রার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকিলেও, ইহারা একে অপরের সাহায্য ছাড়া স্বাভাবিকভাবে বাঁচিতে ও বংশরক্ষা করিতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে, অনেক বিষয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পর নির্ভরশীল।

প্রধানতঃ শ্বসন ও পুষ্টির জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অন্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই শ্বসনের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকারক, কিন্তু উদ্ভিদের পক্ষে অপরিহার্য। আবার, সালোকসংশ্লেষের সময় উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। ফলে, বায়ুমণ্ডলে বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড জমিয়া প্রাণীর শ্বসনে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না।

শাকাশী প্রাণীরা খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। মাংসাশী প্রাণীরা শাকাশী প্রাণীদের মাংসে পুষ্ট হয়। সুতরাং, ইহারাও খাদ্যের জন্য পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। আবার, পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ সরাসরি পতঙ্গ-দেহ হইতে নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য পায়। অন্যান্য উদ্ভিদ মাটির নাইট্রেট লবণ হইতে নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রাণীর মল-মূত্র ও গলিত দেহাবশেষ হইতে অবশেষে নাইট্রেট সৃষ্টি হয়।

প্রাথমিক নির্ভরতা ছাড়া, উদ্ভিদ ও প্রাণী আরও কয়েকটি বিষয়ে পরস্পর নির্ভরশীল। পতঙ্গ, পাখি, বাদুড়, কাঠবিড়াল ইত্যাদি প্রাণী পুষ্পের সৌন্দর্য, বর্ণ অথবা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, পুষ্পে আসে এবং মকরন্দ অথবা পরাগ খায়। পুষ্পে বিচরণশীল প্রাণী এইভাবে পরাগযোগে তথা বীজ ও ফল-সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কয়েক রকম পতঙ্গ, শামুক, গেঁড়ি ইত্যাদি শুধুমাত্র আশ্রয়ের জন্য পুষ্পের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহারাও পরাগযোগে সাহায্য করে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাণী খাদ্য অথবা আশ্রয়ের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল এবং উদ্ভিদ জনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য প্রাণীর মুখাপেক্ষী।

উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত অথবা রসালো ফল দ্বারা আকৃষ্ট প্রাণী ফলের ভক্ষ্যাংশ খাওয়ার পর বীজগুলিকে যেখানে-সেখানে ফেলিয়া দেয়। ফলে, বীজ বহুদূরে নীত হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রাণী খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর এবং উদ্ভিদ বীজ-বিস্তারের জন্য প্রাণীর উপর নির্ভর করে।

আম, জামরুল, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি গাছে একধরনের পিঁপড়া বাস করে। অন্য কোনও প্রাণী এই গাছে উঠার চেষ্টা করিলে, পিঁপড়ারা দলবদ্ধভাবে

আগন্তুক প্রাণীকে আক্রমণ করে। আগন্তুক প্রাণী তখন পলাইতে বাধ্য হয়। সুতরাং, উদ্ভিদ আত্মরক্ষার জন্য পিঁপড়ার উপর এবং পিঁপড়া আশ্রয়ের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।

জীব-বিজ্ঞান ও উহার বিভাগ
(Biology and its divisions)

বিজ্ঞানের যে শাখায় সজীব বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাহাকে **জীব-বিজ্ঞান** বা **বা'য়োলজি** (Biology) বলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিখ্যাত ফরাসী জীব-বিজ্ঞানী **জঁা লামার্ক** (Jean Lamarck, 1744—1829) বা'য়োলজি শব্দটি সৃষ্টি করেন। এই শব্দটি *bios* (অর্থাৎ জীবন) এবং *logos* (অর্থাৎ আলোচনা) নামক দুইটি গ্রীক শব্দ হইতে উদ্ভূত। জীব-বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান(Natural sciences)-এর অন্যতম শাখা। সবরকম উদ্ভিদ এবং মানুষসহ যাবতীয় প্রাণীর গঠন, শারীরবৃত্ত, বংশগতি, পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক, পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ আলোচনা জীব-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

জ্ঞানলাভের সুবিধার জন্য জীব-বিজ্ঞানকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগে করা হয়। যেমন—(১) **উদ্ভিদ-বিজ্ঞান** বা **বটানি** (Botany ; গ্রীক *botane*=তৃণ) এবং (২) **প্রাণি-বিজ্ঞান** বা **জুয়োলজি** (Zoology ; গ্রীক *zoon*= প্রাণী+*logos*=আলোচনা)। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে উদ্ভিদ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে এবং প্রাণি-বিজ্ঞানে প্রাণীর বিষয়ে সবরকম আলোচনা করা হয়।

জীব-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জীবের নানা দিক সম্বন্ধে আলোচিত হয়। নিচে জীব-বিজ্ঞানের প্রধান কয়েকটি শাখা এবং উহাদের আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করা হইল।

(১) **অঙ্গসংস্থান বা মর্ফোলজি** (Morphology ; গ্রীক *morphe*=আকার+*logos*= আলোচনা)—জীব-বিজ্ঞানের এই শাখায় জীবের আকার ও বাহ্য গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

(২) **শারীরস্থান বা অ্যানাটমি** (Anatomy ; গ্রীক *ana*=উপরে+*temno*=কাটা)— জীবের আভ্যন্তরীণ গঠন অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদ (Dissection) করার পর যে অংশগুলি দেখা যায়, তাহাদের বিষয়ে আলোচনা করাই এই শাখার উদ্দেশ্য।

(৩) **কলাস্থান বা হিস্টোলজি** (Histology ; গ্রীক *histos*=কলা+*logos*=আলোচনা) —জীবের কলার গঠন ও কাজ এই শাখার আলোচ্য বিষয়।

(৪) **কোষতত্ত্ব বা সাইটোলজি** (Cytology ; গ্রীক *kytos*=ফাঁপা+*logos*=আলোচনা) —এই শাখায় কোষের গঠন ও কাজ আলোচনা করা হয়।

(৫) **শারীরবৃত্ত বা ফিজিওলজি** (Physiology ; গ্রীক *physis*=প্রকৃতি+*logos*= আলোচনা)—জীবদেহের বিভিন্ন কাজ এই শাখার আলোচ্য বিষয়।

(৬) ভ্রূণবিদ্যা বা এমব্রিওলজি (Embryology; গ্রীক *in*=ভিতরে+*bryo*=স্ফীত হওয়া+*logos*=আলোচনা)—এই শাখায় জীবের পরিস্ফুরণ আলোচনা করা হয়।

(৭) প্রজনবিদ্যা বা জেনেটিক্স (Genetics; গ্রীক *genesis*=জীবের উৎপত্তি)—বংশগতি (Heredity) এই শাখার আলোচ্য বিষয়।

(৮) বাস্তব্যবিদ্যা বা ইকোলজি (Ecology; গ্রীক *oikos*=বাড়ি+*logos*=আলোচনা)—এই শাখায় পরিবেশের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক আলোচনা করা হয়।

(৯) প্রত্নজীব-বিজ্ঞান বা প্যালিঅন্টোলজি (Palaeontology; গ্রীক *palaios*=প্রাচীন +*ont*=সত্তা+*logos*=আলোচনা)—জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil; ল্যাটিন *fadio*=খনন করা) অর্থাৎ প্রস্তরীভূত জীব অথবা জীবের প্রস্তরীভূত ছাপ বিষয়ে আলোচনা করা এই শাখার উদ্দেশ্য।

(১০) অভিব্যক্তি বা ইভোল্যুশান (Evolution; ল্যাটিন *e*=বাহিরে+*volvo*=আবর্তন) —এই শাখার বিচার্য বিষয় জীব-জগতের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ।

(১১) ট্যাক্সোনমি (Taxonomy; গ্রীক *taxis*=বিন্যাস+*nomos*=আইন)—শ্রেণী-বিভাগ ও শ্রেণী-বিভাগের রীতি এই শাখার আলোচ্য বিষয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর গুরুত্ব
(Importance of plants and animals)

দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গুরুত্ব অসীম। খাদ্য, পরিধেয়, আশ্রয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা—এই প্রাথমিক চাহিদাগুলির জন্য মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। আদিম মানব খাদ্যের জন্য বনের ফল-মূল সংগ্রহ করিত এবং বন্য পশু-পাখি শিকার করিত। সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কৃষিকার্য শিখিল। চাষের দ্বারা ধান, গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি শস্য উৎপাদন করিয়া, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শূয়ার, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি পালন করিয়া এবং সমুদ্র ও নদী হইতে মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া সভ্য মানুষ খাদ্যের সমস্যা মিটাইল।

কাপাস গাছের তুলা হইতে কাপড় প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত সুতা তৈয়ারি হয়। ভেড়ার লোম এবং রেশম-কীটের গুটি হইতে যথাক্রমে পশম ও রেশম পাওয়া যায়। কয়েক ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণীর চামড়া শীত-নিবারক পরিধেয়-রূপে ব্যবহৃত হয়। বাঁশ, কাঠ, পাট ও নারিকেলের দড়ি ইত্যাদি গৃহ-নির্মাণের সরঞ্জাম উদ্ভিদ-রাজ্যের দান। কুইনিন, বেলেডোনা, পেনিসিলিন ইত্যাদি অসংখ্য ঔষধ নানাবিধ উদ্ভিদের দেহ হইতে পাওয়া যায়। রোগ-দমনে এই ঔষধগুলির প্রয়োজনীয়তা আজ প্রায় সর্বজনবিদিত। নানাবিধ প্রাণীর দেহাংশ হইতেও কয়েক ধরনের ঔষধ প্রস্তুত হয়। সরিষার তেল, নারিকেল তেল, তিসির তেল ইত্যাদি নানারকম তেল, চা, কফি, কোকো, তামাক ইত্যাদি

মাদকদ্রব্য, বোতলের ছিপি, গঁদের আঠা—সবই উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়। একধরনের গাছের তরুক্ষীর (Latex) হইতেই রবার প্রস্তুত করা হয়। কয়লা উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত রূপ। গ্লু (Glue), চামড়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস প্রাণি-দেহ হইতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ, পায়রা, ইঁদুর, গিনিপিগ, কুকুর, বিড়াল, বানর ইত্যাদি পরীক্ষাগারে সচরাচর ব্যবহার্য প্রাণী ব্যবচ্ছেদ করিয়া, মানুষের দেহের গঠনের ও শস্ত্র-চিকিৎসার শিক্ষানবীশী করা হয়।

অনেক আগাছা এবং পরজীবী উদ্ভিদ শস্যের ক্ষতি করে। ক্ষতিকারক প্রাণীর সংখ্যাও নগণ্য নয়। বাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদি জন্তু গৃহপালিত প্রাণী ও উপকারী প্রাণীদের মারিয়া ফেলিয়া মানুষের ক্ষতি করে। সময়বিশেষে ইহারা মানুষেরও প্রাণহানি করে। প্রত্যেক বছর অনেক মানুষ বিষধর সাপের কামড়ে মারা যায়। ইঁদুর ও অনেক পতঙ্গ শস্যের প্রভূত ক্ষতি করে। মশা, মাছি, ইঁদুর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী নানারকম মারাত্মক রোগের বাহকের কাজ করে। অনেক প্রাণী মানুষ ও গৃহপালিত প্রাণীর দেহে পরজীবীরূপে বাস করে এবং নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে।

অত্যন্ত অর্থনৈতিক এবং নিতান্ত ব্যবহারিক দিক বাদ দিলেও, জীব-জগৎ চিন্তাশীল মানুষের কাছে নানারকম প্রেরণার উৎস, সাধারণের কাছে চিত্ত-বিনোদনের অন্যতম উপকরণ।

অনুশীলনী

১। একটি জীবের গঠনগত ও কার্যগত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। [H. S. 1964]
Describe the structural and functional characteristics of a living organism.

২। সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। জড় বস্তুর সহিত ঐগুলির পার্থক্য নির্দেশ কর। [H. S. 1970 (Comp.), 1968]
Describe the characteristics of a living organism. How do these differ from those of a non-living object?

৩। একটি আদর্শ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সদৃশ লক্ষণগুলি উল্লেখ কর। উহাদের পার্থক্যগুলির একটি তালিকা দাও। [H. S. 1964 (Comp.); *cp.* 1961 (Comp.)]
Mention the characteristics common to a typical plant and an animal. Tabulate the differences between them.

৪। একটি আদর্শ উদ্ভিদ ও একটি আদর্শ প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় পার্থক্যগুলি বর্ণনা কর। [H. S. 1965 (Comp.)]
Describe the physiological differences between a typical plant and a typical animal.

৫। হাইড্রা প্রাণী, উদ্ভিদ নয়—ইহার সপক্ষে যুক্তি দেখাও। [H. S 1967 (Comp.)]
State your reasons to support that Hydra is an animal and not a plant.

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান
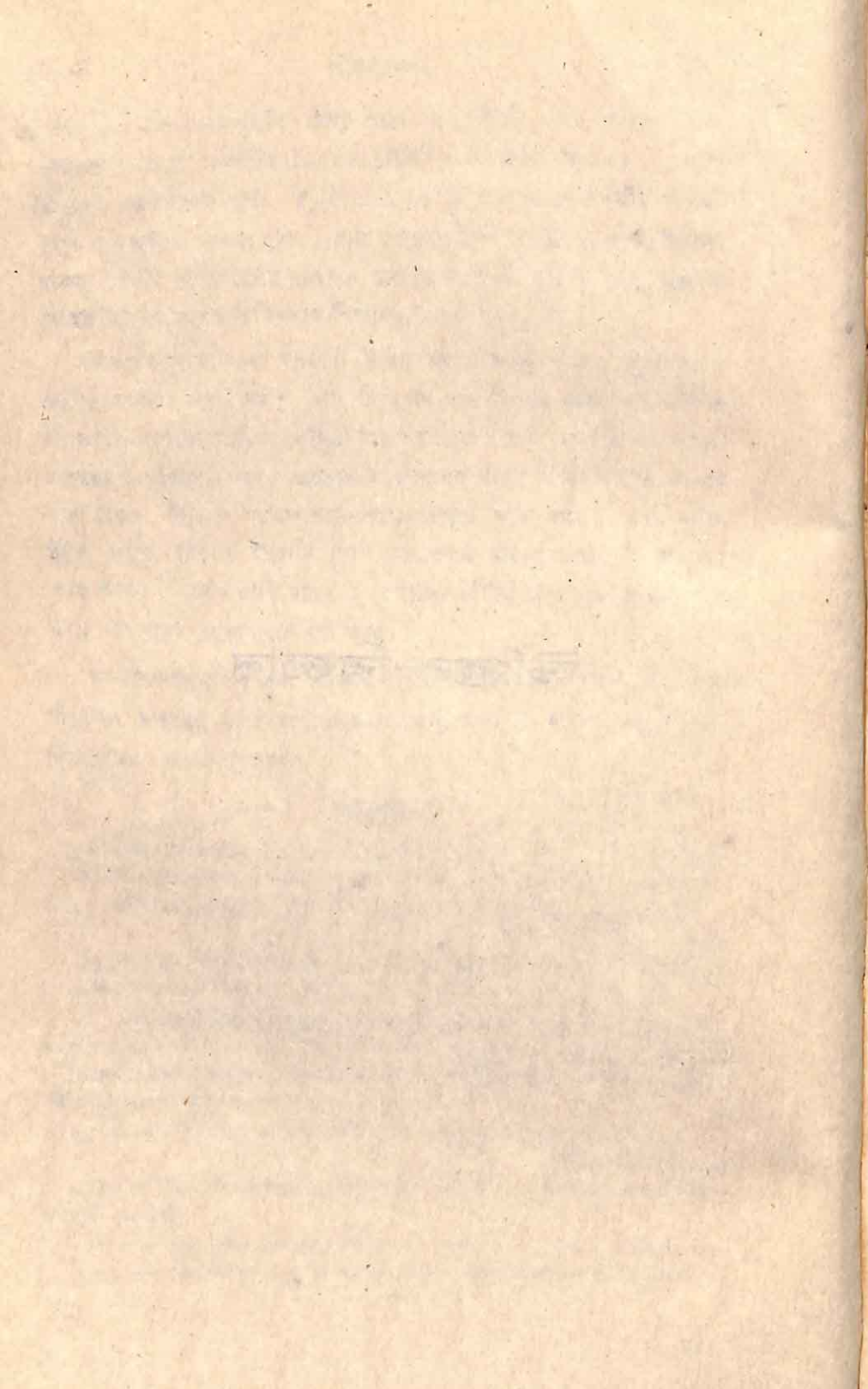
উদ্ভিদ-জীবনে বৈচিত্র্য ঃ বসতি ও স্বভাব
(Diversity of life in plants : Habitat and habit)

প্রকৃতির নিয়মে জগৎ জুড়িয়া বৈচিত্র্যের ছড়াছড়ি। উদ্ভিদ-রাজ্যও ইহার ব্যতিক্রম নয়। আবহাওয়ার পার্থক্যে, পরিবেশের বিভিন্নতায় নানা জায়গায় নানারকম উদ্ভিদ দেখা যায়। একদিকে যেমন কাষ্ঠল ও সবল কাণ্ডযুক্ত বৃক্ষের প্রাচুর্য, তেমনি অন্যদিকে দুর্বল কাণ্ডযুক্ত লতারও অভাব নাই। কোনও কোনও উদ্ভিদ মাত্র কয়েক মাস বাঁচে ; আবার, কয়েক হাজার বছর বাঁচিয়া থাকে এমন উদ্ভিদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। অধিকাংশ উদ্ভিদই খাদ্য তৈয়ারির ব্যাপারে স্বাবলম্বী ; কিছুসংখ্যক উদ্ভিদ, অবশ্য, খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী। অতি-পরিচিত উদ্ভিদের প্রায় সবারই পুষ্প অর্থাৎ ফুল হয় ; কিন্তু পুষ্প হয় না এমন উদ্ভিদও আছে। এই পরিচ্ছেদে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ-রাজ্যের কয়েকটি দিক সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা করা হইল।

পৃথিবীতে উদ্ভিদের বিস্তারণ
(Distribution of plants on the earth)

জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে, পৃথিবীর স্থলভাগকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—(১) **গ্রীষ্মমণ্ডল** (Tropical zone), (২) **নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডল** (Temperate zone) এবং (৩) **হিমমণ্ডল** (Frigid
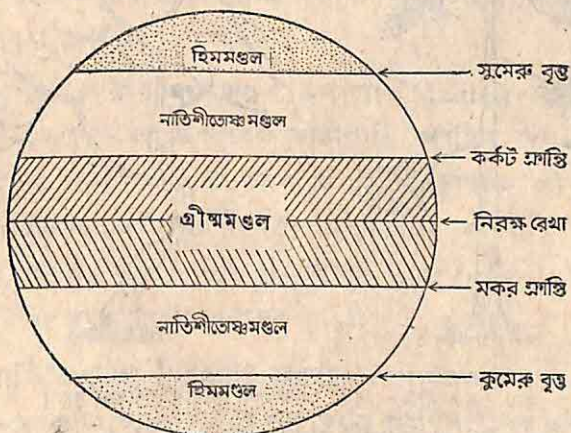
১নং চিত্র—স্থলভাগের বিভিন্ন জলবায়ু-মণ্ডল।

zone)। প্রধানতঃ বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা ও মাটির পার্থক্যের জন্য, এই তিন মণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়।

গ্রীষ্মমণ্ডলের উদ্ভিদ (Plants of the tropical zone)

কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যবর্তী অঞ্চল গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের সব জায়গাতেই এবং সব ঋতুতেই উষ্ণতা মোটামুটি একইরকম। তবে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য গ্রীষ্মমণ্ডলে চার ধরনের গাছপালা (Vegetation) দেখা যায়। যেমন—

(ক) **নিরক্ষীয় চিরহরিৎ অরণ্য (Tropical evergreen forest)**—নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে কিছু অঞ্চল জুড়িয়া এই অরণ্য দেখা যায়। এই অঞ্চলে শীত অথবা গ্রীষ্ম ঋতুর পার্থক্য বোঝা যায় না, সারা বছর ধরিয়া উষ্ণতা প্রায় সমান থাকে এবং সব ঋতুতেই প্রচুর পরিমাণে (বছরে গড়ে ১৮০ হইতে ২০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত) বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া, মাটি ও বায়ু সবসময়েই ভিজা থাকে। এই অরণ্যের উদ্ভিদগুলি খুব লম্বা হয় এবং ইহাদের অনেক শাখা-প্রশাখা ও বড় বড় পত্র থাকে। সবসময়ের জন্য পত্র থাকায়, এই উদ্ভিদগুলিকে **চিরহরিৎ বৃক্ষ (Evergreen tree)** বলে। মেহগিনি (*Swietenia mahogoni*), আব্‌লুস (*Diospyros*), সিঙ্কোনা (*Cinchona officinalis*), রবার (*Ficus elastica*) ইত্যাদি নিরক্ষীয় চিরহরিৎ অরণ্যের উদ্ভিদ।
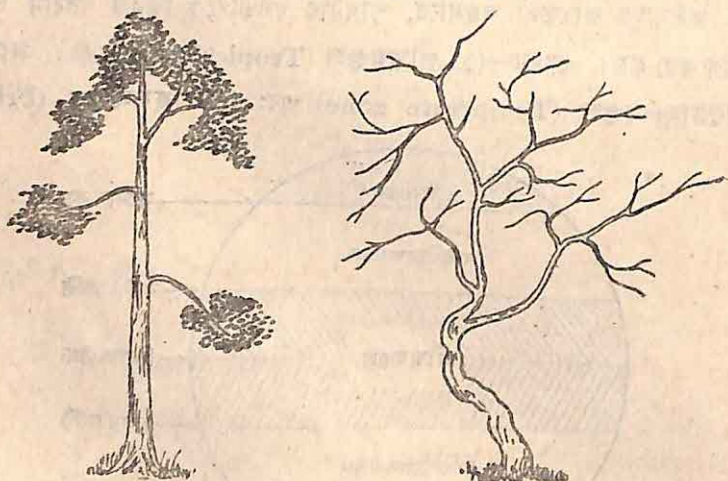
২নং চিত্র—(বাঁয়ে) চিরহরিৎ বৃক্ষ এবং (ডাইনে) পর্ণমোচী বৃক্ষ।

(খ) **নিরক্ষীয় পর্ণমোচী অরণ্য (Tropical deciduous forest)**—এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা বেশি থাকে এবং ঐ সময়ে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। এই অরণ্যেও বড় বড় এবং অনেক শাখা-প্রশাখা-যুক্ত উদ্ভিদ জন্মায়। শীতকালে আবহাওয়া শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, এই সমস্ত উদ্ভিদের

সব পত্র প্রায় একসঙ্গে ঝরিয়া যায়। তখন উদ্ভিদগুলিতে একেবারে পত্র থাকে না। সেইজন্য এই উদ্ভিদগুলিকে **পর্ণমোচী বৃক্ষ** (Deciduous tree) বলে। বসন্তকালে ইহাদের আবার নূতন পত্র জন্মায়। শাল (*Shorea robusta*), সেগুন (*Tectona grandis*), বট (*Ficus bengalensis*), অশ্বত্থ (*Ficus religiosa*) ইত্যাদি উদ্ভিদ এই অঞ্চলে দেখা যায়।

(গ) **সাভানা** (Savannah)—এই অঞ্চলেও গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা বেশি থাকে (গড়ে ২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এবং ঐ সময়ে বৃষ্টি হয়, শীতকালে বৃষ্টি হয় না। সাভানায় প্রধানতঃ লম্বা লম্বা (২০ হইতে ২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত) ঘাস ও অন্যান্য তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়।

(ঘ) **মরু-অঞ্চলের গাছপালা** (Desert vegetation)—এই অঞ্চলে দিনের উষ্ণতা খুব বেশি, বৃষ্টিপাত খুব অল্প এবং অনিয়মিত, মাটি শুষ্ক এবং বালুকাময়। ফণিমনসা (*Opuntia dillenii*), তেশিরা মনসা বা বাজবরণ (*Euphorbia antiquorum*) ও অন্যান্য ক্যাক্‌টাস (Cactus) এবং বাব্‌লা (*Acacia arabica*) ইত্যাদি কাঁটা-যুক্ত উদ্ভিদ মরু-অঞ্চলে পাওয়া যায়।

নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলের উদ্ভিদ (Plants of the temperate zone)

কর্কটক্রান্তি হইতে সুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত এবং মকরক্রান্তি হইতে কুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল দুইটি নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলের অন্তর্গত। এই মণ্ডলে মোটামুটি তিন ধরনের গাছপালা দেখা যায়। যেমন—

(ক) **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের গাছপালা** (Mediterranean vegetation)—ভূমধ্যসাগরের উপকূলের কাছাকাছি অবস্থিত দেশগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয়, গ্রীষ্মকালে হয় না। কমলা লেবু (*Citrus aurantium*), আপেল (*Pyrus malus*), নাশপাতি (*Pyrus communis*), আঙুর (*Vitis vinifera*), জলপাই (*Olea europaca*) ইত্যাদি গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

(খ) **নাতিশীতোষ্ণ চিরহরিৎ অরণ্য** (Temperate evergreen forest)—সুমেরুবৃত্তের ও কুমেরুবৃত্তের কাছাকাছি অবস্থিত অঞ্চলে এই ধরনের অরণ্য দেখা যায়। এই অরণ্যে লম্বা লম্বা উদ্ভিদ জন্মায়। ইহাদের পত্র সরু ও সুচালো এবং শাখা-প্রশাখাগুলি এমনভাবে সাজানো থাকে, যাহাতে ইহাদের শঙ্কু(Cone)-র মতো দেখায়। সেইজন্য এই উদ্ভিদগুলিকে **সরলবর্গীয় বৃক্ষ** বা **কনিফেরাস বৃক্ষ** (Coniferous tree) বলে। সরলবর্গীয় বৃক্ষে বছরের
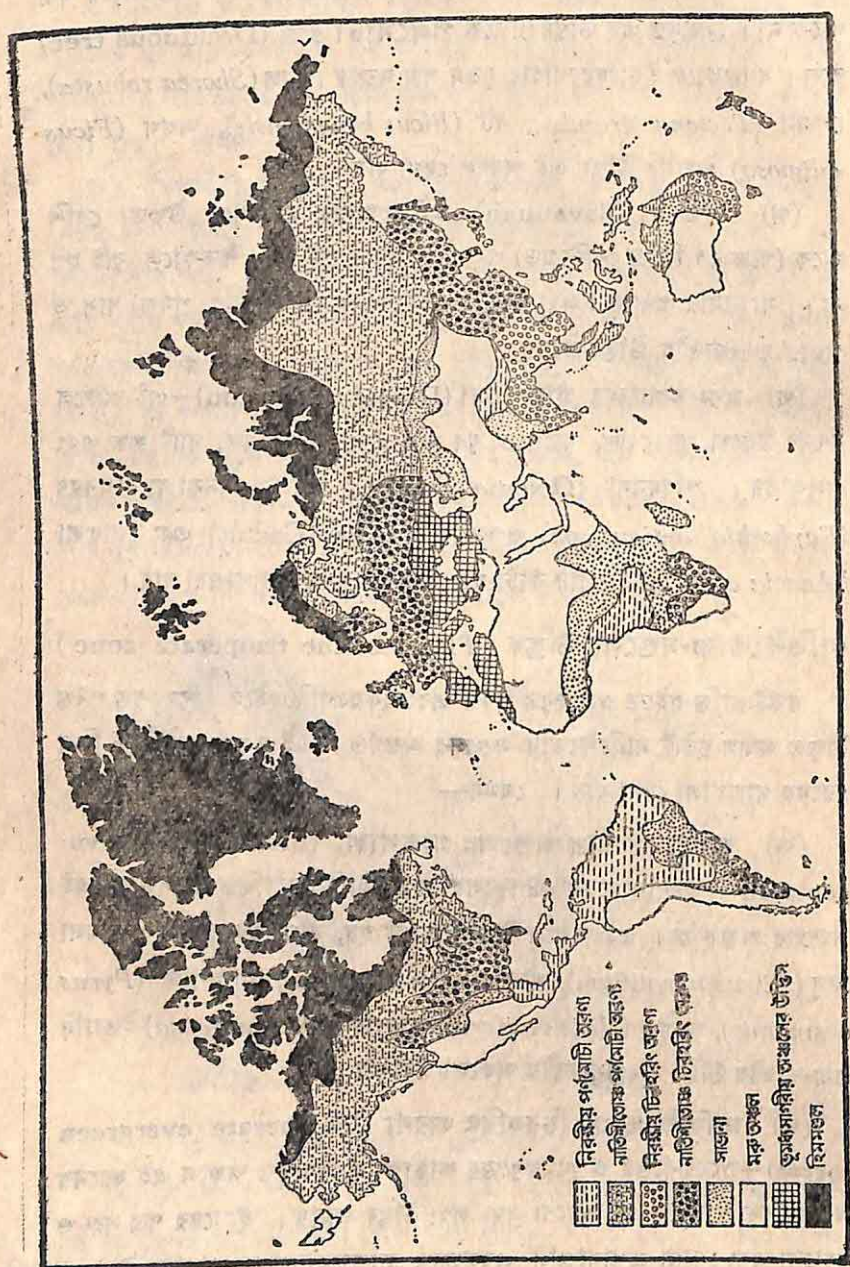
৩নং চিত্র—পৃথিবী-পৃষ্ঠে উদ্ভিদের বিস্তারণ।

সবসময়েই পত্র থাকে। পাইন (*Pinus*), দেওদার (*Cedrus*), বিলাতী ঝাউ (*Thuja*) ইত্যাদি এই ধরনের বৃক্ষ।

(গ) **নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী অরণ্য (Temperate deciduous forest)**—এই-জাতীয় অরণ্য-অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়, শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না, তবে মাঝে মাঝে তুষারপাত হয়। ওক (Oak—*Quercus*), বার্চ (Birch—*Betula*), এল্‌ম (Elm—*Ulmus*) ইত্যাদি বড় বড় বৃক্ষ এই অরণ্যের বৈশিষ্ট্য। শীতকালে ইহাদের সব পত্র ঝরিয়া যায়।

হিমমণ্ডলের উদ্ভিদ (Plants of the frigid zone)

সুমেরুবৃত্তের উত্তরে এবং কুমেরুবৃত্তের দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি অবস্থিত অঞ্চল হিমমণ্ডলের অন্তর্গত। সারা বছর ধরিয়া বরফে ঢাকা থাকে বলিয়া, এই অঞ্চলে কোনও বড় উদ্ভিদ জন্মায় না। কয়েক জাতের শেওলা (Algae) এবং লাইকেন (Lichen) নামক বিশিষ্ট ধরনের উদ্ভিদ হিমমণ্ডলে পাওয়া যায়।

২২ পৃষ্ঠায় জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে, পৃথিবীতে উদ্ভিদের বিস্তারণের একটি চিত্র দেওয়া হইল।

জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদ
(Aquatic and terrestrial plants)

যে প্রাকৃতিক পরিবেশে জীব জন্মগ্রহণ করে, স্বাভাবিকভাবে বাঁচিয়া থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে, তাহাকে উহার **বসতি (Habitat)** বলে। উদ্ভিদ জলে পাওয়া যায়, আবার স্থলেও পাওয়া যায়। অতএব, জল এবং স্থল—উদ্ভিদের বসতি এই দুই ধরনের। যে উদ্ভিদ জলে অথবা জলা-জায়গায় জন্মায়, তাহাকে **জলজ উদ্ভিদ (Aquatic plant** ; ল্যাটিন *aqua*=জল) বা **হাইড্রোফাইট (Hydrophyte** ; গ্রীক *hydor*=জল+*phyton*=উদ্ভিদ) বলে। যে উদ্ভিদ স্থলে বাস করে, তাহাকে **স্থলজ উদ্ভিদ (Terrestrial plant** ; ল্যাটিন *terra*=পৃথিবী) বা **জিওফাইট (Geophyte** ; গ্রীক *ge*=পৃথিবী+*phyton*=উদ্ভিদ) বলে। নিচে ইহাদের প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আলোচনা করা হইল।

জলজ উদ্ভিদ (Aquatic plants)

জল এবং বায়ুর সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে, জলজ উদ্ভিদ আবার চার ধরনের। যেমন—

(১) **জল-নিমগ্ন উদ্ভিদ (Submerged plants)**—এই ধরনের জলজ

উদ্ভিদের সমস্ত দেহ জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। পাতাশেওলা (*Vallisneria*), হাইড্রিলা (*Hydrilla*) ইত্যাদি জল-নিমগ্ন উদ্ভিদের উদাহরণ।

(২) **আংশিক জল-নিমগ্ন উদ্ভিদ (Partly submerged plants)**—এই-জাতীয় উদ্ভিদের দেহের প্রায় সবটুকুই জলের মধ্যে থাকে ; শুধু পত্র, পুষ্প ইত্যাদি জলের উপরে থাকে। যেমন—পদ্ম (*Nelumbium speciosum*), শালুক (*Nymphaea lotus*) প্রভৃতি।
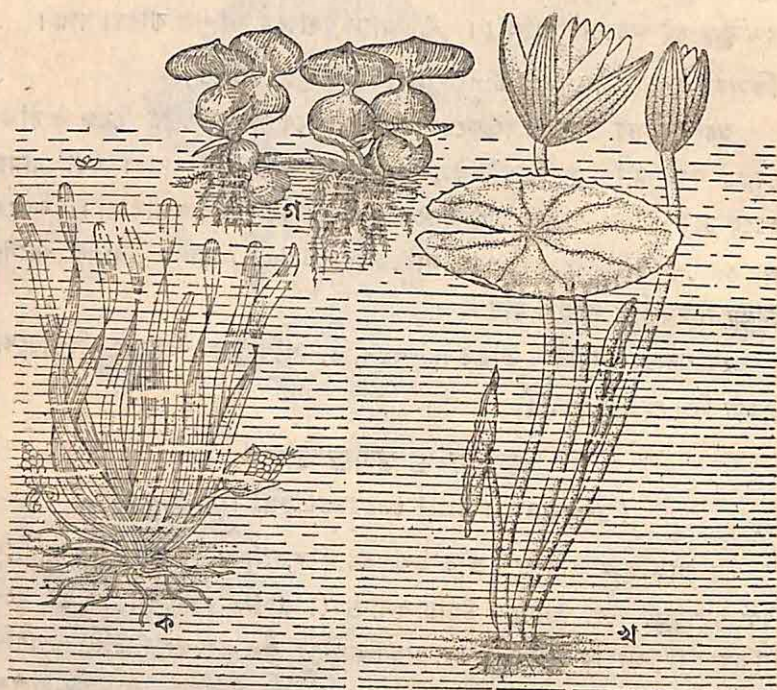
৪নং চিত্র—ক. জল-নিমগ্ন উদ্ভিদ (পাতাশেওলা), খ. আংশিক জল-নিমগ্ন উদ্ভিদ (শালুক) এবং গ. ভাসমান উদ্ভিদ (কচুরিপানা)।

(৩) **ভাসমান উদ্ভিদ (Floating plants)**—এই ধরনের জলজ উদ্ভিদের নিচের দিক মাটির সঙ্গে আটকানো থাকে না, জলের মধ্যে থাকে। সেইজন্য ইহারা জলের উপরের তলে ভাসিয়া, এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে পারে। যেমন—ঝাঁঝি (*Utricularia*), কচুরিপানা (*Eichhornia crassipes*), বড় পানা (*Pistia stratiotes*), খুদিপানা (*Lemna*)।

(৪) **উভচর উদ্ভিদ (Amphibious plants)**—এই শ্রেণীর উদ্ভিদ জলাশয়ের কিনারার দিকে জন্মায়। ইহাদের প্রায় অর্ধেক অংশ জলে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু উপরের বেশ-কিছু অংশ জলের উপরে (বায়ুতে) থাকে। পালিক

(*Rananculus*), স্যাজিটারিয়া (*Sagittaria*), লিম্‌নোফাইলা (*Limnophyla*) ইত্যাদি উভচর উদ্ভিদের উদাহরণ।

৫নং চিত্র—উভচর উদ্ভিদ : ক. পালিক, খ. লিম্‌নোফাইলা।

জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of aquatic plants)—নিমজ্জিত অংশের সব অঙ্গ দিয়া জল শোষিত হয় বলিয়া, জলজ উদ্ভিদে অল্প পরিমাণে মূল হয়। অনেক জলজ উদ্ভিদের মূলে মূলরোম (Root-hair) থাকে না। কচুরিপানা, খুদি-পানা ইত্যাদি ভাসমান উদ্ভিদের মূলে মূলত্র (Root-cap) থাকে না; তবে ইহার পরিবর্তে **মূলজেব** (Root-pocket) দেখা যায়। ঝাঁঝিতে আদৌ মূল হয় না।

জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড শক্ত হয় না। ইহাদের কাণ্ডে এবং পত্রে প্রচুর পরিমাণে **বায়ু-গহ্বর** (Air cavity) থাকে। সেইজন্য এই অঙ্গগুলি স্পঞ্জের মতো নরম। বায়ু-গহ্বরের মধ্যে যে বায়ু থাকে, উহা একদিকে যেমন উদ্ভিদকে প্লবতা (Buoyancy) দান করে, অর্থাৎ ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে, অন্যদিকে তেমনি উদ্ভিদের শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষের কাজে লাগে।

জল-নিমগ্ন উদ্ভিদের পত্র সাধারণতঃ সরু ও ফিতার মতো লম্বা, অথবা কাটা-কাটা হয়। এইরকম পত্রে পত্ররন্ধ্র (Stomata) অথবা কিউটিকল(Cuticle)-এর আবরণ থাকে না। আংশিক জল-নিমগ্ন উদ্ভিদের পত্র বেশ বড়। এই পত্রের শুধু উপরের তলে কিউটিকল-এর আবরণ এবং প্রচুর পরিমাণে পত্ররন্ধ্র থাকে। অনেক উভচর উদ্ভিদে দুই ধরনের পত্র দেখা যায়—জলে-ডোবা পত্রগুলি সরু সরু এবং জলের উপরের পত্রগুলি সাধারণ পত্রের মতো বড় বড়।

স্থলজ উদ্ভিদ (Terrestrial plants)

সাধারণতঃ বসতির বৈচিত্র্য অনুসারে, স্থলজ উদ্ভিদগুলিকে প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) জাঙ্গল উদ্ভিদ (Xerophytes), (২)

লবণাম্বু উদ্ভিদ (Halophytes), (৩) আর্দ্রভূমিজ উদ্ভিদ (Hygrophytes) এবং (৪) সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদ (Mesophytes)। নিচে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

জাঙ্গল উদ্ভিদ (Xerophytes)

শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায়, তাহাদের সাধারণভাবে **জাঙ্গল উদ্ভিদ** বা **জেরোফাইট** (**Xerophyte** ; গ্রীক *xeros* = শুষ্ক + *phyton* = উদ্ভিদ) বলা হয়। জাঙ্গল উদ্ভিদ আবার তিন ধরনের। যেমন—(ক) **মরু-উদ্ভিদ (Desert plants)**—ইহারা মরুভূমির শুষ্ক, বালুকাময় মাটিতে জন্মায় ; (খ) **মেরু-উদ্ভিদ (Arctic plants)**—ইহারা মেরুদেশের বরফাবৃত অঞ্চলে জন্মায় এবং (গ) **পার্বত্য উদ্ভিদ (Alpine plants)**—ইহারা পর্বতের শিখরের
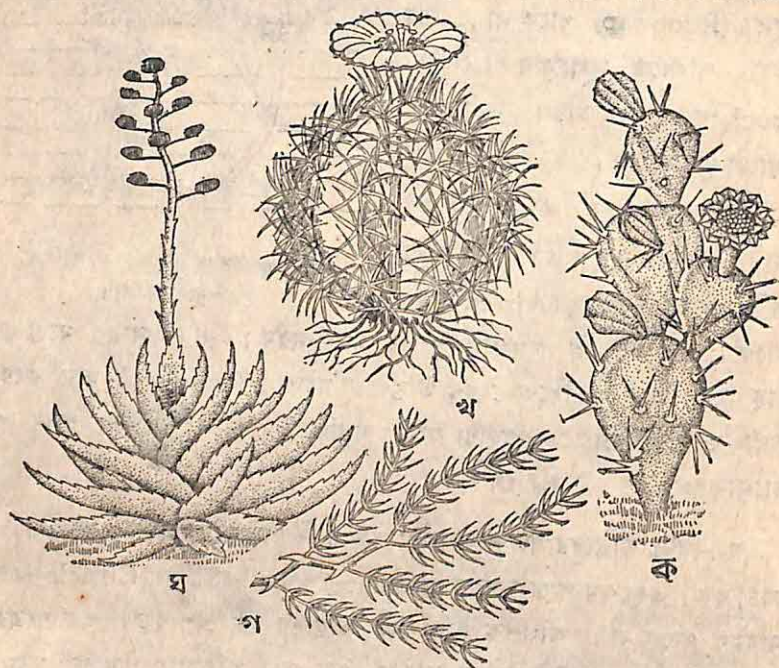
৬নং চিত্র—জাঙ্গল উদ্ভিদ : ক. ফণিমনসা, খ. ক্যাক্টাস, গ. শতমূলী (কাণ্ডের অংশ), ঘ. উক্কা।

দিকে পাথুরে মাটিতে জন্মায়। ফণিমনসা, তেশিরা মনসা বা বাজবরণ ও অন্যান্য ক্যাক্টাস, বাব্‌লা, আকাশমণি (*Acacia moniliformis*), করঞ্জা (*Carissa*), বুনো কুল, উক্কা (*Yucca*), অ্যাগেভ (*Agave*), শিয়াল-কাঁটা (*Argemone mexicana*), রাংচিতা (*Pedilanthus*), কাঁটা ন'টে (*Amarantus spinosus*), হুনিয়া শাক, পুঁই শাক (*Basella*), শতমূলী (*Asparagas*),

আকন্দ (*Calotropis*), করবী (*Nerium*), কাশ, ঝাউ, বাবুচ, পাইন, রডো-ডেনড্রন (*Rhododendron*) ইত্যাদি নানা ধরনের জাঙ্গল উদ্ভিদের উদাহরণ।

জাঙ্গল উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of xerophytes)—মাটির অনেক নিচের স্তর হইতে জল শোষণ করিতে হয় বলিয়া, জাঙ্গল উদ্ভিদের মূল খুব লম্বা ও শাখা-প্রশাখা-যুক্ত। অনেক জাঙ্গল উদ্ভিদে জল সঞ্চয় করিয়া রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। শতমূলীর রসালো ও মোটা মূলে, ক্যাকটাসের কাণ্ডে এবং অ্যাগেভ ও পুঁই শাকের পত্রে এইভাবে জল সঞ্চিত থাকে। অনেক সময় ইহাদের কাণ্ড চ্যাপ্টা ও পুরু পত্রের আকার ধারণ করে (যেমন—ফণিমনসার কাণ্ড), অথবা শাখা-কণ্টক(Thorn)-এ রূপান্তরিত হয় (যেমন—বৈঁচির কাঁটা)। অনেক জাঙ্গল উদ্ভিদের পত্র পত্র-কণ্টক(Spine)-এ রূপান্তরিত হয়। ইহাদের সাধারণ পত্রের ত্বক কিউটিক্‌ল(Cuticle)-এর আবরণ দিয়া ঢাকা থাকে। পত্রে নিহিত পত্ররন্ধ্র (Sunken stomata) থাকে।

লবণাম্বু উদ্ভিদ (Halophytes)

লাবণিক মৃত্তিকা (Saline soil) অর্থাৎ লোনা মাটিতে যে সব উদ্ভিদ জন্মায়, তাহাদের **লবণাম্বু উদ্ভিদ** বা **হ্যালোফাইট** (Halophyte ; গ্রীক

৭নং চিত্র—কয়েক ধরনের লবণাম্বু উদ্ভিদ।

hals=লবণ+*phyton*=উদ্ভিদ) বলে। যে মাটিতে বিভিন্ন ধরনের লবণ বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, তাহাকে **শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকা**

(**Physiologically dry soil**) বলে। লোনা মাটিতে জন্মায় বলিয়া, লবণাম্বু উদ্ভিদগুলির কয়েকটি শারীরবৃত্তীয় বিশেষত্ব দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চলে লবণাম্বু উদ্ভিদগুলি একরকম অরণ্য গঠন করে। ইহাকে **ম্যানগ্রোভ** (**Mangrove**) বলা হয়। সুন্দরবন ছাড়াও, ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত করমণ্ডল উপকূলেও লবণাম্বু উদ্ভিদ দেখা যায়। গরান (*Ceriops*), সুঁদরি (*Rhizophora*), কেওড়া (*Sonneratia*), বীণা (*Avicennia*), বিভিন্ন ধরনের পাম (Palm), নারিকেল (*Cocos*) প্রভৃতি লবণাম্বু উদ্ভিদের উদাহরণ।

লবণাম্বু উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of halophytes)—অধিকাংশ লবণাম্বু উদ্ভিদের শাখামূল সাধারণতঃ মাটির উপর খাড়াভাবে উঠিয়া আসে। সরু, সুচালো, গোঁজ(Peg)-এর মতো এই সমস্ত মূলের বায়ব অংশে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। ছিদ্রের মধ্য দিয়া মূলের ভিতর বায়ু প্রবেশ করিয়া শ্বসনে সাহায্য করে। এই কারণে ইহাদের **শ্বাসমূল** বা **নিউম্যাটোফোর** (Pneumatophore ; গ্রীক *pneuma*=বায়ু+*pherein*=বহন করা) বলে। শ্বাসমূল ছাড়াও, অধিকাংশ লবণাম্বু উদ্ভিদে **ঠেশমূল** বা **স্টিল্‌ট রুট** (**Stilt root**) দেখা যায়। কাণ্ডের নিচের দিকের পর্ব হইতে ঠেশমূল অস্থানিকভাবে উৎপন্ন হয় এবং তির্যকভাবে মাটিতে প্রবেশ করে। ঠেশমূলের জন্য জোয়ার-ভাটার টানে উদ্ভিদগুলি উপ্‌ড়াইয়া যায় না। লবণাম্বু উদ্ভিদের পত্র সাধারণতঃ রসালো ও পুরু হয়।

অধিকাংশ লবণাম্বু উদ্ভিদে **জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম** বা **ভিভিপেরাস জার্‌মিনেশান** (**Viviparous germination** ; ল্যাটিন *vivus*=জীবন্ত +*parere*=জন্মদান করা) দেখা যায়। এক্ষেত্রে জনিতৃ-উদ্ভিদ(Parent plant)-এ লাগিয়া থাকা অবস্থাতেই ফলের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। অঙ্কুরোদ্গমের সময় ভ্রূণমূল গদা(Club)-র মতো মোটা হইয়া বাড়িতে থাকে। শেষে, মোটা ভ্রূণমূলের ভারে ফলটি জনিতৃ-উদ্ভিদ হইতে খসিয়া পড়ে এবং খাড়াভাবে কাদায় গাঁথিয়া যায়।

আর্দ্রভূমিজ উদ্ভিদ (Hygrophytes)

যে উদ্ভিদগুলি স্বভাবতঃ ভিজা অথবা ছায়াচ্ছন্ন স্যাঁতসেঁতে মাটিতে জন্মায়, তাহাদের **আর্দ্রভূমিজ উদ্ভিদ** বা **হাইগ্রোফাইট** (**Hygrophyte** ; গ্রীক *hygros*=ভিজা+*phyton*=উদ্ভিদ) বলা হয়। অধিকাংশ আর্দ্রভূমিজ

উদ্ভিদই বীরুৎ-শ্রেণীর। উদাহরণ—কচু (*Colocasia esculenta*), ওল (*Amorphophallus campanulatus*), বিভিন্ন ধরনের ফার্ণ (Fern) প্রভৃতি।

আর্দ্রভূমিজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of hygrophytes)—আর্দ্রভূমিজ উদ্ভিদের মূল অপেক্ষাকৃত কম; কাণ্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃদ্গত গ্রন্থিকাণ্ড (Rhizome) অথবা গুঁড়িকন্দ(Corm)-এ পরিবর্তিত হয়। ইহাদের বায়ব অংশে জলজ উদ্ভিদের মতো বায়ুপূর্ণ বায়ু-গহ্বর থাকায়, স্পঞ্জের মতো নরম হয়। ইহাদের পত্রের ফলক প্রসারিত, মসৃণ এবং প্রচুর পত্ররন্ধ্র-যুক্ত।

৮নং চিত্র—আর্দ্রভূমিজ উদ্ভিদ (ফার্ণ)।

সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদ (Mesophytes)

সাধারণ উষ্ণতা ও আর্দ্রতায় **সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদ** বা **মেসোফাইট** (Mesophyte ; গ্রীক *mesos*=মধ্যম+*phyton*=উদ্ভিদ) জন্মায়। যে মাটিতে জলের পরিমাণ মাঝারি ধরনের, সেই জায়গার উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আম (*Mangifera*, ১৫নং চিত্র-ক), জাম (*Eugenia*), বট, শাল, সেগুন ইত্যাদি বৃক্ষ; জবা (*Hibiscus*, ১৬নং চিত্র-খ), চোত্রা (*Lantana*), গোলাপ (*Rosa*) ইত্যাদি গুল্ম এবং আলু (*Solanum*), পটল (*Trichosanthes*), কুমড়া (*Cucurbita*) ইত্যাদি বীরুৎ অর্থাৎ সচরাচর দেখা অধিকাংশ উদ্ভিদই সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদের অন্তর্গত।

সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of mesophytes)—ইহাদের মূল খুব লম্বা এবং শাখা-প্রশাখা-যুক্ত। মূলে মূলত্র এবং মূলরোম থাকে। মূলরোম দিয়া জল শোষিত হয়। কাণ্ড সাধারণতঃ শক্ত এবং মূলের মতো শাখা-প্রশাখা-যুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাণ্ড খাড়াভাবে থাকে। পত্রের আকৃতি ও গঠন নানা ধরনের। পত্রে অসংখ্য পত্ররন্ধ্র এবং কিউটিকল-এর পুরু আবরণ থাকে।

পরের পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদের একটি ছক দেওয়া হইল।

উদ্ভিদ (Plants)

- জলজ উদ্ভিদ (Aquatic plants)
  - জল-নিমগ্ন উদ্ভিদ (Submerged plants) — পাতাশেওলা
  - আংশিক জল-নিমগ্ন উদ্ভিদ (Partly submerged plants) — শালুক
  - ভাসমান উদ্ভিদ (Floating plants) — কচুরিপানা
  - উভচর উদ্ভিদ (Amphibious plants) — পালিক
- স্থলজ উদ্ভিদ (Terrestrial plants)
  - জাঙ্গল উদ্ভিদ (Xerophytes) — ফণিমনসা
  - লবণাম্বু উদ্ভিদ (Halophytes) — সুঁদরি
  - আর্দ্রভূমিজ উদ্ভিদ (Hygrophytes) — ফার্ণ
  - সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদ (Mesophytes) — আম

বিভিন্ন অন্তঃস্তর
(Different substratum)

উদ্ভিদের স্বাভাবিক জীবন-ধারণের জন্য যে পরিবেশ অপরিহার্য এবং যে মাধ্যম হইতে উদ্ভিদ পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে, তাহাকে উহার **অন্তঃস্তর** বা **সাব্‌স্ট্রেটাম*** (**Substratum** ; ল্যাটিন *sub*=নিচে+*stratum*=স্তর) বলে। বিভিন্ন ধরনের অন্তঃস্তরের মধ্যে জল, মাটি এবং পচনশীল জৈব পদার্থ উল্লেখযোগ্য।

জল (Water)—সমস্ত জলজ উদ্ভিদ জলে বাস করে। যদিও ভাসমান উদ্ভিদ ছাড়া অন্য সমস্ত জলজ উদ্ভিদের মূল মাটির মধ্যে থাকে, তবু এক্ষেত্রে জলকেই অন্তঃস্তর ধরা হয়। জল দুই ধরনের—**লোনা জল** (**Saline water**) এবং **মিঠা জল** (**Fresh water**)।

লোনা জলে বিভিন্ন লবণ অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। সাধারণতঃ শেওলা ছাড়া, লোনা জলে উন্নততর উদ্ভিদ দেখা যায় না।

খাল, বিল, নদী, পুকুর ইত্যাদি জলাশয়ের জল মিঠা। নানাধরনের শেওলা, বড় পানা, কচুরিপানা, ঝাঁঝি, পদ্ম, শালুক, পাতাশেওলা প্রভৃতি মিঠা জলের উদ্ভিদ।

জল-নিমগ্ন উদ্ভিদগুলি শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষের জন্য যথাক্রমে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন

* একবচন ; সাব্‌স্ট্রেটা (Substrata) — বহুবচন।

খাদ্যোপাদান জলে দ্রবীভূত অজৈব লবণ হইতে সংগ্রহ করে। অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, অবশ্য, স্থলজ উদ্ভিদের মতো গ্যাসের আদান-প্রদান হয়।

মাটি (Soil)—সমস্ত স্থলজ উদ্ভিদ মাটিতে জন্মায়। উদ্ভিদের মূল সাধারণতঃ মাটির মধ্যে থাকে। মূলের সাহায্যে ইহারা জল এবং অজৈব লবণ গ্রহণ করে। পত্র ও অন্যান্য বায়ব অংশ দিয়া গ্যাসের আদান-প্রদান হয়। বিভিন্ন ধরনের মাটির বিবরণের জন্য জীব-বিজ্ঞান—তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পচনশীল জৈব পদার্থ (Decaying organic matter)—অধিকাংশ মৃতজীবী (৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) উদ্ভিদ পচনশীল জৈব পদার্থের উপর বসবাস করে এবং সেখান হইতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক খাদ্য সংগ্রহ করে। পচনশীল জৈব পদার্থের মধ্যে ভিজা কাঠ, প্রাণীর বিষ্ঠা, গোময়, ফলের খোসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের অন্তঃস্তরে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানের মধ্যে কার্বন এবং নাইট্রোজেন-জাত যৌগের অভাব হয় না। উদ্ভিদগুলি অন্তঃস্তর হইতে বিশেষ ধরনের অঙ্গের সাহায্যে সরাসরি প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে। পচনশীল জৈব পদার্থে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায়, তাহাদের বিপাকের হার অপেক্ষাকৃত কম। অধিকাংশ ছত্রাক, কতকগুলি শেওলা, মনোট্রোপা (*Monotropa*) নামক সপুষ্পক উদ্ভিদ এই অন্তঃস্তরে দেখা যায়।

উল্লিখিত প্রধান তিনটি অন্তঃস্তর ছাড়া, আরও কয়েক ধরনের অন্তঃস্তর দেখা যায়। কতকগুলি উদ্ভিদ অন্যান্য উদ্ভিদ অথবা প্রাণি-দেহে বসবাস করে। ইহাদের মধ্যে আবার কিছু-সংখ্যক আশ্রয়দাতার দেহ হইতে খাদ্য শোষণ করে (যেমন—পরজীবী উদ্ভিদ, ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য); অন্য কতকগুলি আশ্রয়দাতার খাদ্যে অংশ গ্রহণ করে না (উদাহরণ—পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ, ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই দুই ক্ষেত্রে আশ্রয়দাতাকে অন্তঃস্তর হিসাবে ধরা হয়।

আগের তিনটি অনুচ্ছেদে উদ্ভিদের বসতিগত বৈচিত্র্যের বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরের অনুচ্ছেদগুলিতে উদ্ভিদের স্বভাবগত বৈচিত্র্যের কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

ব্রততী, রোহিণী এবং ঋজু উদ্ভিদ
(Creeping, Climbing and Erect plants)

উদ্ভিদের প্রধান অক্ষটিকে **কাণ্ড** বা **স্টেম** (Stem) বলে। কাণ্ড সাধারণতঃ মাটির উপরে থাকে এবং শাখা-প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল ধারণ করে। কাণ্ডে

অনেক গাঁইট থাকে। গাঁইটগুলিকে **পর্ব** বা **নোড (Node)** বলা হয়। পর পর অবস্থিত দুইটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশকে **পর্বমধ্য** বা **ইন্‌টার্‌নোড (Internode)** বলে। পর্ব এবং পর্বমধ্য উচ্চতর উদ্ভিদের কাণ্ডের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অধিকাংশ উদ্ভিদের কাণ্ড মোটা এবং সাধারণতঃ কাষ্ঠল (Woody)। সেইজন্য ইহারা সহজে মাটির উপর খাড়াভাবে থাকিয়া, সমগ্র দেহের ভার বহন করিতে পারে। ইহাদের **ঋজু উদ্ভিদ (Erect plants)** বলে। আবার, কিছু-সংখ্যক উদ্ভিদের কাণ্ড সাধারণতঃ সরু ও খুব লম্বা এবং অনেক সময় কাষ্ঠবিহীন ও নরম। কাজেই, এইরকম উদ্ভিদ মাটির উপর খাড়াভাবে থাকিতে পারে না। ইহাদের **দুর্বল কাণ্ড-যুক্ত উদ্ভিদ (Weak stem plants)** বলা হয়। দুর্বল কাণ্ড-যুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে ব্রততী এবং রোহিণী উল্লেখযোগ্য। নিচে ইহাদের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হইল।

ব্রততী (Creeper)

যে সমস্ত উদ্ভিদ মাটির সঙ্গে অনুভূমিকভাবে (Horizontally) এবং শয়ান (Prostrate) অবস্থায় মাটিকে আশ্রয় করিয়া বাড়ে, তাহাদের **ব্রততী (Creepers)** বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাদের কাণ্ডের পর্ব হইতে অস্থানিক
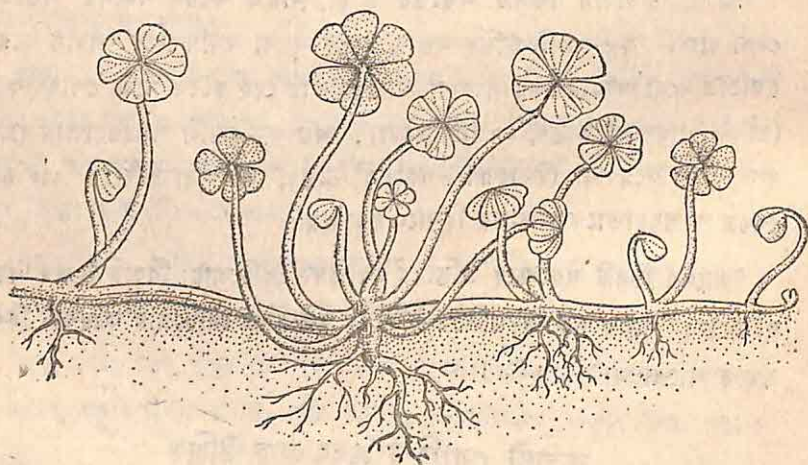
৯নং চিত্র—ব্রততী (আমরুল)।

মূল (Adventitious roots) বাহির হয়। রাঙা-আলু (*Ipomoea*), দূর্বাঘাস (*Cynodon*), আমরুল (*Oxalis*) ইত্যাদি ব্রততীর উদাহরণ।

কতকগুলি ব্রততীর পর্ব হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয় না। ইহাদের **আনুগমিক ব্রততী (Trailers)** বলে। উদাহরণ—পুঁই শাক (*Basella*), সুনিয়া শাক (*Evolvulus*), বাসন্তী (*Lindenbergia urticifolia*) ইত্যাদি।
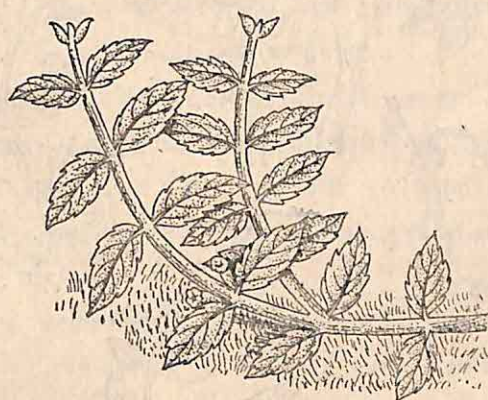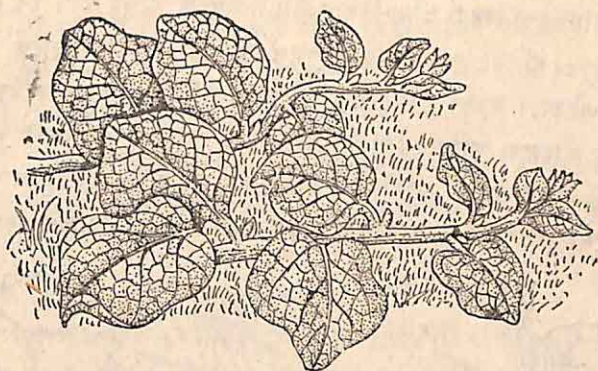
১০নং চিত্র—আনুগমিক ব্রততী :
(উপরে) পুঁই শাক, (নিচে) বাসন্তী।

রোহিণী (Climbers)

যে সমস্ত উদ্ভিদের কাণ্ড অন্য কোনও আশ্রয় অথবা অবলম্বনকে জড়াইয়া উপরের দিকে অর্থাৎ উল্লম্বভাবে (Vertically) বাড়ে, তাহাদের **রোহিণী (Climbers)** বলে। আরোহণের জন্য ইহাদের দেহে সাধারণতঃ নানা ধরনের অঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই অঙ্গগুলিকে আরোহণ-অঙ্গ (Climbing organs) বলে।

আকর্ষ-রোহিনী (Tendril climbers)

অধিকাংশ রোহিণী **আকর্ষ** বা **টেন্‌ড্রিল** (Tendril) নামের বিশেষ একধরনের আরোহণ-অঙ্গের সাহায্যে আরোহণ করে। সুতার মতো সরু, পত্র-বিহীন, শাখা-যুক্ত অথবা শাখা-বিহীন উদ্ভিদ-অঙ্গকে আকর্ষ বলা হয়। সুবেদী (Sensitive) বলিয়া, অবলম্বনের সংস্পর্শে আসিয়া আকর্ষ উহাকে প্যাঁচাইয়া ধরে। এইভাবে আকর্ষ রোহিণীকে আরোহণ করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। আকর্ষের সাহায্যে আরোহণকারী রোহিণীদের **আকর্ষ-রোহিণী** (Tendril climbers) বলা হয়। নানারকম উদ্ভিদ-অঙ্গ রূপান্তরিত হইয়া আকর্ষ উৎপন্ন হয়। সেই অনুসারে, নিচে বর্ণিত কয়েক ধরনের আকর্ষ-রোহিণী দেখা যায়।
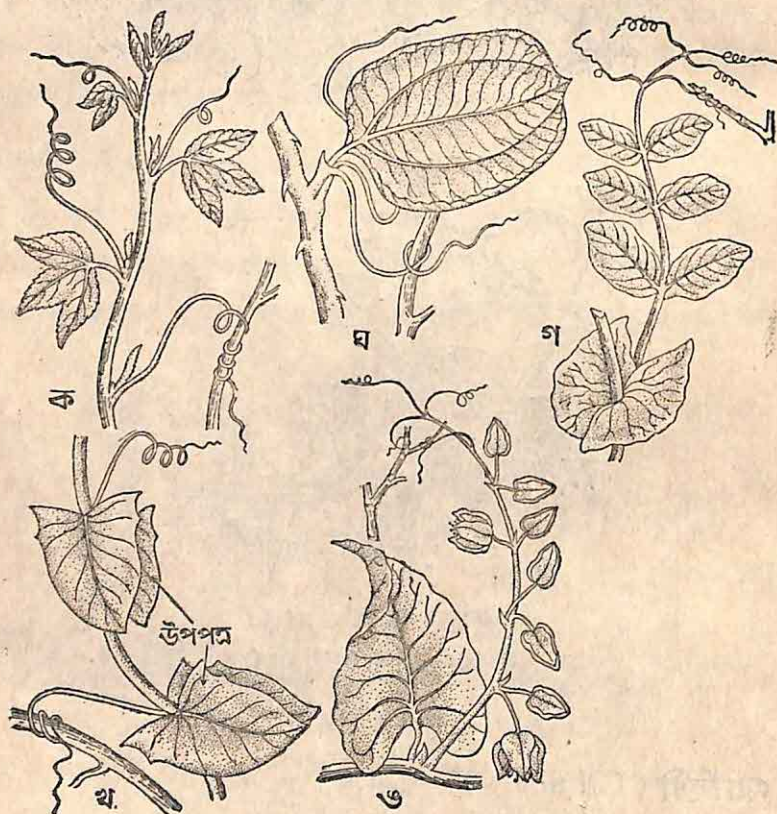
১১নং চিত্র—আকর্ষ-রোহিণী : ক. শাখা-আকর্ষ-রোহিণী (ঝুম্‌কালতা), খ. পত্রাকর্ষ-রোহিণী (জংলী মটর), গ. পত্রকাকর্ষ-রোহিণী (মটর), ঘ. উপপত্রাকর্ষ-রোহণী (কুমারিকা), ঙ. মঞ্জরী-আকর্ষ-রোহিণী (অনন্তলতা)।

(১) . **শাখা-আকর্ষ-রোহিণী** (Stem-tendril climber)—ঝুম্‌কালতা (*Passiflora*) এবং আঙুরলতাকে **শাখা-আকর্ষ-রোহিণী** (Stem-

tendril climbers) বলা হয় ; কারণ, ইহাদের যথাক্রমে কাক্ষিক মুকুল এবং অগ্রমুকুল রূপান্তরিত হইয়া যে আকর্ষ সৃষ্টি করে, তাহাদের শাখা-আকর্ষ (Stem-tendrils) বলে।

(২) **পত্রাকর্ষ-রোহিণী** (Leaf-tendril climber)—জংলী মটর (*Lathyrus*)-এর সম্পূর্ণ যৌগপত্র রূপান্তরিত হইয়া আকর্ষ সৃষ্টি করে। সেইজন্য এইরকম আকর্ষকে পত্রাকর্ষ (Leaf-tendril), এবং জংলী মটর গাছকে **পত্রাকর্ষ-রোহিণী** (Leaf-tendril climber) বলা হয়।

(৩) **পত্রকাকর্ষ-রোহিণী** (Leaflet-tendril climber)—মটর (*Pisum*) গাছকে **পত্রকাকর্ষ-রোহিণী** (Leaflet-tendril climber) বলা হয় ; কারণ, এই গাছের যৌগপত্রের শীর্ষদেশের কয়েকটি পত্রক (Leaflet) রূপান্তরিত হইয়া পত্রকাকর্ষ (Leaflet-tendril) সৃষ্টি করে।

(৪) **উপপত্রাকর্ষ-রোহিণী** (Stipule-tendril climber)—কুমারিকা (*Smilax*) গাছের উপপত্র (Stipule) দুইটি রূপান্তরিত হইয়া দুইটি উপপত্রাকর্ষ (Stipule-tendril) সৃষ্টি করে বলিয়া, এই রোহিণী **উপপত্রাকর্ষ-রোহিণী** (Stipule-tendril climber) নামে পরিচিত।

(৫) **মঞ্জরী-আকর্ষ-রোহিণী** (Inflorescence-tendril climber) —অনন্তলতা (*Antigonon*) **মঞ্জরী-আকর্ষ-রোহিণী**(Inflorescence-tendril climber)-র উদাহরণ। ইহার পুষ্পবিন্যাস(Inflorescence)-এর শীর্ষদেশের কয়েকটি পুষ্পমুকুল রূপান্তরিত হইয়া মঞ্জরী-আকর্ষ (Inflorescence-tendril) সৃষ্টি করে।

আরও কয়েক ধরনের রোহিণী মূল, পত্র, অঙ্কুশ, কণ্টক ইত্যাদি অঙ্গের সাহায্যে আরোহণ করে। ইহাদের বিবরণ একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য-নির্ঘণ্ট-ভুক্ত (জীব-বিজ্ঞান—তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

উপরে বর্ণিত রোহিণী ছাড়া, আরও দুই ধরনের রোহিণী দেখা যায়। ইহাদের কোনও বিশিষ্ট আরোহণ-অঙ্গ থাকে না। ইহারা সরাসরি কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখার সাহায্যে আশ্রয়দাতাকে জড়াইয়া উপরে উঠে। সেই হিসাবে, কাণ্ডই ইহাদের আরোহণ-অঙ্গ বলা যায়। বল্লী এবং কাষ্ঠল লতা এই-জাতীয় রোহিণী। নিচে ইহাদের বিবরণ দেওয়া হইল।

বল্লী (Twiners)

ইহারা **কাণ্ড-রোহিণী** (Stem climbers) নামেও পরিচিত। বল্লীর কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখা সরু, দীর্ঘ পর্বমধ্য-যুক্ত, নমনীয় এবং কাষ্ঠবিহীন।

আবর্ত-পদ্ধতি অনুযায়ী, বল্লীকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) **দক্ষিণাবর্ত** বা **ডেক্‌স্ট্রোজ** (**Dextrose** ; ল্যাটিন *dexter* = ডান)—
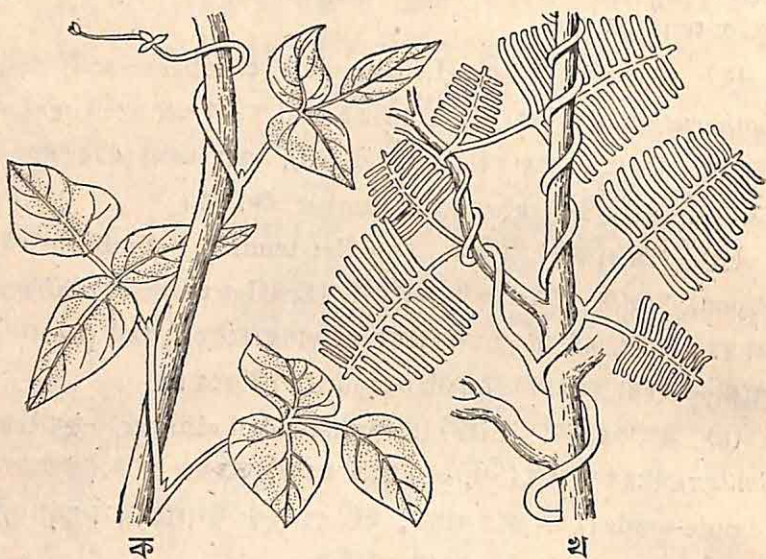
১২নং চিত্র—বল্লী : ক. দক্ষিণাবর্ত (শিম), খ. বামাবর্ত (তরুলতা)।

ইহারা আশ্রয়দাতার ডানদিক হইতে বাঁদিকে আবর্তিত হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়। উদাহরণ—শিম (*Dolichos*), খাম-আলু (*Discorea*)। (২) **বামাবর্ত** বা **সিনিস্ট্রোজ** (**Sinistrose** ; ল্যাটিন *sinister* = বাম)—এই ধরনের বল্লী আশ্রয়দাতার বাঁদিক হইতে ডানদিকে আবর্তিত হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়। উদাহরণ—অপরাজিতা (*Clitoria*), তরুলতা (*Ipomoea*) ইত্যাদি এই-জাতীয় বল্লীর আদর্শ উদাহরণ।
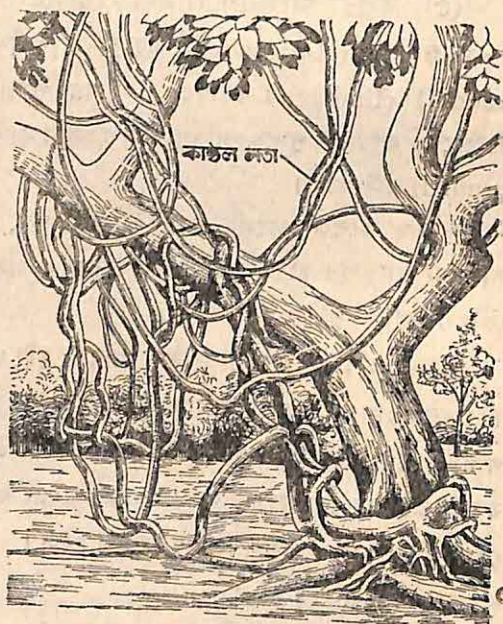
১৩নং চিত্র—কাষ্ঠল লতা।

কাষ্ঠল লতা (Lianes)

ইহারা একধরনের বহুবর্ষজীবী (৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) রোহিণী এবং গভীর অরণ্যে বড় বড় উদ্ভিদকে অবলম্বন করিয়া বেশি পরিমাণে সূর্যালোক পাওয়ার জন্য উপরে উঠে। অপরিণত কাষ্ঠল লতা বল্লীর মতো সরু, নমনীয় ও কাষ্ঠবিহীন; কিন্তু পরিণত কাষ্ঠল লতার কাণ্ড অপেক্ষাকৃত মোটা এবং কাষ্ঠল ও শক্ত হয়। উদাহরণ—মাধবীলতা (*Hiptage bengalenis*), লতাকাঞ্চন (*Beaumontia*) ইত্যাদি (১৩নং চিত্র)।

ঋজু উদ্ভিদ (Erect plants)

ঋজু উদ্ভিদ প্রধানতঃ তিন ধরনের। যেমন—

(ক) **শাখাযুক্ত (Branched)**—কাণ্ড হইতে প্রচুর শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে শাখাযুক্ত উদ্ভিদ বলে। কতকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ডের নিচের শাখা-প্রশাখাগুলি শীর্ষদেশের শাখা-প্রশাখার চেয়ে বেশি প্রসারিত হয়। এক্ষেত্রে কাণ্ডের প্রধান অক্ষটির বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ফলে, শাখা-প্রশাখাসহ কাণ্ডকে পিরামিডের মতো দেখায়। ইহাদের **পিরামিডাকার** বা **এক্স্‌-কারেন্ট** (Excurrent ; ল্যাটিন *ex* = বাহির + *currer* = গতি) বলে। উদাহরণ—দেবদারু (*Polyalthia longifolia*), পাইন, বিলাতী ঝাউ ইত্যাদি। আবার, আম (১৫নং চিত্র-ক) বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি উদ্ভিদের প্রধান কাণ্ডের চেয়ে শাখা-প্রশাখাগুলি বেশি বাড়িয়া যাওয়ায়, ইহাদের গম্বুজের মতো দেখায়। ইহাদের **গম্বুজাকার** বা **ডেলিক্যুইসেন্ট** (Deliquescent ; ল্যাটিন *deliquescere* = ভঙ্গুর) বলা হয়।

১৪নং চিত্র—পিরামিডাকার (দেবদারু)।

(খ) **অশাখ** বা **কডেক্স** (Caudex ; ল্যাটিন *caudex* = গুঁড়ি)—নারিকেল, তাল (*Borassus flabellifer*), সুপারি (*Areca catechu*) প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড স্তম্ভের মতো খাড়া থাকে। ইহাদের শাখা-প্রশাখা হয় না এবং পত্রগুলি কাণ্ডের শীর্ষে মুকুটের মতো বিন্যস্ত থাকে। এইরকম উদ্ভিদকে অশাখ বলে।

(গ) তৃণকাণ্ড (Culm ; ল্যাটিন *culmus*=ডাঁটি)—বাঁশ (*Bambusa tulda*), ধান (*Oryza sativa*), গম (*Triticum aestivum*) ইত্যাদি
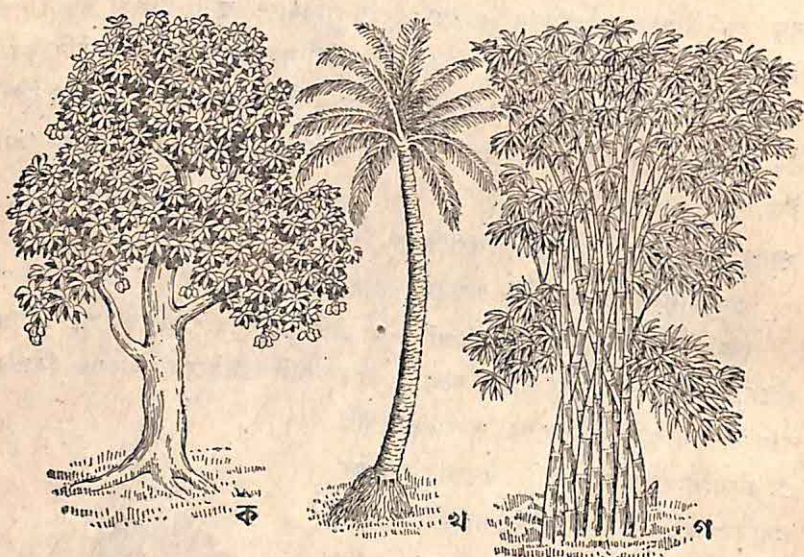
১৫নং চিত্র—ক. গম্বুজাকার (আম), খ. অশাখ (নারিকেল), গ. তৃণকাণ্ড (বাঁশ)।

অধিকাংশ তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ডের পর্বগুলি ভরাট, কিন্তু পর্বমধ্যগুলি ফাঁপা। এই-জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ডকে তৃণকাণ্ড বলা হয়।

বীরুৎ, গুল্ম এবং বৃক্ষ
(Herb, Shrub and Tree)

কাণ্ডের গঠন, প্রকৃতি এবং সামগ্রিক উচ্চতা অনুসারে, ঋজু উদ্ভিদগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) বীরুৎ (Herb ; ল্যাটিন *herba*=সবুজ শস্য)—এই-জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ড খুব ছোট, নরম, রসালো এবং কাষ্ঠবিহীন। বীরুৎ সাধারণতঃ কয়েক মিলিমিটার হইতে এক মিটার অথবা তাহার কাছাকাছি উঁচু হয়। ধান, সরিষা (*Brassica*), মূলা (*Raphanus*), খুদিপানা, আদা (*Zingiber*) ইত্যাদি বীরুৎ-শ্রেণীর উদ্ভিদ। কলাগাছ বীরুৎ হইলেও, কয়েক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।

(২) গুল্ম (Shrub)—ইহারা মাঝারি উচ্চতার উদ্ভিদ। গুল্মের কাণ্ড অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং কাষ্ঠল। মাটির কাছাকাছি অঞ্চলে, গুল্মের কাণ্ড হইতে অসংখ্য ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা বাহির হয়। ফলে, সমগ্র উদ্ভিদটিকে ঝোপের

মতো দেখায়। গুল্মের প্রধান কাণ্ড বা গুঁড়ি (Trunk) থাকে না। গোলাপ, জবা (*Hibiscus*), কাঁঠালি-চাঁপা (*Artabotrys*) ইত্যাদি গুল্মের উদাহরণ।
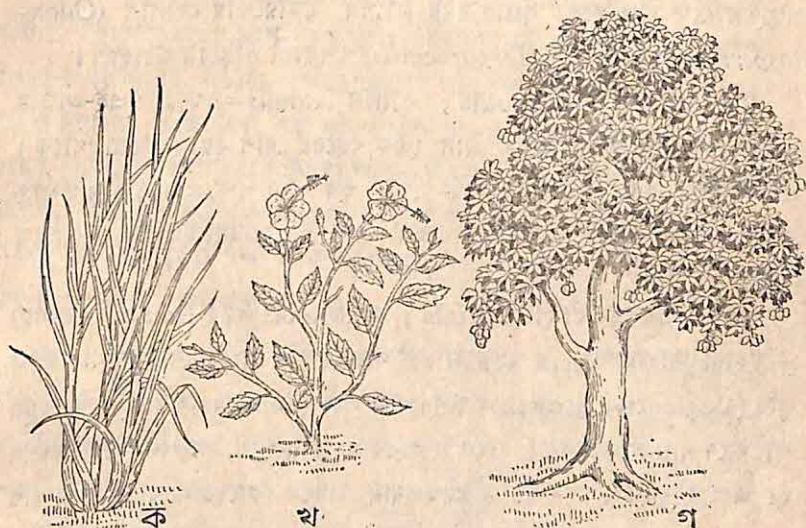
১৬নং চিত্র—ক. বীরুৎ (ধান), খ. গুল্ম (জবা) এবং গ. বৃক্ষ (আম)।

(৩) বৃক্ষ (Tree)—ইহারা সবচেয়ে উঁচু উদ্ভিদ। বৃক্ষে একটি স্পষ্ট, মোটা, শক্ত ও কাষ্ঠল প্রধান কাণ্ড বা গুঁড়ি (Trunk) থাকে। গুঁড়ির উপরের দিক হইতে কাষ্ঠল ও শক্ত শাখা-প্রশাখা বাহির হয়। আম, বট, শাল, সেগুন ইত্যাদি বৃক্ষের উদাহরণ। তাল, নারিকেল (১৫নং চিত্র-খ) ইত্যাদি অশাখ কাণ্ড-যুক্ত উদ্ভিদ শাখা-বিহীন বৃক্ষ। ইউক্যালিপ্টাস (*Eucalyptus*), রেড-উড (Redwood) প্রভৃতি কয়েকটি বৃক্ষ ৯০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। আবার, ড্রাগন-উদ্ভিদ (Dragon-plant) নামের বৃক্ষ সবচেয়ে মোটা হয়। ইহাদের কাণ্ডের পরিধি ১৪ মিটার পর্যন্ত হইতে পারে।

ক্ষণস্থায়ী, বর্ষজীবী, দ্বিবর্ষজীবী এবং বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ (Ephemeral, Annual, Biennial and Perennial plants)

সব উদ্ভিদের জীবন-কাল (Duration of life) সমান নয়। কোন উদ্ভিদ কতদিন বাঁচে, সেই অনুসারে বীরুৎ-শ্রেণীর উদ্ভিদগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

(১) ক্ষণস্থায়ী (Ephemerals ; গ্রীক *ephemeros* = একদিন বাঁচা)— মরু-অঞ্চলের প্রচণ্ড উষ্ণতা এবং শীতপ্রধান অঞ্চলের তীব্র ঠাণ্ডায় এই-জাতীয়

বীরুৎ জন্মায়। চরম জলবায়ুর জন্য ইহাদের জন্ম, বৃদ্ধি এবং পুষ্প, ফল ও বীজ ধারণ করার পর স্বাভাবিকভাবে মরিয়া যাইতে অর্থাৎ জীবন-চক্র (Life-cycle) সম্পূর্ণ করিতে মাত্র কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে। জেরিকোর গোলাপ (*Odontospermum*), মরুলিলি (*Hesparocallis*) ক্ষণস্থায়ী উদ্ভিদের উদাহরণ।

(২) **বর্ষজীবী (Annuals**; ল্যাটিন *annus*=বৎসর)—এই-জাতীয় বীরুৎ নির্দিষ্ট ঋতুতে কয়েক মাস (এক বছরের বেশি নয়) বাঁচিয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যেই ইহাদের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয় এবং পুষ্প, ফল ও বীজ উৎপন্ন করিয়া, নির্দিষ্ট ঋতুর শেষে মরিয়া যায়। ধান, গম, সরিষা ইত্যাদি অধিকাংশ বীরুৎ বর্ষজীবী।

(৩) **দ্বিবর্ষজীবী (Biennials**; ল্যাটিন *bis*=দুই+*annus*=বৎসর) —ইহারা সাধারণতঃ দুই বছর বাঁচিয়া থাকে। প্রথম বছরে ইহাদের অঙ্গজ বৃদ্ধি (Vegetative growth) সম্পূর্ণ হয় এবং মূলে অথবা অন্যান্য অঙ্গে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চিত হয়। দ্বিতীয় বছরে ইহাদের পুষ্প, ফল ও বীজ উৎপন্ন হয় এবং জীবন-চক্র শেষ হয়। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ইহাদের সচরাচর দেখা যায় না। শীতপ্রধান অঞ্চলে মূলা, গাজর, বীট, কপি প্রভৃতি উদ্ভিদ দ্বিবর্ষজীবী।

(৪) **বহুবর্ষজীবী (Perennials**; ল্যাটিন *per*=ব্যাপিয়া+*annus*=বৎসর)—যে সমস্ত উদ্ভিদ দুই বছরের বেশি বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ বলা হয়। প্রতি বছর একটি বিশেষ ঋতুতে ইহাদের পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হয়। সমস্ত বৃক্ষ ও গুল্ম এবং আদা, ডালিয়া (*Dahlia*) ইত্যাদি কতকগুলি বীরুৎ বহুবর্ষজীবী। বহুবর্ষজীবী বীরুতের বায়ব অংশ পুষ্প, ফল ও বীজ উৎপন্ন করিয়া মরিয়া গেলেও, মৃদ্‌গত কাণ্ডটি জীবিত থাকে। অনুকূল ঋতুতে আবার মৃদ্‌গত কাণ্ড হইতে বায়ব অংশ বাহির হয়। কলাগাছও বহুবর্ষজীবী বীরুতের উদাহরণ। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ কয়েক বছর হইতে কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত বাঁচিতে পারে। শাল, সেগুন ইত্যাদি বৃক্ষ দেড়শ' বছর পর্যন্ত এবং ইউক্যালিপ্‌টাস তিনশ' বছর পর্যন্ত বাঁচে। আবার, ড্রাগন-উদ্ভিদ যে ছ'হাজার বছর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

স্বভোজী ও পরভোজী উদ্ভিদ
(Autophytes and Heterophytes)

অধিকাংশ উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করিতে পারে। কিছু-সংখ্যক উদ্ভিদ, আবার, খাদ্যের জন্য পর-নির্ভরশীল। পুষ্টি-পদ্ধতি (Modes of nutrition) অনুসারে, উদ্ভিদকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

স্বভোজী উদ্ভিদ (Autophytes)

এই জাতীয় উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল (Chlorophyll) নামের সবুজ কণা থাকায়, ইহাদের বায়ব অংশ সবুজ হয়। ইহারা মাটি ও বায়ু হইতে অজৈব খাদ্যোপাদান সংগ্রহ করিয়া, ক্লোরোফিলের সাহায্যে জল-অঙ্গার(Carbohydrate)-জাতীয় খাদ্য এবং উহা হইতে ক্রমে অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যও প্রস্তুত করে। কাজেই, খাদ্য-বিষয়ে ইহারা আত্মনির্ভর। সেইজন্য ইহাদের **স্বভোজী উদ্ভিদ, অটোফাইট** (Autophyte ; গ্রীক *autos*=নিজ+*phyton*= উদ্ভিদ) বা **অটোট্রোপিক উদ্ভিদ** (Autotropic plant ; গ্রীক *autos*= নিজ+*tropein*=পুষ্টি) বলে।

রাস্না (*Vanda*) প্রভৃতি অধিকাংশ অর্কিড (Orchid) এবং কতকগুলি মস (Moss) ও ফার্ণ (Fern) বড় বড় বৃক্ষের উপর বাস করে। ইহারা কেবল আশ্রয়ের জন্য আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য ইহাদের **পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ** বা **এপিফাইট** (Epiphyte ; গ্রীক *epi*=উপরে+*phyton* =উদ্ভিদ) বলে। ইহারা সবুজ এবং খাদ্য-বিষয়ে স্ব-নির্ভর। অতএব, পরাশ্রয়ী উদ্ভিদও স্বভোজী। পরাশ্রয়ী অর্কিডের মূল দুই ধরনের—(১) সরু
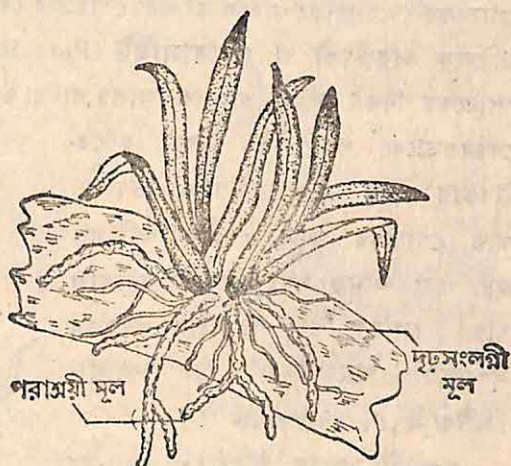
১৭নং চিত্র—পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ (রাস্না)।

দৃঢ়সংলগ্নী মূল (Clinging roots)—আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের বল্কলকে আঁকড়াইয়া ধরে এবং সেখানে সঞ্চিত ময়লা হইতে খাদ্যোপাদান শোষণ করে ; (২) মোটা এবং বায়ুতে দোদুল্যমান পরাশ্রয়ী মূল (Epiphytic roots) বা বায়ব শোষক মূল (Aerial absorbing roots) বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে।

পরভোজী উদ্ভিদ (Heterophytes)

অনেক উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল না থাকায়, ইহারা খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। আবার, কিছু-সংখ্যক সবুজ উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত

করিতে পারিলেও, বিপাকের বিশেষত্বের জন্য, অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈয়ারি করিতে পারে না। এই উদ্ভিদগুলিকে খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিক-ভাবে অন্য উৎসের উপর নির্ভর করিতে হয়। সেইজন্য ইহাদের **পরভোজী উদ্ভিদ, হেটারোফাইট** (Heterophyte ; গ্রীক *heteros*=অন্য+*phyton*=উদ্ভিদ) বা **হেটারোট্রোপিক উদ্ভিদ** (Heterotropic plant ; গ্রীক *heteros*=অন্য+*tropein*=পুষ্টি) বলা হয়। খাদ্যের উৎস অনুযায়ী, পরভোজী উদ্ভিদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

পরজীবী (Parasites)

এই শ্রেণীর উদ্ভিদ অন্য কোনও জীবিত উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর দেহে আশ্রয় নেয় এবং আশ্রয়দাতার দেহ হইতে আশ্রয়দাতার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত খাদ্য শোষণ করে। আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ অথবা প্রাণীকে **পোষক** (Host) বলে। পোষকের দেহে আশ্রয়-গ্রহণকারী এবং পোষকের দেহ হইতে খাদ্য-শোষণকারী উদ্ভিদকে **পরজীবী** বা **প্যারাসাইট** (Parasite)* বলা হয়। পরজীবী পোষকের নিকট হইতে খাদ্য ও আশ্রয় পাইয়া উপকৃত হয়। কিন্তু পোষক কোনওভাবে পরজীবীর নিকট হইতে উপকার পায় না। উপরন্তু, ক্রমাগত খাদ্য শোষণের ফলে, পোষক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক সময় পোষক মরিয়াও যায়। পোষক এবং পরজীবীর এইরকম সম্পর্ককে **পরজীবিতা** বা **প্যারাসিটিজ্‌ম** (Parasitism)* বলে।

পরজীবী সপুষ্পক উদ্ভিদ(৫০ পৃষ্ঠা)-এর কাণ্ড অথবা মূল হইতে একরকম বিশেষ ধরনের মূল সৃষ্টি হয়। এই মূলকে **চোষক মূল** (Sucking roots) বা **হস্টোরিয়া**† (Haustoria ; ল্যাটিন *haurire*=পান করা) বলে। চোষক মূল পোষকের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা অথবা মূলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সেখান হইতে খাদ্য শোষণ

১৮নং চিত্র—পূর্ণ পরজীবী উদ্ভিদ—কাণ্ডে (স্বর্ণলতা)।

* পরজীবী ও পরজীবিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য, জীব-বিজ্ঞান—তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

† বহুবচন ; হস্টোরিয়াম (Haustorium) — একবচন।

করে। পরজীবী ছত্রাক(৫৭ পৃষ্ঠা)-এর কতকগুলি অণুসূত্র বা হাইফি*(Hyphae) একইভাবে পোষকের দেহে প্রবেশ করে।

অধিকাংশ পরজীবী উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে না বলিয়া, ইহারা সবুজ নয়। কাজেই, ইহারা পোষকের দেহ হইতে প্রয়োজনীয় সব খাদ্যই শোষণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের **পূর্ণ পরজীবী** (Total parasites) বলে। স্বর্ণলতা (*Cuscuta*), বেনে-বৌ (*Orobanche*), ব্যালানোফোরা (*Balanophora*) ইত্যাদি সপুষ্পক উদ্ভিদ পূর্ণ পরজীবীর উদাহরণ। স্বর্ণলতা (১৮নং চিত্র) সোনালী-হলুদ রঙের সরু লতা-বিশেষ। ইহারা নানা উদ্ভিদের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার উপর পরজীবী। বেনে-বৌ, বেগুন, তামাক, সরিষা প্রভৃতি উদ্ভিদের
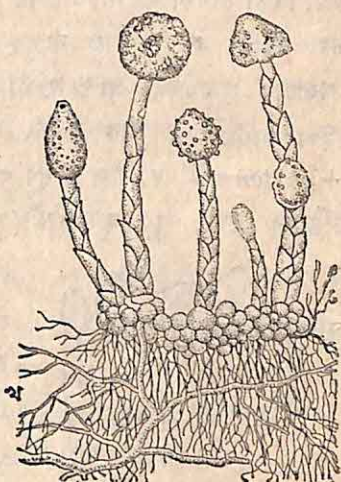
১৯নং চিত্র—পূর্ণ পরজীবী উদ্ভিদ—মূলে : ক. বেনে-বৌ, খ. ব্যালানোফোরা।

মূলে পরজীবী। পাক্‌সিনিয়া (*Puccinia*, ৩১নং চিত্র-ঙ) উস্‌টিলাগো (*Ustilago*) এবং আরও অনেক ছত্রাক পূর্ণ পরজীবী। এই দুই ধরনের ছত্রাক গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি উদ্ভিদের বায়ব অংশের পরজীবী। একরকম ছত্রাকের আক্রমণে মানুষের ছুলি রোগ হয়।

কিছু-সংখ্যক পরজীবী উদ্ভিদ সবুজ হয়। ইহারা কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারিলেও, অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য ইহাদের পোষকের উপর নির্ভর করিতে হয়। খাদ্যের জন্য আংশিক পর-নির্ভর বলিয়া,

* বহুবচন ; হাইফা (Hypha) — একবচন।

ইহারা **আংশিক পরজীবী** (**Semiparasite, partial parasite**) নামে পরিচিত। বান্দা (*Viscum*) আম গাছের শাখায় আংশিক পরজীবীরূপে বাস করে। চন্দন (*Santalum album*) গাছও আংশিক পরজীবী। ইহারা কাছাকাছি অবস্থিত অন্য উদ্ভিদের মূল হইতে খাদ্য শোষণ করে।

২০নং চিত্র—আংশিক পরজীবী উদ্ভিদ (বান্দা)।

মৃতজীবী (**Saprophytes**)

যে সমস্ত পরভোজী উদ্ভিদ পচনশীল জৈব (উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ) পদার্থপূর্ণ মাটি, গোময় ও অন্যান্য প্রাণীর বিষ্ঠা, ভিজা কাঠ, ভিজা চামড়া ইত্যাদির উপর জন্মায় এবং সেখান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, তাহাদের **মৃতজীবী** বা **স্যাপ্রোফাইট** (**Saprophyte**; গ্রীক *sapros*=পচা +*phyton*=উদ্ভিদ) বলে। পূর্ণ পরজীবী উদ্ভিদের মতো, **পূর্ণ মৃতজীবী**(**Total saprohyte**)-ও সবুজ হয় না। ইহারা আদৌ খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না—সমস্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যই পচনশীল জৈব পদার্থ হইতে শোষণ করে। ব্যাঙের ছাতা (*Psalliota*, ৩১নং চিত্র-ঘ), মিউকোর (*Mucor*, ৩১নং চিত্র-ক), পেনিসিলিয়াম (*Penicillium*, ৩১নং চিত্র-গ) ইত্যাদি অধিকাংশ (পরজীবী ছত্রাক ছাড়া) ছত্রাকই পূর্ণ মৃতজীবী। মনোট্রোপা (*Monotropa*) নামক সপুষ্পক উদ্ভিদ-ও পূর্ণ মৃতজীবী। কয়েকটি মৃতজীবী উদ্ভিদ সবুজ এবং ইহারা আংশিকভাবে খাদ্য প্রস্তুত-ও করিতে পারে। তবে ইহারা ইহাদের মূলে বসবাসকারী ছত্রাকের সাহায্যে পরোক্ষভাবে গলিত জৈব পদার্থও শোষণ করে। ইহাদের **আংশিক মৃতজীবী** (**Partial saprophyte**) বলা যায়।
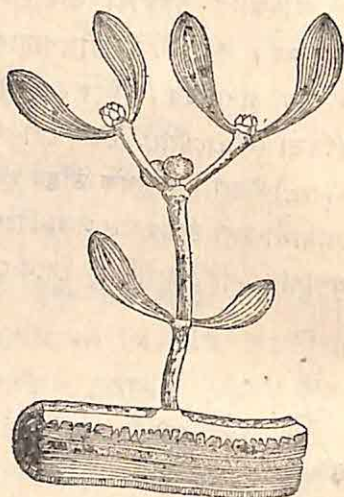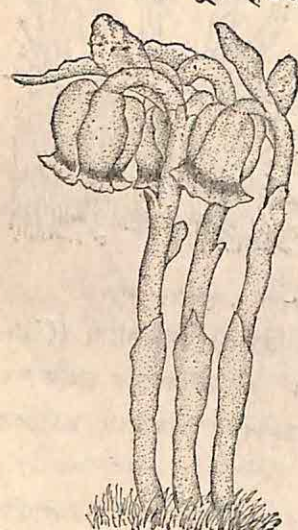
২১নং চিত্র—পূর্ণ মৃতজীবী উদ্ভিদ (মনোট্রোপা)।

অন্যোন্যজীবী (Symbionts)

দুইটি জীব পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সাহচর্যে বাস করিলে, ঐ জীব দুইটিকে **অন্যোন্যজীবী, মিথোজীবী** বা **সিম্‌বায়ন্ট্‌স** (Symbionts ; গ্রীক *syn*=যুক্ত+*bios*=জীবন), এবং জীব দুইটির এইরকম সম্বন্ধকে **অন্যোন্যজীবিত্ব, মিথোজীবিত্ব** বা **সিম্‌বা'য়োসিস** (Symbiosis) বলা হয়। **লাইকেন** (Lichens) উদ্ভিদ-রাজ্যে অন্যোন্যজীবীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গাছের গুঁড়িতে, পুরানো দেওয়ালে ইহাদের আট্‌কাইয়া থাকিতে দেখা যায়।
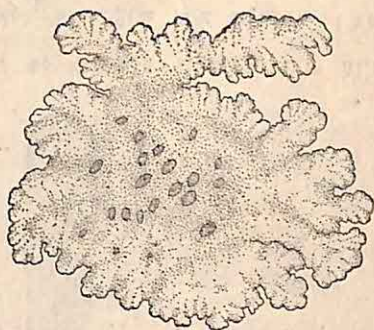
২২নং চিত্র—অন্যোন্যজীবী উদ্ভিদ (লাইকেন)।

শেওলা (৫৬ পৃষ্ঠা) এবং ছত্রাক মিলিয়া লাইকেনের দেহ গঠিত। শেওলা সবুজ বলিয়া খাদ্য প্রস্তুত করে এবং প্রস্তুত খাদ্যের কিছু অংশ ছত্রাককে সরবরাহ করে। বিনিময়ে ছত্রাক শেওলাকে রক্ষা করে এবং জল ও অজৈব লবণ শোষণ করিয়া শেওলাকে সরবরাহ করে।*

পতঙ্গভুক্ (Insectivorous)

এই-জাতীয় উদ্ভিদগুলিকে বিশেষ ধরনের পরভোজী উদ্ভিদ বলা যায়। ইহারা সবুজ এবং সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে ; কিন্তু বিপাকের বিশেষত্ব থাকায়, প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। প্রোটীন-জাতীয় খাদ্যের জন্য ইহাদের প্রাণি-দেহের উপর নির্ভর করিতে হয়। ছোট ছোট কীট-পতঙ্গের দেহ হইতে ইহারা সরাসরি প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য ইহাদের দেহে বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। নিচে কতকগুলি পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ এবং উহাদের কীট-পতঙ্গ ধরার কৌশল বর্ণনা করা হইল।

(১) **ঘটপত্রী** (Pitcher plant) বা **নেপেন্‌থিস** (*Nepenthes*)—ইহারা বীরুৎ-শ্রেণীর উদ্ভিদ। ইহাদের পত্রের ফলক রূপান্তরিত হইয়া কলসীর মতো অঙ্গ গঠন করে। এক্ষেত্রে পত্রের বৃন্তের প্রথম অংশ ফলকের মতো চওড়া, শেষ অংশ সরু। সরু অংশের সঙ্গে কলসীটি খাড়াভাবে আট্‌কানো থাকে।

* অন্যোন্যজীবিত্ব সম্বন্ধে আরও বিবরণের জন্য, জীব-বিজ্ঞান—তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

কলসীর মুখে একটি ঢাক্না থাকে। পত্রের শীর্ষ রূপান্তরিত হইয়া ঢাক্না সৃষ্টি করে। কলসীগুলি সাধারণতঃ দশ হইতে কুড়ি সেন্টিমিটার লম্বা।

ঢাক্নার নিচে, কলসীর মুখে একরকম শর্করা-জাতীয় আঠালো পদার্থ ক্ষরিত হয়। কলসীর মুখে কীট-পতঙ্গ বসিলে, পিছ্লাইয়া কলসীর মধ্যে চলিয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ ঢাক্নাও বন্ধ হইয়া যায়। কলসীর ভিতরের প্রাচীর
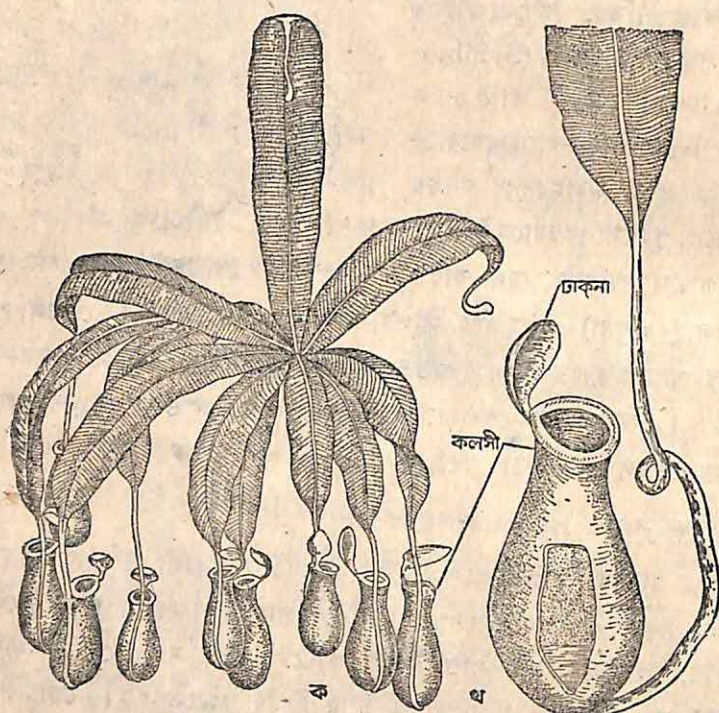
২০নং চিত্র—পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ (ঘটপত্রী): ক. কয়েকটি কলসী, খ. একটি কলসী (বিবর্ধিত দৃশ্য—অংশ-বিশেষ কর্তিত)।

হইতে প্রোটীন-পরিপাককারী উৎসেচক (Enzyme) বাহির হয় এবং কীট-পতঙ্গের দেহের প্রোটীন পরিপাক করে। কলসীর ভিতরের প্রাচীর তখন কতকগুলি শোষণ-গ্রন্থির সাহায্যে রস শোষণ করিয়া নেয়। মেঘালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ঘটপত্রী উদ্ভিদ দেখা যায়।

(২) সূর্যশিশির (Sundew) বা ড্র'সেরা (*Drosera*)—ইহারাও বীরুৎ-শ্রেণীর পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ। ইহাদের ফলকের উপরে এবং প্রান্তে অনেকগুলি সূক্ষ্ম কর্ষিকা বা টেন্ট্যাক্ল (Tentacle ; ল্যাটিন *tentaculum* = স্বেবেদী অঙ্গ) থাকে। কর্ষিকার অগ্রভাগে ফোঁটা ফোঁটা প্রোটীন-পরিপাককারী উৎসেচক

জমা হয়। ফলে, শিশির-কণার মতো এই সমস্ত রস-বিন্দুর উপর সূর্যরশ্মি পড়িলে জলজল করিতে থাকে। এইজন্য ইহাদের সূর্যশিশির বলা হয়।

২৪নং চিত্র—পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ (সূর্যশিশির)।

ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ ফলকের উপর বসিলে, কর্ষিকাগুলি গুটাইয়া পতঙ্গকে ফলকের কেন্দ্রে চাপিয়া ধরে এবং নিঃসৃত উৎসেচকের সাহায্যে উহার প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য পরিপাকের পর শোষণ করিয়া নেয়।
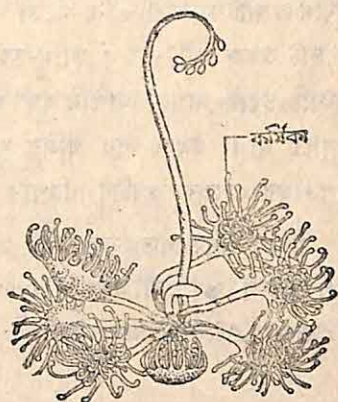
(৩) **ঝাঁঝি** (Bladderwort) বা **ইউট্রিকুলারিয়া** (*Utricularia*)—
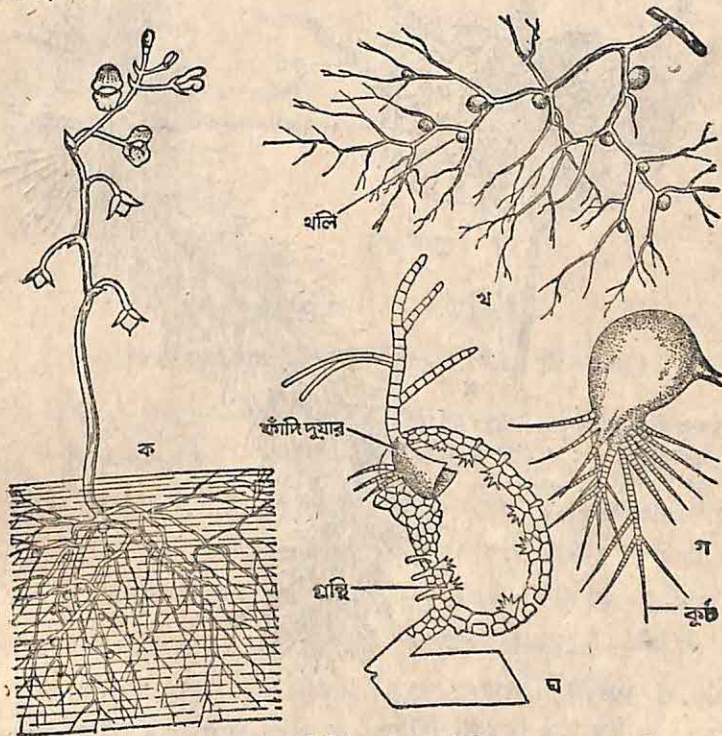
২৫নং চিত্র—পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ (ঝাঁঝি) : ক. সমগ্র উদ্ভিদ, খ. মূল-অংশে থলি, গ. একটি থলি (বিবর্ধিত দৃশ্য), ঘ. থলির দীর্ঘচ্ছেদ।

ইহারা জলজ পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ। ইহাদের পত্রের ফলক খুব বেশি খণ্ডিত হওয়ায়, সুতার মতো দেখিতে হয়। কতকগুলি খণ্ড ছোট থলিতে রূপান্তরিত

হইয়া থাকে। থলির ব্যাস সাধারণতঃ তিন হইতে চার মিলিমিটার। থলির মুখে কপাটিকা(Valve)-র মতো ফাঁদি-দুয়ার (Trap-door) থাকে। ছোট ছোট জলজ কীট-পতঙ্গ ফাঁদি-দুয়ার ঠেলিয়া থলির ভিতরে প্রবেশ করিলে, ফাঁদি-দুয়ার আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া যায়; ফলে, পতঙ্গ আর বাহির হইতে পারে না। ইহার পর থলির মধ্যে প্রোটীন-পরিপাককারী উৎসেচক কীট-পতঙ্গের দেহের প্রোটীন পরিপাক করিয়া ফেলে।

উপরে বর্ণিত পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ ছাড়া, **ভেনাস ফ্লাই-ট্রাপ (Venus' Fly-trap)** বা **ডা'য়োনিয়া** (*Dionoea*) এবং **মালাক্কা ঝাঁঝি** বা **অ্যাল্‌ড্রোভেণ্ডা** (*Aldrovanda*) ইত্যাদি আরও কতকগুলি পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ দেখা
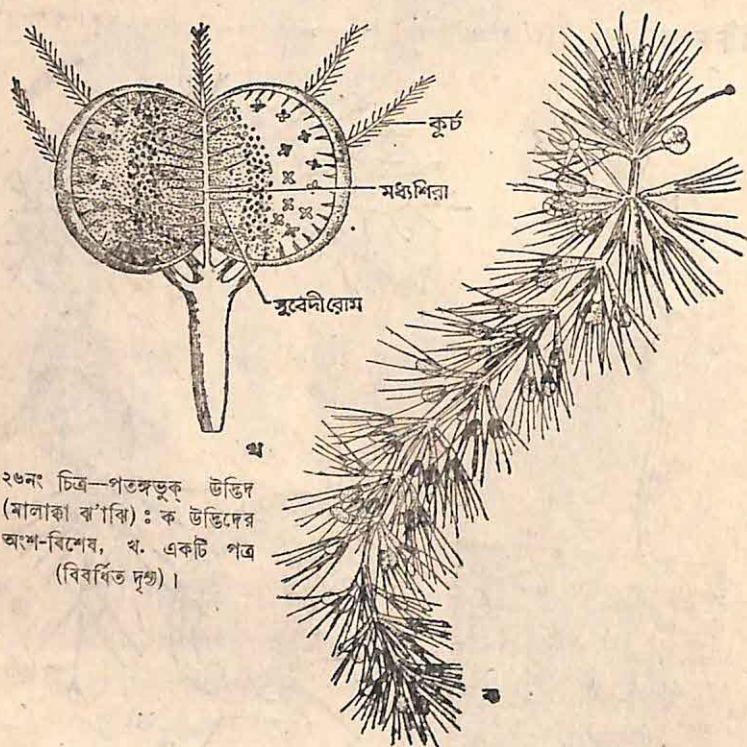
২৬নং চিত্র—পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ (মালাক্কা ঝাঁঝি) : ক উদ্ভিদের অংশ-বিশেষ, খ. একটি পত্র (বিবর্ধিত দৃশ্য)।

যায়। কলিকাতার নিকটে অবস্থিত লবণ হ্রদের জলে প্রচুর পরিমাণে মালাক্কা ঝাঁঝি পাওয়া যায়। ইহাদের পতঙ্গ ধরার কৌশল মোটামুটি সূর্যশিশিরের মতো। ইহাদের ফলকের মধ্যশিরার দুই পাশে কর্ষিকা থাকে। কীট-পতঙ্গ ফলকের উপর বসিলে, ফলকটি মধ্যশিরা-বরাবর কব্জার মতো বন্ধ হইয়া যায়।

তখন কর্ষিকা হইতে উৎসেচক নিঃসৃত হইয়া কীট-পতঙ্গের দেহের প্রোটীন পরিপাক করে।

পুষ্টি-পদ্ধতি অনুসারে, উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগের ছকটি নিচে দেওয়া হইল।
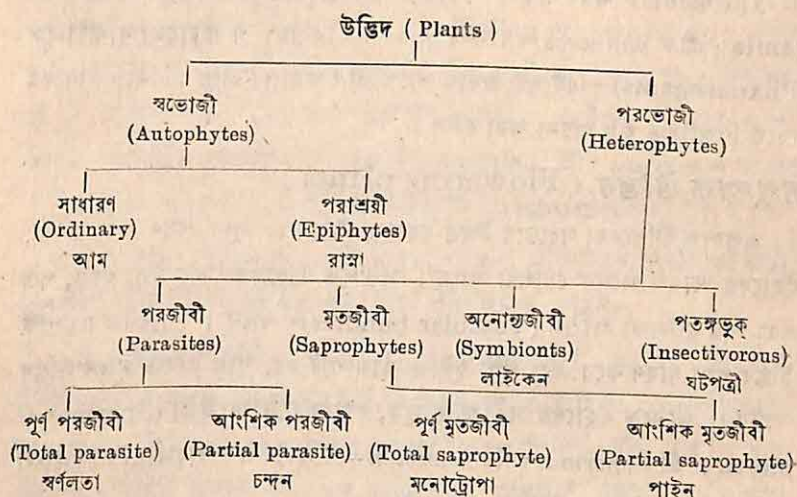
সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদ
(Flowering and Non-flowering plants)

আগের অনুচ্ছেদগুলিতে নানা ধরনের উদ্ভিদের অনেক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। তিন লক্ষ চল্লিশ হাজারেরও বেশি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের কথা জানা যায়। আম, জবা, ধান, কচু ইত্যাদি সচরাচর দেখা অধিকাংশ উদ্ভিদেরই ফুল অর্থাৎ পুষ্প (Flower) হয়। যে সমস্ত উদ্ভিদ পরিণত হইলে পুষ্প ধারণ করে, তাহাদের **সপুষ্পক উদ্ভিদ (Flowering plants)** বলা হয়। শেওলা, ব্যাঙের ছাতা, মস (Moss), ফার্ন (Fern), শুষনি শাক (*Marsilea*)—ইহারাও উদ্ভিদ, কিন্তু পুষ্প ধারণ করে না। এইজন্য ইহাদের **অপুষ্পক উদ্ভিদ (Non-flowering plants)** বলে।

প্রধানতঃ বহিরাকৃতি (External features), আভ্যন্তরীণ গঠন (Internal structures) এবং জনন(Reproduction)-এর ভিত্তিতে, নানা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী সমস্ত উদ্ভিদ অর্থাৎ **উদ্ভিদ-সর্গ(Plant Kingdom)**-কে নানাভাবে ভাগ

করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আইখ্‌লার(Eichler, 1886)-এর শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে, উদ্ভিদ-সর্গকে অপুষ্পক উদ্ভিদ, **ক্রিপ্‌টোগ্যামিয়া** (**Cryptogamia** ; গ্রীক *kryptos* = প্রচ্ছন্ন + *gamos* = বিবাহ) বা **ক্রিপ্‌টোগ্যাম্‌স** (**Cryptogams**) এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ, **ফ্যানেরোগ্যামিয়া** (**Phanerogamia** ; গ্রীক *phaneros* = ব্যক্ত + *gamos* = বিবাহ) বা **ফ্যানেরোগ্যাম্‌স** (**Phanerogams**)—এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। নিচে ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

সপুষ্পক উদ্ভিদ (Flowering plants)

সপুষ্পক উদ্ভিদেরা সবচেয়ে উন্নত-ধরনের উদ্ভিদ। পুষ্প ধারণ করা ছাড়া, ইহাদের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। সপুষ্পক উদ্ভিদের দেহে মূল, কাণ্ড, পত্র এবং স্পষ্ট নালিকা বাণ্ডিল (Vascular bundles)* থাকে। পরিণত সপুষ্পক উদ্ভিদ পুষ্প ধারণ করে এবং পুষ্প হইতে বীজ সৃষ্টি হয়, বীজ হইতে নূতন উদ্ভিদ জন্মায়। অনেকে ইহাদের **সবীজ উদ্ভিদ**, **স্পার্মাটোফাইটা** (**Spermatophyta** ; গ্রীক *sperma* = বীজ + *phyton* = উদ্ভিদ) বা **স্পার্মাটোফাইট্‌স** (**Spermatophytes**) বলেন।

এখানে কয়েকটি বিশিষ্ট ধরনের সপুষ্পক উদ্ভিদের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। সপুষ্পক উদ্ভিদ হইলেও, স্বর্ণলতার মূল ও পত্র থাকে না। কাজেই, ইহাকে মূলহীন এবং পত্রহীন সপুষ্পক উদ্ভিদ বলা যায়। সপুষ্পক উদ্ভিদেরা সবুজ হয়। কিন্তু স্বর্ণলতা এবং মনোট্রোপা ইত্যাদি কয়েকটি পরভোজী সপুষ্পক উদ্ভিদ সবুজ নয়। র‍্যাফ্‌লেশিয়া (*Rafflesia*) নামক পরজীবী সপুষ্পক উদ্ভিদ খুবই অদ্ভুত ধরনের। ইহার দেহ শাখান্বিত সূত্রবৎ (Branched filamentous) এবং মূল, কাণ্ড ও পত্রে ভাগ করা যায় না। ইহার পুষ্প খুব বড় (ব্যাস ৭৫ সেন্টিমিটারের বেশি, ওজন ১১ কিলোগ্রামের বেশি) হয়।

অধিকাংশ সপুষ্পক উদ্ভিদের ফল (Fruit) হয়। অনেক সপুষ্পক উদ্ভিদের আবার ফল হয় না। সেই অনুসারে, সপুষ্পক উদ্ভিদকে (১) গুপ্তবীজী এবং (২) ব্যক্তবীজী—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

গুপ্তবীজী (Angiospermia)

ইহারা উন্নততম সপুষ্পক উদ্ভিদ। এক লক্ষ নিরানব্বই হাজারেরও বেশি বিভিন্ন ধরনের গুপ্তবীজী উদ্ভিদের কথা জানা আছে। ইহাদের পুষ্পে পুংস্তবক

* নালিকা বাণ্ডিলের বিবরণের জন্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(Androecium) এবং স্ত্রীস্তবক (Gynaecium)—এই দুইটি অপরিহার্য স্তবক (Essential whorls) ছাড়া, দলমণ্ডল (Corolla) এবং বৃতি (Calyx) নামের দুইটি অতিরিক্ত স্তবক (Accessory whorls) থাকে ; গর্ভপত্র(Carpel)-এ ডিম্বাশয় (Ovary), গর্ভদণ্ড (Style) এবং গর্ভমুণ্ড (Stigma) থাকে ; ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্বক (Ovule) থাকে ; পরাগরেণু (Pollen grains) গর্ভমুণ্ডের উপর পড়ে। নিষেকের ফলে, ডিম্বাশয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয়। কাজেই, এই সব উদ্ভিদের বীজ ফলের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। সেইজন্য ইহাদের **গুপ্তবীজী, অ্যান্‌জিওস্পার্মিয়া** (**Angiospermia** ; গ্রীক *angeion*=আধার +*sperma*=বীজ) বা **অ্যান্‌জিওস্পার্ম্‌স** (**Angiosperms**) বলা হয়।

বীজের মধ্যে বীজপত্র (Cotyledons) থাকে। বীজপত্রের সংখ্যা অনুযায়ী, গুপ্তবীজী উদ্ভিদকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

(ক) **একবীজপত্রী** (**Monocotyledons**)—এই ধরনের গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বীজে একটি বীজপত্র থাকায়, ইহাদের **একবীজপত্রী** (**Monocotyledons** ; গ্রীক *monos*=এক+*kotyledon*=পেয়ালা) বলা হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদে প্রধান মূল(Tap root)-এর পরিবর্তে গুচ্ছমূল (Fibrous root) থাকে। ইহাদের শিরাবিন্যাস (Venation) সমান্তরাল (Parallel) ধরনের ; পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকে সাধারণতঃ তিনটি করিয়া অংশ থাকে ; নালিকা বাণ্ডিল বদ্ধ (Closed) এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। বিভিন্ন ধরনের একবীজপত্রী উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার।

উদাহরণ (Examples)—

অর্কিড (Orchids), আদা, সর্বজয়া (*Canna*), কলা (*Musa*), রজনীগন্ধা (*Polyanthes*), পিঁয়াজ (*Allium*), শতমূলী, কুমারিকা (*Smilax*), তাল (*Borassus*), নারিকেল (১৫নং চিত্র-খ), সুপারি (*Areca*), খেজুর (*Phoenix*), কচু (*Colocasia*), ওল (*Amorphophallus*), ধান (*Oryza*, ১৬নং চিত্র-ক), গম (*Triticum*), ভুট্টা (*Zea*), আখ (*Saccharum*), বাঁশ (১৫নং চিত্র-গ), দূর্বাঘাস ইত্যাদি নানা ধরনের একবীজপত্রী উদ্ভিদ।

(খ) **দ্বিবীজপত্রী** (**Dicotyledons**)—ইহাদের বীজে দুইটি করিয়া বীজপত্র থাকে বলিয়া, ইহারা **দ্বিবীজপত্রী** (**Dicotyledons** ; গ্রীক *di*=দুই+*kotyledon*=পেয়ালা) নামে পরিচিত। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল থাকে। ইহাদের শিরাবিন্যাস জালকাকার (Reticulate) ; পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকে

দুইটি, পাঁচটি অথবা ইহাদের গুণিতক সংখ্যায় অংশ থাকে; নালিকা বাণ্ডিল মুক্ত (Open) এবং বৃত্তের পরিধি-বরাবর সাজানো থাকে। এক লক্ষ উনষাট হাজারেরও বেশি বিভিন্ন ধরনের দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বিষয়ে জানা যায়।

উদাহরণ (Examples)—

চাঁপা (*Michelia*), আতা (*Anona*), শালুক (৪নং চিত্র-খ), সরিষা (*Brassica*), মুলা (*Raphanus*), জবা (*Hibiscus*), কার্পাস (*Gossypium*), ঢেঁড়স (*Abelmoschus*), লেবু (*Citrus*), আম (১৬নং চিত্র-গ), মটর, অপরাজিতা (*Clitoria*), তেঁতুল (*Tamarindus*), গোলাপ; কুমড়া, সূর্যমুখী (*Helianthus*), বেগুন (*Solanum*), তুলসী (*Ocimum*), রেড়ি (*Ricinus*) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ।

একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পার্থক্য (Differences between monocotyledonous and dicotyledonous plants)

নিচের তালিকায় একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সাধারণ পার্থক্যগুলি দেওয়া হইল।

একবীজপত্রী উদ্ভিদ	দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ
(১) বীজে একটি বীজপত্র থাকে।	(১) বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে।
(২) ইহাদের গুচ্ছমূল হয়।	(২) ইহাদের প্রধান মূল হয়।
(৩) পত্রের ফলকে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দেখা যায়। ব্যতিক্রম: কুমারিকা।	(৩) পত্রের ফলকে জালকাকার শিরাবিন্যাস দেখা যায়। ব্যতিক্রম: স্বলতানচাঁপা।
(৪) পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকে তিনটি করিয়া অংশ থাকে।	(৪) পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকে দুইটি অথবা পাঁচটি করিয়া অংশ থাকে।
(৫) কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিল বদ্ধ, ডিম্বাকার, বিক্ষিপ্ত এবং অসংখ্য।	(৫) কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিল মুক্ত, কিলকাকার (Wedge-shaped), বৃত্তের পরিধি-বরাবর বিন্যস্ত, এবং সংখ্যায় খুব বেশি হয় না।
(৬) মূলের নালিকা বাণ্ডিলের সংখ্যা পাঁচের বেশি। ব্যতিক্রম: পিঁয়াজের মূলে পাঁচটি হইতে আটটি নালিকা বাণ্ডিল থাকে।	(৬) মূলের নালিকা বাণ্ডিলের সংখ্যা দুই হইতে পাঁচ।
(৭) গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth) হয় না।	(৭) গৌণ বৃদ্ধি হয়।

ব্যক্তবীজী (Gymnospermia)

ইহারা অনুন্নত সপুষ্পক উদ্ভিদ। ইহাদের পুষ্প জটিলতা-বর্জিত—কেবল গর্ভপত্র এবং পুংকেশর নিয়া গঠিত; পুষ্পে অতিরিক্ত স্তবক থাকে না। ইহাদের ডিম্বক গর্ভপত্রের কক্ষে উৎপন্ন হয় এবং পরাগরেণু সরাসরি ডিম্বকের উপরে পড়ে। ডিম্বাশয় না থাকায়, সৃষ্ট বীজ কোনও আবরণ দিয়া বেষ্টিত থাকে না। সেইজন্য ইহাদের **ব্যক্তবীজী, জিম্নোস্পার্মিয়া (Gymnospermia** ; গ্রীক *gymnos* = নগ্ন + *sperma* = বীজ) বা **জিম্নোস্পার্মস (Gymnosperms)** বলা হয়। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ফল হয় না। সাতশ' বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের কথা জানা যায়।
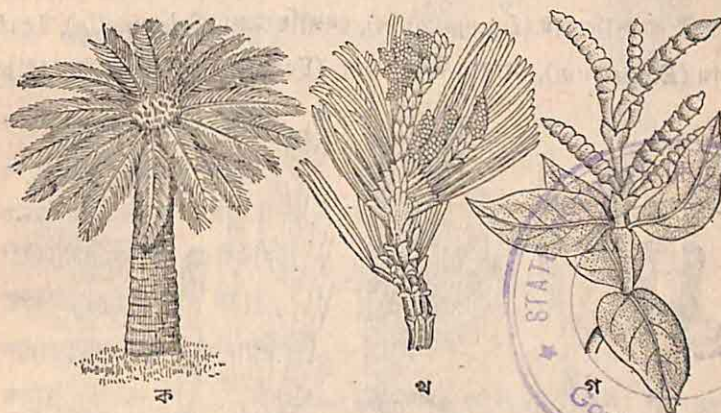
২৭নং চিত্র—ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ : ক. সাইকাস, খ. পাইন (পল্লব), গ. নিটাম (পল্লব)।

উদাহরণ (Examples)—

সাইকাস (*Cycas*), পাইন (*Pinus*), দেওদার, বিলাতী ঝাউ, নিটাম (*Gnetum*) ইত্যাদি ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের উদাহরণ।

অপুষ্পক উদ্ভিদ (Non-flowering plants)

ইহাদের পুষ্প এবং বীজ হয় না। ইহাদের গঠন এবং জনন-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত জটিলতা-বর্জিত। প্রধানতঃ গঠনের ভিত্তিতে অপুষ্পক উদ্ভিদকে (১) থ্যালোফাইটা (Thallophyta), (২) ব্রা'ওফাইটা (Bryophyta) এবং (৩) টেরিডোফাইটা (Pteridophyta)—এই তিন প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়।

টেরিডোফাইটা (Pteridophyta)

টেরিডোফাইটা(**Pteridophyta** ; গ্রীক *pteris* = ফার্ন + *phyton* = উদ্ভিদ)-কে **ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদ**-ও বলা যায়। ইহারা সবচেয়ে উন্নত

অপুষ্পক উদ্ভিদ। ইহাদের দেহ, সপুষ্পক উদ্ভিদের মতো, মূল, কাণ্ড এবং পত্রে বিভক্ত এবং নালিকা বাণ্ডিল-যুক্ত। ইহাদের জনন-অঙ্গ বহুকোষী, জীবন-চক্রে রেণুধর উদ্ভিদ (Sporophyte) এবং লিঙ্গধর উদ্ভিদ (Gametophyte)—এই দুইটি দশা নিয়মিতভাবে আবর্তিত হয়; অর্থাৎ, স্পষ্ট জন্মক্রম (Alternation of generations) দেখা যায়। জীবন-চক্রের দশা দুইটি স্বাধীন; রেণুধর উদ্ভিদই পরিণত উদ্ভিদ। প্রায় দশ হাজার বিভিন্ন ধরনের ফার্ণ-জাতীয় উদ্ভিদের অধিকাংশই ভিজা এবং ছায়াচ্ছন্ন মাটিতে বাস করে, কিছু-সংখ্যক জলে বাস করে, কয়েকটি আবার পরাশ্রয়ী।

উদাহরণ (**Examples**)—

লাইকোপোডিয়াম (*Lycopodium*), সেলাজিনেলা (*Selaginella*), ইক্যুইজিটাম (*Equisetum*), নানা রকম ফার্ণ (Ferns), যেমন—ড্রা'য়প্‌টেরিস
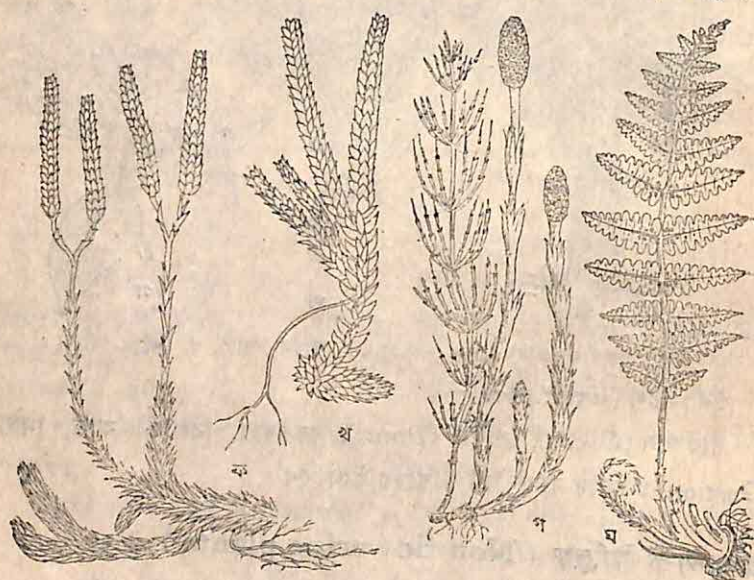
২৮নং চিত্র—কয়েক ধরনের টেরিডোফাইটা: ক. লাইকোপোডিয়াম, খ. সেলাজিনেলা, গ. ইক্যুইজিটাম, ঘ. ড্রা'য়প্‌টেরিস।

(*Dryopteris*) প্রভৃতি, শুষনি শাক (*Marsilea*) ইত্যাদি কয়েকটি পরিচিত টেরিডোফাইটের উদাহরণ।

ব্রা'ওফাইটা (**Bryophyta**)

ব্রা'ওফাইটা(**Bryophyta**; গ্রীক *bryon* = মস + *phyton* = উদ্ভিদ)-কে মস-জাতীয় উদ্ভিদ-ও বলা যায়। ইহারা টেরিডোফাইটার তুলনায়

অনুন্নত। ইহাদের দেহ কাণ্ড এবং পত্রে বিভক্ত। তবে ইহাদের মূল থাকে না ; তাহার পরিবর্তে মূলের মতো দেখিতে **রাইজয়েড** (Rhizoid ; গ্রীক *rhiza*=মূল+*eidos*=আকার) নামের অঙ্গ থাকে। রাইজয়েড মূলের কাজ করে। অনেকের দেহ, অবশ্য, কাণ্ড ও পত্রে বিভক্ত নয়। টেরিডোফাইটার মতো ইহাদেরও জনন-অঙ্গ বহু-কোষী এবং জীবন-চক্রে স্পষ্ট জনুঃক্রম দেখা যায়। তবে লিঙ্গধর উদ্ভিদই পরিণত উদ্ভিদ এবং রেণুধর উদ্ভিদ ইহার উপরে জন্মায়। প্রায় বাইশ হাজার সাতশ' বিভিন্ন ধরনের ব্রা'ওফাইটার কথা জানা যায়। ইহারা সাধারণতঃ ভিজা জায়গায় জন্মায়।
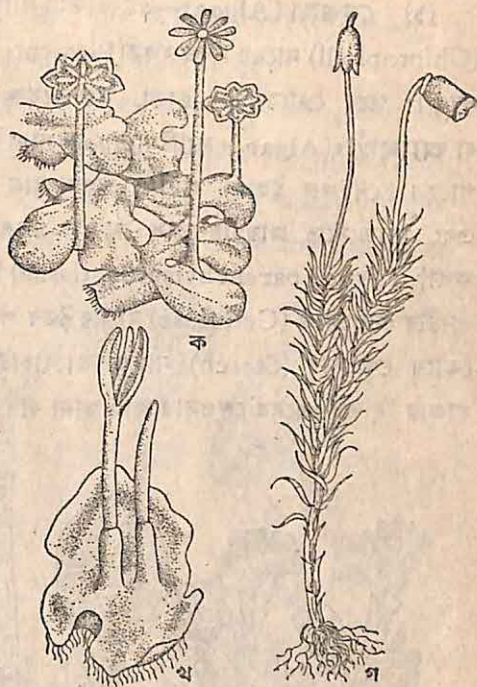
২৯নং চিত্র—কয়েক ধরনের ব্রা'ওফাইটা : ক. মার্কেন্‌শিয়া, খ. অ্যান্থোসেরস, গ. পলিট্রিকাম (মস)।

উদাহরণ (Examples)—

রিক্‌সিয়া (*Riccia*), মার্কেন্‌শিয়া (*Marchantia*), অ্যান্থোসেরস (*Anthoceros*)—এই তিন ধরনের ব্রা'ওফাইটার দেহ কাণ্ড এবং পত্রে বিভক্ত নয়। নানা ধরনের মস (Mosses), যেমন—পলিট্রিকাম (*Polytrichium*) ইত্যাদি কাণ্ড ও পত্র-যুক্ত ব্রা'ওফাইটার উদাহরণ।

থ্যালোফাইটা (Thallophyta)

থ্যালোফাইটা(Thallophyta ; গ্রীক *thallus*=কচি বিটপ)-কে **সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ**-ও বলা যায়। ইহারা আদিমতম উদ্ভিদ। থ্যালোফাইটার দেহে মূল, কাণ্ড অথবা পত্র কিছুই নাই। ইহার দেহ একটিমাত্র অথবা এক-গুচ্ছ পার্থক্য-বিহীন কোষ নিয়া গঠিত। থ্যালোফাইটার দেহকে **থ্যালাস** (Thallus) বলা হয়। ইহাদের 'জনন-অঙ্গ' এককোষী। দেহে ক্লোরোফিলের

উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি অনুসারে, ইহাদের সচরাচর দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

(১) **শেওলা** (Algae)—এই-জাতীয় থ্যালোফাইটার কোষে ক্লোরোফিল (Chlorophyll) নামের সবুজ রঙ্গক(Pigment)-কণা থাকায়, ইহারা সাধারণতঃ সবুজ। তবে ক্লোরোফিল ছাড়া, অন্য কয়েক রকমের রঙ্গক-কণাও **শেওলা** বা **অ্যাল্‌জী***(Algae ; ল্যাটিন *alga*=সামুদ্রিক শেওলা)-র কোষে থাকিতে পারে। সেইজন্য ইহারা বাদামী অথবা লাল রঙেরও হয়। ইহারা স্বভোজী এবং স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বাস করে। শেওলার দেহ প্রকৃত প্যারেন্‌কাইমা কলা† (True parenchymatus tissue) দিয়া গঠিত। ইহাদের কোষ-প্রাচীর সেলুলোজ (Cellulose) নামের জৈব পদার্থ দিয়া গঠিত। শেওলার কোষে শ্বেতসার (Starch) নামক কার্বোহাইড্রেট জমা থাকে। প্রায় কুড়ি হাজার বিভিন্ন ধরনের শেওলার কথা জানা যায়।
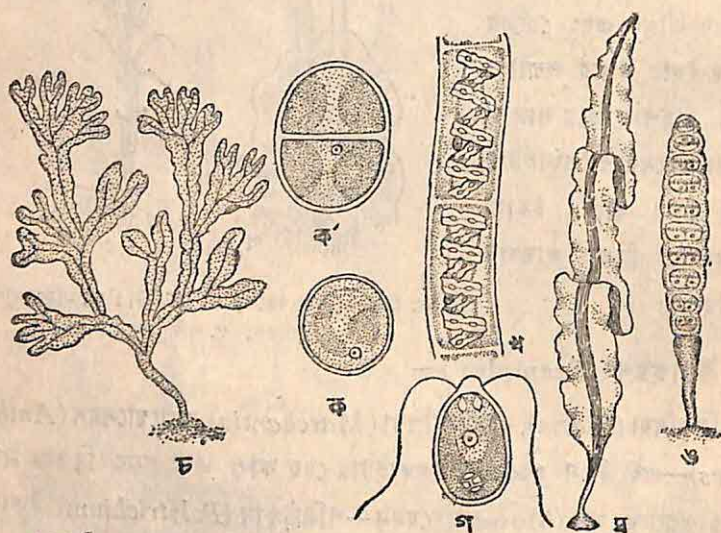
৩০নং চিত্র—কয়েক ধরনের শেওলা : ক. ও ক'. প্রোটোকক্কাস, খ. স্পাইরোগাইরা, গ. ক্লামাইডোমোনাস, ঘ. ল্যামিনারিয়া, ঙ. ইউলোথ্রিক্স, চ. ফিউকাস।

উদাহরণ (Examples)—

প্রোটোকক্কাস (*Protococcus*)—এককোষী, মিঠা জলে অথবা ভিজা মাটিতে থাকে ; স্পাইরোগাইরা (*Spirogyra*)—বহুকোষী, সূত্রবৎ (Filamentous), মিঠা জলে থাকে ; ক্লামাইডোমোনাস (*Chlamydomonas*)—এককোষী,

* বহুবচন; অ্যাল্‌গা (Alga) — একবচন।

† কলার বিবরণের জন্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

উপবৃত্তাকার, দুইটি সিলিয়া(Cilia)-যুক্ত, মিঠা জলে বাস করে ; ল্যামিনারিয়া (*Laminaria*)—বহুকোষী, ফিতার মতো, সামুদ্রিক ; ইউলোথ্রিক্স (*Ulothrix*)—বহুকোষী, সূত্রবৎ, মিঠা জলে বাস করে ; ফিউকাস (*Fucus*)—বহুকোষী, ফিতার মতো, শাখান্বিত, সামুদ্রিক, বাদামী রঙের।

(২) **ছত্রাক (Fungi)**—এই-জাতীয় থ্যালোফাইটার দেহে ক্লোরোফিল থাকে না। **ছত্রাক** বা **ফান্‌জাই*** (**Fungi** ; ল্যাটিন *fungus* = ব্যাঙের ছাতা) পরজীবী অথবা মৃতজীবী। বহুকোষী ছত্রাকের দেহে অপ্রকৃত প্যারেন্‌কাইমা(Pseudo-parenchyma)-নির্মিত অসংখ্য সূক্ষ্ম সুতার মতো অণুসূত্র বা
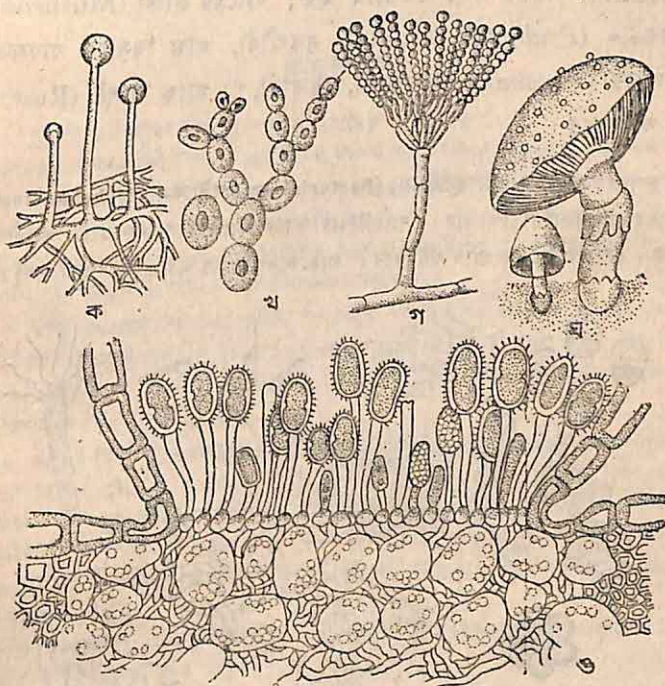
৩১নং চিত্র—কয়েক ধরনের ছত্রাক : ক. মিউকোর, খ. ঈস্ট, গ. পেনিসিলিয়াম, ঘ. ব্যাঙের ছাতা, ঙ. পাক্‌সিনিয়া।

হাইফি† (Hyphae) থাকে। অণুসূত্রগুলি একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে থাকিয়া, **মাইসিলিয়াম** (Mycelium) বা **ছত্রাক-দেহ** গঠন করে। ছত্রাকের কোষ-প্রাচীর ফাঙ্গাস-সেলুলোজ (Fungus cellulose) অর্থাৎ কাইটিন (Chitin), সেলুলোজ, ক্যালোজ (Callose), পেক্‌টোজ (Pectose) ইত্যাদির

* বহুবচন ; ফাঙ্গাস (Fungus) — একবচন।
† বহুবচন ; হাইফা (Hypha) — একবচন।

৮। যথাযথ উদাহরণসহ একটি পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ, একটি পরজীবী উদ্ভিদ এবং একটি মৃতজীবী উদ্ভিদের বিবরণ দাও। স্বভোজী উদ্ভিদেরা কোন বিষয়ে এই তিন ধরনের উদ্ভিদ হইতে পৃথক ? পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদকে এই দলগুলির কোনটির অন্তর্ভুক্ত করা যায় ? কারণ দেখাও।

[H. S. 1967 (Comp.)]

Illustrate with suitable examples an epiphyte, a parasite and a saprophyte. In what respect the autophytes are different from these three kinds of plants ? To which of the above groups an insectivorous plant may be included ? Give reasons.

৯। পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদকে পরভোজী উদ্ভিদ হিসাবে ধরা হয় কেন ? চিত্রসহ যে-কোনও একটি পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের গঠনগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর এবং ইহা কিভাবে পতঙ্গ ধরে, তাহা বল।

Why insectivorous plants are considered as heterophytes ? Describe, with figure, the structural peculiarities of any one insectivorous plant and state how it catches insects.

১০। একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ এবং একটি একবীজপত্রী উদ্ভিদের সম্পূর্ণ তুলনা কর।

[H. S. 1970 (Comp.)]

Compare fully a dicotyledonous plant with a monocotyledonous one.

১১। অপুষ্পক উদ্ভিদের প্রধান তিনটি ভাগের নাম কর। উদাহরণসহ প্রত্যেকটি ভাগের উদ্ভিদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

Name the three main divisions of non-flowering plants. With examples, mention a few characteristics of the plants of each division.

১২। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) পর্ণমোচী বৃক্ষ [H. S. 1970 (Comp.) ; *cp.* 1967] ; (খ) চিরহরিৎ বৃক্ষ ; (গ) জলজ উদ্ভিদ ; (ঘ) জাঙ্গল উদ্ভিদ ; (ঙ) লবণাম্বু উদ্ভিদ ; (চ) জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম [H. S. 1966 ; *cp.* 1971 (Comp.)] ; (ছ) ব্রততী ; (জ) রোহিণী ; (ঝ) আকর্ষ [H. S. 1972, 1969 (Comp.), 1968] ; (ঞ) শাখা-আকর্ষ [H. S. 1965 (Comp.)] ; (ট) বল্লী [H. S. 1969] ; (ঠ) কাষ্ঠল লতা ; (ড) অশাখ কাণ্ড ; (ঢ) তৃণকাণ্ড [H. S. 1972] ; (ণ) বীরুৎ [H. S. 1965 ; *cp.* 1962] ; (ত) গুল্ম [H. S. 1966 (Comp.), 1964 (Comp.) ; *cp.* 1962 (Comp.), 1960] ; (থ) বৃক্ষ ; (দ) বর্ষজীবী, দ্বিবর্ষজীবী এবং বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ [*cp.* H. S. 1968 (Comp.)] ; (ধ) স্বভোজী উদ্ভিদ [H. S. 1962] ; (ন) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ [H. S. 1971 (Comp.), 1968 (Comp.) ; *cp.* 1963 (Comp.), 1960] ; (প) পরভোজী উদ্ভিদ ; (ফ) পরজীবী উদ্ভিদ [H. S. 1966 ; *cp.* 1963, 1961] ; (ব) মৃতজীবী উদ্ভিদ [H. S. 1964, 1962 ; *cp.* 1961 (Comp.)] ; (ভ) অন্যোন্যজীবী ; (ম) পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ [H. S. 1965 (Comp.)]।

Write short notes on :—

(*a*) Deciduous tree ; (*b*) Evergreen tree ; (*c*) Hydrophytes ; (*d*) Xerophytes ; (*e*) Halophytes ; (*f*) Viviparous germination ; (*g*) Creeper ; (*h*) Climber ; (*i*) Tendril ; (*j*) Stem tendril ; (*k*) Twiner ; (*l*) Lianes ; (*m*) Caudex ; (*n*) Culm ; (*o*) Herb ; (*p*) Shrub ; (*q*) Tree ; (*r*) Annual, biennial and perennial plants ; (*s*) Autophyte ; (*t*) Epiphyte ; (*u*) Heterophyte ; (*v*) Parasite ; (*w*) Saprophyte ; (*x*) Symbionts ; (*y*) Insectivorous plant.

অণুবীক্ষণ যন্ত্র
(Microscope)

যে যন্ত্রের সাহায্যে আপাতঃ-অদৃশ্য খুব সূক্ষ্ম কোনও বস্তু অথবা জীবকে বড় দেখা যায়, তাহাকে **অণুবীক্ষণ যন্ত্র** বা **মাইক্রোস্কোপ** (Microscope ; গ্রীক *micros*=ছোট+*skopeein*=দেখা) বলা হয়। খালি চোখে যে সমস্ত জীব অথবা জীবদেহের অংশ-বিশেষ অর্থাৎ কোষ প্রভৃতি দেখা যায় না, সেইগুলি দেখার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য দরকার হয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক **লিউভেন্‌হোক** (Leeuwenhoek)। ইনি সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে (১৬৫৩—১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) সর্বপ্রথম একরকম অণু-বীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং যন্ত্রের ভিতর দিয়া বিভিন্ন রকম জীবাণু ও এককোষী প্রাণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। ক্রমে পদার্থ-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে
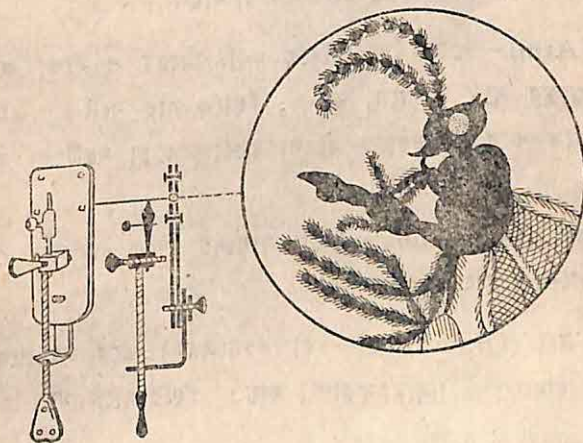
৩৩নং চিত্র—লিউভেন্‌হোক-নির্মিত অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

সঙ্গে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেরও উন্নতি হইতে থাকে ; ফলে, বিভিন্ন প্রকার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। পরীক্ষাগার(Laboratory)-এ সচরাচর প্রচলিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে সাধারণভাবে **যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র** (Compound microscope) বলা হয়। পরের পৃষ্ঠায় এইরকম একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হইল।

পাদদেশ (Base)—ইহা দেখিতে ইংরেজী 'U' অথবা 'V'-অক্ষরের মতো ধাতব অংশ। ইহার উপরেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভার থাকে।

স্তম্ভ (Pillar)—পাদদেশ হইতে একটি অংশ খাড়াভাবে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ইহাকে স্তম্ভ বলা হয়। স্তম্ভটি উপরের দিকে দুইটি অংশে বিভক্ত।

মঞ্চ (Stage)—ইহা স্তম্ভের উপর অবস্থিত, ধাতু-নির্মিত, গোলাকার অথবা চতুষ্কোণ অংশ। ইহার ঠিক মাঝখানে একটি গোলাকার ছিদ্র থাকে। ছিদ্রটির দুই পাশে দুইটি ক্লিপ (Clips) লাগানো থাকে।

ডায়াফ্রাম (Diaphragm)—মঞ্চের নিচে অনেকগুলি গোলাকার ছিদ্র-যুক্ত একটি গোলাকার ধাতব পাত থাকে। ইহাকে ডায়াফ্রাম বলে। ইহার সাহায্যে মঞ্চের ছিদ্রটিকে প্রয়োজনমতো ছোট অথবা বড় করা যায়।

দর্পণ (Mirror)—মঞ্চের নিচে এবং পাদদেশের উপরে একটি সম-অবতল (Plano-concave) দর্পণ লাগানো থাকে। ইহাকে প্রয়োজনমতো ঘুরাইয়া মঞ্চের ছিদ্রের মধ্যে আলোক প্রতিফলিত করা যায়।

বাহু (Arm)—স্তম্ভের পিছন দিকে একটি নিরেট ও বাঁকা অংশ স্ক্রু-র সাহায্যে স্তম্ভের সঙ্গে লাগানো থাকে; ইহাকে বাহু বলে। এই অংশটি হাতলের কাজ করে এবং ইহাকে ধরিয়া প্রয়োজনমতো যন্ত্রটিকে নাড়াচাড়া করা যায়।

দেহনল (Body tube)—বাহুর সামনের দিকে লম্বভাবে যে নলটি লাগানো থাকে, তাহাকে দেহনল বলে।

টানা-নল (Draw tube)—ইহা দেহনলের ভিতরে লম্বভাবে থাকে। ইহাকে সুবিধামতো উঠা-নামা করানো যায়। ইহার গায়ে মাপ-চিহ্ন আঁকা থাকে।

অভিনেত্র (Eye-piece)—ইহা একটি ছোট ফাঁপা নলের মতো। ইহার অগ্র- ও পশ্চাদ্‌ভাগে দুইটি সমোত্তল লেন্স (Plano-convex lenses) লাগানো থাকে। ইহা টানা-নলের মধ্যে থাকে। অভিনেত্রের গায়ে বিবর্ধন-শক্তি (Magnification power) অর্থাৎ কতগুণ বড় করিয়া দেখা যাইবে, তাহার পরিমাপ লেখা থাকে। বিভিন্ন ধরনের বিবর্ধন-শক্তিসম্পন্ন অভিনেত্র পাওয়া যায়। অভিনেত্রের কাছে চোখ রাখিয়া দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখিতে হয়।
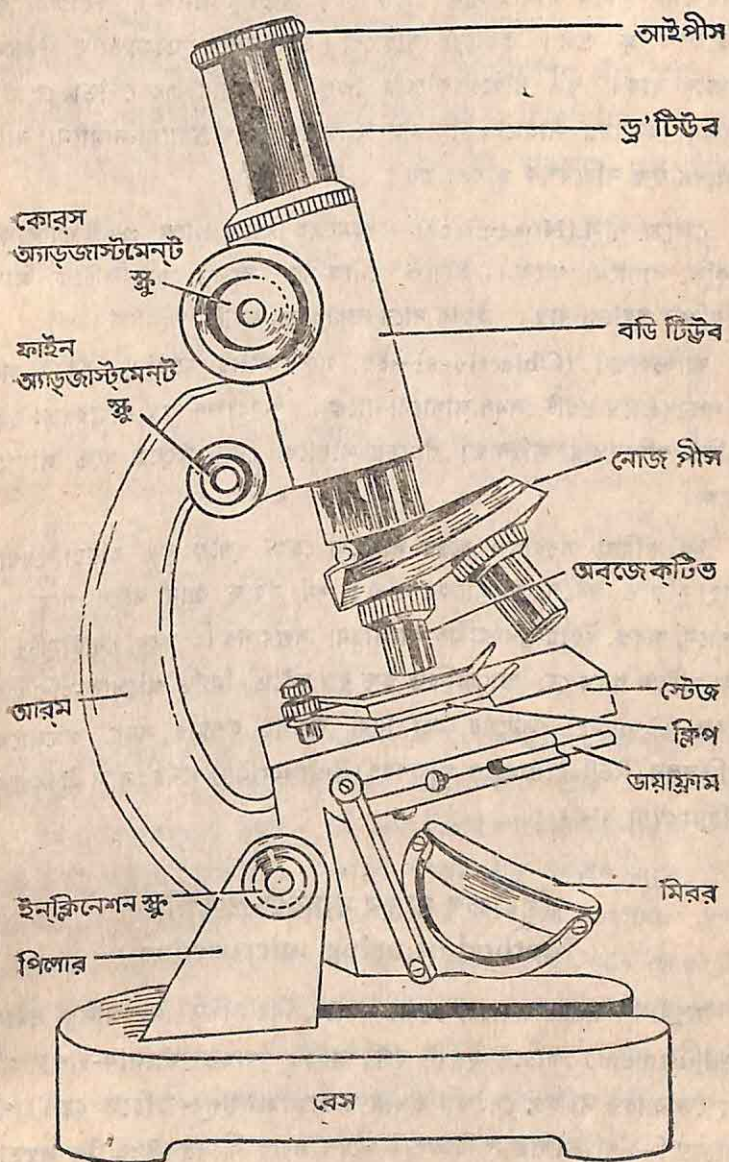
৩৩নং চিত্র—যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ।

স্থূল ও সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু (Coarse and fine adjustment screws)—বাহুর মাথার দুই পাশে দুইটি বড় স্ক্রু থাকে। ইহাদের স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু বলে। ইহাদের সাহায্যে টানা-নলকে তাড়াতাড়ি উঠানো-নামানো যায়। স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু-র কিছু নিচেই আর এক জোড়া ছোট স্ক্রু থাকে। ইহাদের সাহায্যে টানা-নলকে আস্তে আস্তে উঠানো-নামানো যায়। ইহাদের সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু বলা হয়।

নোজ-পীস (Nose-piece)—দেহনলের নিচের প্রান্তে একটি গোলাকার চাকৃতি লাগানো থাকে। ইহাকে নোজ-পীস বলে। চাকৃতিটিকে আপন পরিধিতে ঘুরানো যায়। ইহার গায়ে সাধারণতঃ দুইটি গর্ত থাকে।

অভিলক্ষ্য (Objectives)—ইহা সরু নলের মতো। ইহার অগ্র- ও পশ্চাদ্‌প্রান্তে দুইটি লেন্‌স লাগানো থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সাধারণতঃ দুইটি বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন অভিলক্ষ্য প্যাচের সাহায্যে নোজ-পীসের গর্তে লাগানো থাকে।

কি করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ছোট বস্তুকে বড় করিয়া দেখায়, তাহা বুঝিতে হইলে, আলোকের ভৌত ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এখানে, অবশ্য, ইহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, আলোকিত সূক্ষ্ম বস্তু হইতে নির্গত আলোক-রশ্মি দুইটি উত্তল (Convex) লেন্‌সের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়ার সময়, আলোকের প্রতিফলন (Reflection) ও প্রতিসরণ (Refraction) ধর্মের ফলে ঐ বস্তু বড় করিয়া দেখা যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার-প্রণালী
(Method of using microscope)

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখার আগে, নিম্নলিখিত অংশগুলির সমন্বয়ন (Adjustment) করিতে হয়। দর্পণ হইতে আগত আলোক-রশ্মির গতি যাহাতে ব্যাহত না হয়, সেইজন্য প্রথমে ডায়াফ্রামটি উন্মুক্ত করিতে হয়। পরে সবচেয়ে নিম্ন-শক্তিসম্পন্ন অভিলক্ষ্যটি মঞ্চের মধ্যস্থ ছিদ্রের উপর ঠিক লম্বভাবে রাখিতে হয়। সবশেষে অভিনেত্রের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, দর্পণটিকে আলোকের উৎসের দিকে এমনভাবে স্থির করিতে হয়, যাহাতে অভিনেত্রের ক্ষেত্রটিকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়।

আণুবীক্ষণিক জীব (Microscopic organism) অথবা শারীর-স্থান পাঠ (Antomical study)-এর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ অথবা প্রাণি-দেহের ছেদ (Section) এমন স্থক্ষ্ম হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে আলোক-রশ্মি উহার মধ্য দিয়া অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইতে পারে। আণুবীক্ষণিক জীব অথবা ছেদটি একটি পরিষ্কার স্লাইড(Slide)-এর, অর্থাৎ প্রায় ৭৫ মিলিমিটার লম্বা এবং ২৫ মিলিমিটার চওড়া কাচের পাতলা পাতের ঠিক মাঝখানে এক ফোঁটা জল
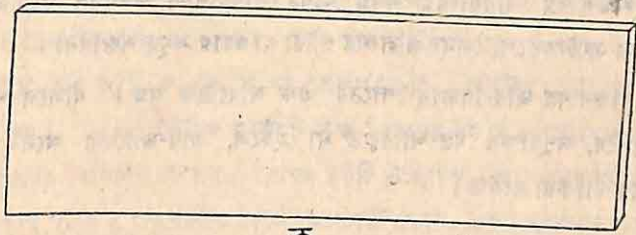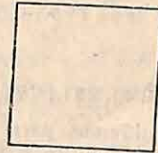
৩৫নং চিত্র—ক. স্লাইড, খ. ও খ'. আবরণী কাচ।

অথবা গ্লিসারিন(Glycerin)-এর শতকরা ৫ ভাগ জলীয় দ্রবণের মধ্যে রাখিয়া, সমস্তটিকে একটি আবরণী কাচ (Cover slip), অর্থাৎ প্রায় ১৮ মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত বৃত্তাকার অথবা ঐরকম বাহু-দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট বর্গাকার খুব পাতলা কাচের পাত দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। আবরণী কাচের নিচে একটিও বুদ্‌বুদ থাকিলে চলিবে না। ইহার পর স্লাইডটিকে মঞ্চের উপর ক্লিপ দিয়া এমনভাবে আঁটিয়া দিতে হয়, যাহাতে স্লাইডের উপর অবস্থিত ছেদটি মঞ্চের মধ্যস্থ ছিদ্রের ঠিক উপরে থাকে। স্লাইডটিকে মঞ্চের উপর রাখার আগে, স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু ঘুরাইয়া অভিলক্ষ্যটিকে অল্প উপরে তুলিয়া নেওয়া প্রয়োজন। এখন স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু ঘুরাইয়া এবং অভিনেত্রের উপর চোখ রাখিয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটির প্রতিবিম্ব না দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অভিলক্ষ্যটিকে মঞ্চের দিকে আস্তে আস্তে নামাইতে হয়। ইহাকে ফোকাস করা (Focusing) বলে। শেষে স্থক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু ঘুরাইয়া, বস্তুটিকে আরও পরিষ্কারভাবে ফোকাস করিতে হয়। ইহাতে দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতিটি অংশ উজ্জ্বল দেখায়।

উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন অভিলক্ষ্যের সহায়তায় দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতিবিম্ব আরও বড় করিয়া দেখা যায়। উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন অভিলক্ষ্যের সাহায্যে দেখার আগে বস্তুটিকে নিম্ন-শক্তিসম্পন্ন অভিলক্ষ্যের মধ্য দিয়া দেখিতে হয়। পরে নোজ-পীসটিকে ঘুরাইয়া, উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন অভিলক্ষ্যটিকে মঞ্চের ঠিক কেন্দ্রস্থলে লম্ব ভাবে প্রতিস্থাপিত করিয়া, প্রথমে স্থূল ও পরে সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু-র সাহায্যে ফোকাস করিতে হয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহারের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ব্যবহারের ত্রুটি হইলে, লেন্সগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র জীব-বিজ্ঞান পাঠের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত না হইলে, জীব-জগতের অনেক রহস্য অগোচরে থাকিয়া যাইত।

অনুশীলনী

১। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর। ইহার প্রয়োজনীয়তা কি?

Describe the different parts of a compound microscope. What are its uses?

২। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোনও বস্তু দেখার প্রণালী বর্ণনা কর।

Describe the process of observation of a material under the compound microscope.

৩। টীকা লেখ :—

(ক) ডায়াফ্রাম ; (খ) নোজ-পীস ; (গ) অভিলক্ষ্য ; (ঘ) অভিনেত্র।

Write short notes on :—

(*a*) Diaphragm ; (*b*) Nose-piece ; (*c*) Objective ; (*d*) Eye-piece.

জীবনের একক
(Unit of Life)

প্রথম পরিচ্ছেদে উদ্ভিদের জীবনে নানা বৈচিত্র্যের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। এত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও, একদিক দিয়া সব উদ্ভিদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটোকক্কাস, ঈস্ট এবং স্পাইরোগাইরা পরীক্ষা করিলে, উহাদের প্রত্যেকের দেহে সূক্ষ্ম কুঠুরির মতো একধরনের গঠন দেখা যায়। এই কুঠুরিকে **কোষ** বা **সেল** (Cell ; ল্যাটিন *cella*=ছোট ঘর) বলা হয়। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে **রবার্ট হুক** উদ্ভিদের কোষ বোঝাইতে 'সেল' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। প্রথম দুইটি উদ্ভিদের দেহে এইরকম একটি করিয়া কোষ থাকে ; শেষেরটির দেহে কয়েকটি কোষ, একই সারিতে পর পর সাজানো দেখা যায়। যে উদ্ভিদের দেহ একটিমাত্র কোষ দিয়া গঠিত, তাহাকে **এককোষী** বা **ইউনিসেলুলার** (Unicellular ; ল্যাটিন *unus*=এক) উদ্ভিদ বলে। আবার, উদ্ভিদের দেহে একের বেশি কোষ থাকে, তাহাকে **বহুকোষী** বা **মাল্‌টিসেলুলার** (Multicellular ; ল্যাটিন *multus*= অনেক) উদ্ভিদ বলা হয়। সুতরাং, প্রোটোকক্কাস ও ঈস্ট এককোষী উদ্ভিদ এবং স্পাইরোগাইরা বহুকোষী উদ্ভিদ। চাক্ষুষ (Macroscopic) উদ্ভিদেরা সাধারণতঃ বহুকোষী। কারণ, এই সমস্ত উদ্ভিদের সূক্ষ্মচ্ছেদে অসংখ্য কোষ দেখা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, আভ্যন্তরীণ গঠনে সব উদ্ভিদই সদৃশ ; অর্থাৎ, উহারা সকলেই কোষ দিয়া গঠিত। এই পরিচ্ছেদে উদ্ভিদ-জীবনে সাদৃশ্যের বিষয়ে আলোচনা করা হইল।

কোষ
(Cell)

সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ কোষ দিয়া গঠিত। সুতরাং, কোষ জীব-দেহের গঠনগত একক (Structural unit)। আবার, প্রতিটি কোষ জীবের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজ (Physiological functions), অর্থাৎ শ্বসন, রেচন ইত্যাদি বিপাক এবং জনন প্রভৃতি করিতে পারে। কাজেই, কোষ জীবের কার্যগত একক (Functional unit)। সেইজন্য, কোষকে জীবনের একক (Unit of life) বলা হয়

আদর্শ উদ্ভিদ-কোষ (Typical plant cell)

আদর্শ উদ্ভিদ-কোষের অংশগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়ঃ সজীব (১) প্রোটোপ্লাজ্‌ম (Protoplasm) এবং উহাকে আবৃতকারী (২) কোষ-প্রাচীর (Cell wall) নামক জড় বস্তু। নিচে ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

প্রোটোপ্লাজ্‌ম (Protoplasm)

প্রোটোপ্লাজ্‌ম আবার দুই ভাগে বিভক্ত ঃ নিউক্লিয়াস (Nucleus) নামক একটি গোলাকার বস্তু এবং উহাদের চারদিকে অবস্থিত সাইটোপ্লাজ্‌ম (Cytoplasm) নামক জেলির মতো বাকি অংশ। সাইটোপ্লাজ্‌ম ও নিউক্লিয়াসের গঠন এবং কাজ নিম্নরূপ।

সাইটোপ্লাজ্‌ম (Cytoplasm)

সাইটোপ্লাজ্‌ম কতকটা জেলির মতো এবং বর্ণহীন, কাচিক (Hyaline), ঈষদচ্ছ (Transluscent), সান্দ্র (Viscous) ও স্থিতিস্থাপক (Elastic) এক-ধরনের খুব জটিল জৈব পদার্থ। ইহার বাহিরের দিকের, অর্থাৎ কোষ-প্রাচীর-সংলগ্ন অতি আণুবীক্ষণিক স্তর অপেক্ষাকৃত ঘন এবং দানা-বিহীন। এই স্তরকে **এক্টোপ্লাজ্‌ম** (Ectoplasm) বলা হয়। ইহা আভেদ্য (Semi-permeable)। সাইটোপ্লাজ্‌মের ভিতরের দিকের অংশ দানাদার। ইহাকে **এণ্ডোপ্লাজ্‌ম** (Endoplasm) বলে। এণ্ডোপ্লাজ্‌মের মধ্যে একটি অথবা কয়েকটি তরলপূর্ণ গহ্বর দেখা যায়। এই গহ্বরকে **কোষ-গহ্বর** বা **ভ্যাকুওল** (Vacuole) বলা হয়। ভ্যাকুওলের মধ্যে যে তরল থাকে, তাহাকে **কোষ-রস** (Cell sap) বলে। ইহাতে সঞ্চিত খাদ্য, বর্জ্য পদার্থ, রঙ্গক পদার্থ ইত্যাদি নানারকম জড় পদার্থ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় অথবা কলয়েড (Colloid) অবস্থায় থাকে। ভ্যাকুওলের পরিধি-বরাবর সাইটো-প্লাজ্‌মের একটি বিশিষ্ট এবং খুব সূক্ষ্ম স্তর থাকে। ইহাকে **টোনোপ্লাজ্‌ম** (Tonoplasm) বলে।

কাজ (Functions)—নিউক্লিয়াস এবং (নিচে বর্ণিত) প্লাস্টিড, মাইটো-কন্ড্রিয়া ইত্যাদি সজীব বস্তু, সঞ্চিত খাদ্য, বর্জ্য পদার্থ, রঙ্গক পদার্থ প্রভৃতি ধারণ করা সাইটোপ্লাজ্‌মের প্রধান কাজ। এক্টোপ্লাজ্‌ম বাহির হইতে কোষের মধ্যে গ্যাসের ও তরলের প্রবেশ এবং কোষ হইতে উহাদের বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ

করে। কোষ-রস ধারণ করা ছাড়া, ভ্যাকুওল কোষের রসস্ফীতি-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

সাইটোপ্লাজ্‌মের অন্তর্গত সজীব বস্তু (Living contents of cytoplasm)—সাইটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নিম্নলিখিত বস্তুগুলি পাওয়া যায়।

(১) **প্লাস্টিড (Plastids)**—ইহারা নিউক্লিয়াসের চেয়ে অনেক ছোট। অনেকগুলি প্লাস্টিড সাইটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে যেখানে-সেখানে দেখা যায়। আকার, গঠন এবং ধর্মের পার্থক্য অনুযায়ী, প্লাস্টিড আবার তিন ধরনের। যেমন—
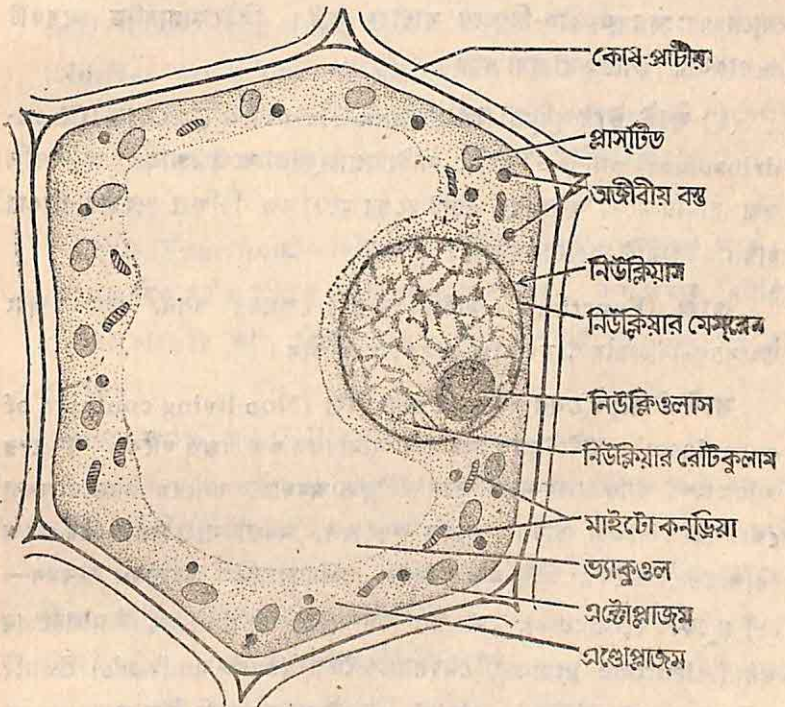
৩৬নং চিত্র—আদর্শ উদ্ভিদ-কোষের বিভিন্ন অংশ।

(ক) **ক্লোরোপ্লাস্টিড (Chloroplastids)**—এই ধরনের প্লাস্টিডে ক্লোরোফিল নামক সবুজ রঙ্গক কণা থাকায়, ইহাদের রঙ সবুজ। ইহারা গোলাকার, উপবৃত্তাকার, পাতের মতো ইত্যাদি নানা আকারের হইতে পারে।

(খ) **ক্রোমোপ্লাস্টিড (Chromoplastids)**—সবুজ ছাড়া অন্য রঙের

প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্টিড বলে। ইহাদের আকার নির্দিষ্ট নয়; কৌণিক, দণ্ডের মতো, সূচের মতো ইত্যাদি নানা আকারের হইতে পারে। এই ধরনের প্লাস্টিডে ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল নামক রঞ্জক পদার্থের কণা থাকে।

(গ) **লিউকোপ্লাস্টিড (Leucoplastids)**—ইহারা বর্ণহীন প্লাস্টিড। ইহাদের কোনও নির্দিষ্ট আকার থাকে না। লিউকোপ্লাস্টিডে কোনও রঞ্জক পদার্থের কণা থাকে না।

কাজ (Functions)—ক্লোরোপ্লাস্টিড থাকায় উদ্ভিদের রঙ সবুজ হয়। ইহার সাহায্যে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে। পুষ্পের ও পাকা ফলের বর্ণ-বৈচিত্র্যের জন্য ক্রোমোপ্লাস্টিড দায়ী। সুতরাং, ইহা পরোক্ষভাবে পরাগ-যোগে এবং ফল ও বীজ-বিস্তারে সাহায্য করে। লিউকোপ্লাস্টিড কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিপাকে সাহায্য করে।

(২) **মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria) বা কন্ড্রিওসোম (Chondriosomes)**—প্লাস্টিড ছাড়া, সাইটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে আরও কতকগুলি সূক্ষ্ম দানার মতো অথবা খুব ছোট দণ্ডের মতো বস্তু বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহারাই মাইটোকন্ড্রিয়া।

কাজ (Functions)—মাইটোকন্ড্রিয়া কোষের শ্বসন, ক্ষরণ এবং উৎসেচক-বিক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

সাইটোপ্লাজ্‌মের অন্তর্গত জড় বস্তু (Non-living contents of cytoplasm)—সাইটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে নানারকম জড় বস্তুও থাকে। ইহাদের অধিকাংশই ভ্যাকুওলের মধ্যে জলে দ্রবীভূত অবস্থায়, কলয়েড অবস্থায় অথবা কেলাসরূপে পাওয়া যায়। অনেক জড় বস্তু, অবশ্য, সাইটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে থাকে। এই জড় বস্তুগুলি প্রধানতঃ তিন ধরনের। যেমন—(১) গ্লুকোজ (Glucose), শ্বেতসার কণা (Starch grains), অ্যালিউরোন কণা (Aleurone grains), স্নেহদ্রব্য ও তৈল (Fats and oils) ইত্যাদি **সঞ্চিত বস্তু (Reserve materials)**; (২) রঞ্জক পদার্থ, উৎসেচক, মকরন্দ (Nectar) প্রভৃতি **ক্ষরিত পদার্থ (Secretory materials)** এবং (৩) তরুক্ষীর (Latex), সিস্টোলিথ (Cystolith), র‍্যাফাইড (Raphide) ও **অন্যান্য রেচন-পদার্থ (Excretory materials)**।

কাজ (Functions)—সাইটোপ্লাজ্‌মের অন্তর্গত জড় বস্তুগুলির কয়েকটি কোষের পরিপোষণে সাহায্য করে। অপর কতকগুলি জড় বস্তু পরোক্ষভাবে

শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। অনেকগুলি জড় বস্তু, অবশ্য, বিপাকজাত অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ।

নিউক্লিয়াস (Nucleus)

নিউক্লিয়াস সাধারণতঃ গোলাকার। ইহা সাইটোপ্লাজ্‌মের চেয়ে ঘন। ইহা যে বিশেষ ধরনের প্রোটোপ্লাজ্‌ম দিয়া প্রস্তুত, তাহাকে **নিউক্লিওপ্লাজ্‌ম** (Nucleoplasm), **ক্যারিওলিম্ফ** (Karyolymph) বা **নিউক্লিয়ার স্যাপ** (Nuclear sap) বলা হয়। নিউক্লিয়াসের পরিধি-বরাবর একটি সূক্ষ্ম আবরণ থাকে। ইহাকে **নিউক্লিয়ার মেম্‌ব্রেন** (Nuclear membrane) বলে। নিউক্লিওপ্লাজ্‌মের মধ্যে সুতার মতো কতকগুলি বস্তু দিয়া তৈয়ারী একটি জালিকা (Net-work) থাকে। ইহাকে **নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম** (Nuclear reticulum) বা **ক্রোমাটিন রেটিকুলাম** (Chromatin reticulum) বলা হয়। নিউক্লিওপ্লাজ্‌মের মধ্যে আরও একটি অপেক্ষাকৃত ঘন ও উজ্জ্বল ছোট গোলাকার বস্তু থাকে। ইহাকে **নিউক্লিওলাস** (Nucleolus) বলে।

কাজ (Functions)—নিউক্লিয়াস কোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইহা কোষের বিভাজন ও বৃদ্ধিতে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। এক কথায়, নিউক্লিয়াস কোষের যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা বংশগতি(Heredity)-র ধারক ও বাহক।

কোষ-প্রাচীর (Cell wall)

কোষ-প্রাচীর প্রধানতঃ সেলুলোজ (Cellulose) নামক জড় বস্তু দিয়া গঠিত। ইহা প্রোটোপ্লাজ্‌ম কর্তৃক ক্ষরিত পদার্থ দিয়া প্রস্তুত। কোষ-প্রাচীরে তিনটি স্তর থাকে। যেমন—(১) **মধ্যপর্দা** বা **মিড্‌ল-ল্যামেলা** (Middle lamella)—ইহা ক্যাল্‌শিয়াম পেক্‌টেট (Calcium pectate) নামক পদার্থ দিয়া তৈয়ারী ; (২) **প্রাথমিক প্রাচীর** (Primary wall)—ইহা মিড্‌ল-ল্যামেলার (ভিতরের দিকে) পরবর্তী স্তর এবং সেলুলোজ ও পেক্‌টিন (Pectin) দিয়া গঠিত ; (৩) **গৌণ প্রাচীর** (Secondary wall)—প্রাথমিক প্রাচীরের উপর আরও সেলুলোজ এবং অন্যান্য পদার্থ জমা হইয়া গৌণ প্রাচীর গঠিত হয়।

কাজ (Functions)—কোষ-প্রাচীর প্রোটোপ্লাজ্‌মকে বাহ্য আঘাত হইতে রক্ষা করে, কোষের সীমা-নির্দেশ করে এবং কোষকে নির্দিষ্ট আকার দান করে।

পরের পৃষ্ঠায় ছকের আকারে উদ্ভিদ-কোষের গঠন দেওয়া হইল।
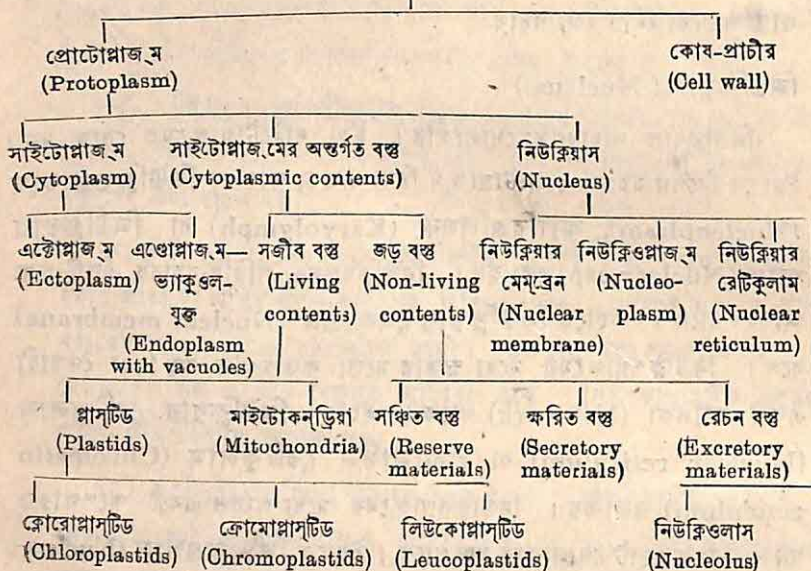
উদ্ভিদ-কোষের বৈচিত্র্য (Variety of plant cells)

অধিকাংশ উদ্ভিদ-কোষই হুবহু আদর্শ উদ্ভিদ-কোষের মতো নয়। অপরিণত উদ্ভিদ-কোষ ছোট এবং সাধারণতঃ গোলাকার। কিন্তু পরিণত উদ্ভিদ-কোষের আয়তন, আকার ও গঠনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। উদ্ভিদ-কোষ গোলাকার,
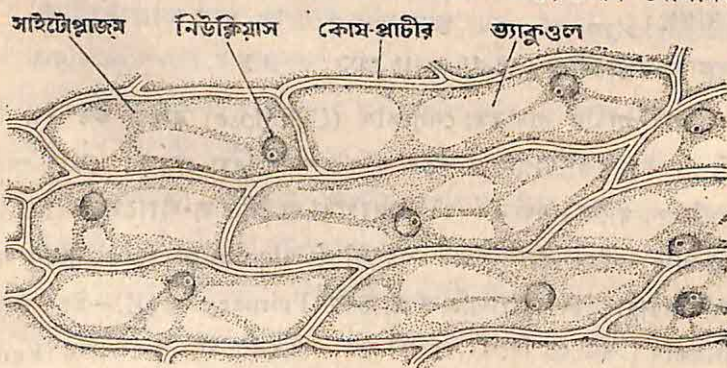
৩৭নং চিত্র—পিঁয়াজের শল্কপত্রে কোষ।

ষড়ভুজাকার (Hexagonal), বহুভুজাকার (Polyhedral) অথবা লম্বাটে ইত্যাদি নানা আকারের হইতে পারে। অধিকাংশ উদ্ভিদ-কোষের ব্যাস ০·০১ হইতে ১ মিলিমিটারের মধ্যে। তবে বট-জাতীয় উদ্ভিদের স্ক্লেরেন্‌কাইমা-কোষ ৫৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।

উদ্ভিদের জনন-কোষে কোষ-প্রাচীর থাকে না। এই কোষকে **নগ্ন কোষ** (Naked cell) বলে। আবার, প্রোটোপ্লাজ্‌ম-বিহীন কোষও দেখা যায়। ইহারা, অবশ্য, **মৃত কোষ** (Dead cells)। জাইলেম বাহিকা (Xylem vessel) মৃত কোষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সীভ নল (Sieve tube) নামক এক-ধরনের কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না। ছত্রাকের কোষে প্লাস্‌টিড পাওয়া যায় না।

আগের কয়েকটি অনুচ্ছেদে উদ্ভিদ-কোষের বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে উহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল।

প্রোটোপ্লাজ্‌ম
(Protoplasm)

প্রোটোপ্লাজ্‌ম (**Protoplasm** ; গ্রীক *protos*=প্রথম+*plasma*=আকার) এক অতি আশ্চর্যজনক পদার্থ। সব জীবই প্রোটোপ্লাজ্‌ম দিয়া গঠিত। ইহাই জীবনের আধার। জীবনের যাবতীয় ধর্ম প্রকৃতপক্ষে প্রোটোপ্লাজ্‌মের আভ্যন্তরীণ বিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ-মাত্র। প্রোটোপ্লাজ্‌ম কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যায় না ; কেবল প্রোটোপ্লাজ্‌ম হইতেই প্রোটোপ্লাজ্‌ম সৃষ্টি হয়। প্রোটোপ্লাজ্‌ম ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সেইজন্য, **হাক্‌সলে** (**Huxley**) ইহাকে **জীবনের ভৌত ভিত্তি** (**Physical basis of life**) বলিয়াছেন।

রবার্ট হুক যখন কোষ আবিষ্কার করেন, তখন তিনি উহার মধ্যে প্রোটোপ্লাজ্‌মের সন্ধান পান নাই। অনেক বছর পরে, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, সম্ভবতঃ **ডুজার্‌দিন** (**Dujardin**) প্রোটোপ্লাজ্‌ম আবিষ্কার করেন। অবশ্য, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে **পার্কিঞ্জি** (**Purkinje**) 'প্রোটোপ্লাজ্‌ম' কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। প্রোটোপ্লাজ্‌ম আবিষ্কারের পর হইতেই প্রোটোপ্লাজ্‌মের স্বরূপ জানার জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তবু ইহার সম্পর্কে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করা আজও সম্ভব হয় নাই। তাহার কারণ, জীবিত প্রোটোপ্লাজ্‌মের উপর সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় না। আবার, মৃত প্রোটোপ্লাজ্‌মের ধর্মও জীবিত প্রোটোপ্লাজ্‌মের তুলনায় অনেক তফাৎ। যাহাই হউক, প্রোটোপ্লাজ্‌ম সম্পর্কে মোটামুটিভাবে পরের পৃষ্ঠায় লিখিত তথ্যগুলি জানা গিয়াছে।

প্রোটোপ্লাজ্‌মের ভৌত ধর্ম (Physical properties of protoplasm)

প্রোটোপ্লাজ্‌ম একধরনের বর্ণহীন, ঈষদচ্ছ, জলের তুলনায় অল্প ভারী, সান্দ্র, স্থিতিস্থাপক, দানাদার এবং প্রচুর পরিমাণে জলযুক্ত পিচ্ছিল (Slimy) তরল(Fluid)-বিশেষ। বর্তমানে, অবশ্য, অনেকের মতে, প্রোটোপ্লাজ্‌মের রঙ ঈষৎ ধূসর (Greyish)। ইহার সান্দ্রতা (Viscosity) গ্লিসারিনের মতো। বিভিন্ন অবস্থায় প্রোটোপ্লাজ্‌মের জলের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে। জলের পরিমাণ কমিলে, প্রোটোপ্লাজ্‌মের বিপাকীয় ক্রিয়ার হার কমিয়া যায় এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ও সান্দ্রতা বাড়িয়া যায়। জলের পরিমাণ খুব বেশি কমিয়া গেলে, প্রোটোপ্লাজ্‌মের বিপাক বন্ধ হইয়া যায়। প্রোটোপ্লাজ্‌মের এই অবস্থাকে **অব্যক্ত অবস্থা** (Dormant condition) বলে। জলের পরিমাণ বাড়িয়া স্বাভাবিক হইলে, আবার বিপাকীয় ক্রিয়ার হার স্বাভাবিক হয়। স্থিতিস্থাপকতা ধর্মের জন্য, বিশেষ উপায়ে প্রোটোপ্লাজ্‌মকে টানিলে, উহা সূক্ষ্ম সুতার মতো লম্বা হয়। প্রোটোপ্লাজ্‌ম দেখিতে কেমন, সে-বিষয়ে নানা বিজ্ঞানীর নানা মত। কাহারও মতে, ইহা জালিকাকার (Reticular); কেহ কেহ ইহাকে তন্তুময় (Fibriller) এবং আবার একদল বিজ্ঞানী দানাদার (Granular) বলিয়াছেন; অপর একদল বিশেষজ্ঞের মতে, ইহা ফেনার মতো (Foamy)। অবশ্য, বর্তমানে এ-কথা সকলে স্বীকার করেন যে, প্রোটোপ্লাজ্‌ম একধরনের **কলয়েড** (Colloid)। কিন্তু ইহা কোন জাতীয় কলয়েড, তাহা জানা যায় নাই। তবে সম্ভবতঃ ইহা জলীয় মাধ্যমে প্রোটীন (Proteins) লিপিড (Lipids) এবং অন্যান্য পদার্থের এক অবদ্রব (Emulsion)। কলয়েড বলিয়া, প্রোটোপ্লাজ্‌মের **তঞ্চন** (Coagulation) হয়; অর্থাৎ, তাপ দিলে (ডিমের সাদা অংশ যেমন জমাট বাঁধিয়া যায়, তেমনি) জমাট বাঁধিয়া যায়। **উত্তেজতা** (Irritability) প্রোটোপ্লাজ্‌মের অন্যতম প্রধান ভৌত ধর্ম। প্রোটোপ্লাজ্‌মে সবসময় নানা ধরনের **চলন** (Movements) দেখা যায় (৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রোটোপ্লাজ্‌ম **আস্রবণ** (Osmosis) প্রক্রিয়ায় জল-গ্রহণ ও জল-ত্যাগ করিতে পারে।

প্রোটোপ্লাজ্‌মের রাসায়নিক গঠন (Chemical composition of protoplasm)

জীবন্ত প্রোটোপ্লাজ্‌মের রাসায়নিক গঠন সদা-পরিবর্তনশীল। প্রোটোপ্লাজ্‌মকে জীবন্ত অবস্থায় বিশ্লেষণ করা যায় না। মৃত প্রোটোপ্লাজ্‌মকে

প্রচলিত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মোটামুটিভাবে ইহার শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি জল এবং ২৫ ভাগেরও কম অন্যান্য পদার্থ। বিভিন্ন জীবে এই জলের পরিমাণ সচরাচর শতকরা ৬৬·৬ভাগ হইতে ৯০ ভাগের মধ্যে। তবে জলজ উদ্ভিদে জলের পরিমাণ শতকরা ৯৫ ভাগ, জেলি-ফিশ(Jelly-fish)-এ ইহা ৯৬ ভাগ। আবার, সুপ্ত বীজের প্রোটোপ্লাজ্‌মে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ জল থাকে।

অন্যান্য পদার্থের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই জৈব (Organic) পদার্থ এবং বাকি ১০ ভাগ অজৈব (Inorganic) পদার্থ। প্রোটীন, স্নেহদ্রব্য-জাতীয় বস্তু (Fatty substances) এবং জল-অঙ্গার (Carbohydrates)—এই তিন ধরনের জৈব পদার্থ প্রোটোপ্লাজ্‌মে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রোটীনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। প্রোটোপ্লাজ্‌মের শতকরা ৭ ভাগ হইতে ১৬ ভাগই প্রোটীন। প্রোটীন কার্বন (Carbon), হাইড্রোজেন (Hydrogen) ও অক্সিজেন (Oxygen) এবং কখনও কখনও সাল্‌ফার (Sulphur) ও ফস্‌ফরাস (Phosphorus) দিয়া গঠিত একধরনের খুব জটিল যৌগ-পদার্থ। স্নেহদ্রব্য-জাতীয় বস্তু প্রধানতঃ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়া প্রস্তুত। প্রোটোপ্লাজ্‌মের শতকরা প্রায় ১ ভাগ হইতে ৩ ভাগ এই-জাতীয় বস্তু। জল-অঙ্গারও এই তিনটি মৌল দিয়া গঠিত। প্রোটোপ্লাজ্‌মে শতকরা প্রায় ১ ভাগ হইতে ১·৫ ভাগ ৫-কার্বন-যুক্ত পেন্‌টোজ শর্করা (Pentose sugars) ও অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় পদার্থ থাকে।

প্রোটোপ্লাজ্‌মের অন্তর্গত অজৈব পদার্থগুলি প্রধানতঃ বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ। প্রোটোপ্লাজ্‌মে শতকরা প্রায় ১ হইতে ২·৫ ভাগ অজৈব পদার্থ থাকে। ইহাদের সচরাচর সোডিয়াম (Sodium), পটাশিয়াম (Potassium), ক্যাল্‌শিয়াম (Calcium), ম্যাগ্‌নেশিয়াম (Magnesium), এবং আয়রন (Iron)-এর ফস্‌ফেট (Phosphate), সাল্‌ফেট (Sulphate), ক্লোরাইড (Chloride) এবং কার্বোনেট (Carbonate) হিসাবে পাওয়া যায়।

প্রোটোপ্লাজ্‌মে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ নিম্নলিখিত অনুপাতে পাওয়া যায়:—

অক্সিজেন (৬৩%), কার্বন (২০·২%), হাইড্রোজেন (৯·৯%), নাইট্রোজেন (২·৫%), ক্যাল্‌শিয়াম (২·৫%), ফস্‌ফরাস (১·১৪%), ক্লোরিন (০·১৬%), সাল্‌ফার (০·১৪%), পটাশিয়াম (০·১১%), সোডিয়াম (০·১১%), ম্যাগ্‌নেশিয়াম (০·০৭%), আয়রন (০·০১%)।

পূর্বোক্ত মৌলিক পদার্থগুলি ছাড়া, নানা জীবের প্রোটোপ্লাজ্‌মে ফ্লোরিন (Fluorine), সিলিকন (Silicon), ম্যাঙ্গানিজ (Manganese), কপার (Copper), জিঙ্ক্ (Zinc), আয়োডিন (Iodine), কোবল্ট (Cobalt), নিকেল (Nickel), ব্রোমিন (Bromine), ভ্যানাডিয়াম (Vanadium) প্রভৃতি আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থ খুব অল্পমাত্রায় পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, উপরের বিবরণ হইতে প্রোটোপ্লাজ্‌মে কি কি পদার্থ কি কি অনুপাতে আছে তাহা জানা গেলেও, উহারা কিভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া রহস্যময় প্রোটোপ্লাজ্‌ম সৃষ্টি করে, তাহা জানা যায় না।

প্রোটোপ্লাজ্‌মের রাসায়নিক ধর্ম (Chemical properties of protoplasm)

প্রোটোপ্লাজ্‌ম মৃদু ক্ষারীয় (Alkaline) অথবা প্রশমিত (Neutral)। ইহা সচরাচর আম্লিক (Acidic) হয় না। মিলন-এর বিকারক (Millon's reagent) অর্থাৎ মার্‌কিউরিক নাইট্রেট(Mercuric nitrate)-এর জলীয় দ্রবণ প্রয়োগের পর অল্প উত্তপ্ত করিলে, প্রোটোপ্লাজ্‌ম সুরকির মতো লাল হইয়া যায়। প্রোটোপ্লাজ্‌মে নাইট্রিক অ্যাসিড (Nitric acid) দিয়া উত্তপ্ত করিলে, উহা হলুদ হইয়া যায়। ঠাণ্ডা করার পর উহাতে কয়েক ফোঁটা অ্যামোনিয়া দিলে, হলুদ রঙ কমলা রঙে পরিবর্তিত হয়। আয়োডিনের দ্রবণ(Iodine solution)-এর সংস্পর্শে প্রোটোপ্লাজ্‌ম বাদামী-হলুদ (Brownish yellow) হইয়া যায়।

প্রোটোপ্লাজ্‌মের চলন (Movements of protoplasm)

জীবিত প্রোটোপ্লাজ্‌ম সদা-চঞ্চল। ইহাতে সবসময়ে নানারকম চলন দেখা যায়। এই চলন প্রধানতঃ তিন রকম। যেমন—

(১) **অ্যামিবয়েড (Amoeboid)**—কোষ-প্রাচীর-বিহীন কোষে অর্থাৎ নগ্ন কোষে এই ধরনের চলন দেখা যায়। অ্যামিবয়েড চলনের সময়, আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে, নির্দিষ্ট আকার-বিহীন কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌ম গতিপথের দিকে সূক্ষ্ম আঙুলের মতো প্রসারিত হইয়া যায়। এই প্রসারিত অংশকে **ক্ষণপাদ** বা **স্যুডোপোডিয়াম*** (**Pseudopodium** ; গ্রীক *pseudes* = অপ্রকৃত + *podion* = পদ) বলে। স্যুডোপোডিয়ামের বিপরীত দিকে প্রোটোপ্লাজ্‌ম সঙ্কুচিত হইয়া কোষে প্রবেশ করে। এইভাবে, প্রোটোপ্লাজ্‌মের নিয়মিত সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা, কোষটি গতিপথের দিকে সামান্য আগাইয়া যায়।

* একবচন ; স্যুডোপোডিয়া (Pseudopodia) — বহুবচন।

এইরকম চলনের দ্রুতি খুব অল্প। অ্যামিবা (*Amoeba*) নামক এককোষী প্রাণীতে ইহা দেখা যায় বলিয়া, এই চলনকে অ্যামিবয়েড চলন (Amoeboid movement) বলা হয়। অ্যামিবা ছাড়া, মিক্সোমাইসিটিস (Myxomycetes) নামক একজাতীয় ছত্রাকে অ্যামিবয়েড চলন দেখা যায়। অ্যামিবয়েড চলনের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য জীব-বিজ্ঞান—তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(২) **সিলিয়ারী** (Ciliary)—এই ধরনের চলনও নগ্ন কোষে দেখা যায়। এক্ষেত্রে কোষের পরিধিতে সূক্ষ্ম চাবুকের মতো কয়েকটি গঠন থাকে। এই-গুলিকে **সিলিয়া*** (Cilia ; ল্যাটিন *cilium*=চোখের পাতা) বলা হয়। ইহারা প্রোটোপ্লাজ্‌ম দিয়া গঠিত। জল অথবা অন্য কোনও তরল মাধ্যমে সিলিয়া দ্রুত আন্দোলিত করিয়া কোষ অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি স্থান পরিবর্তন
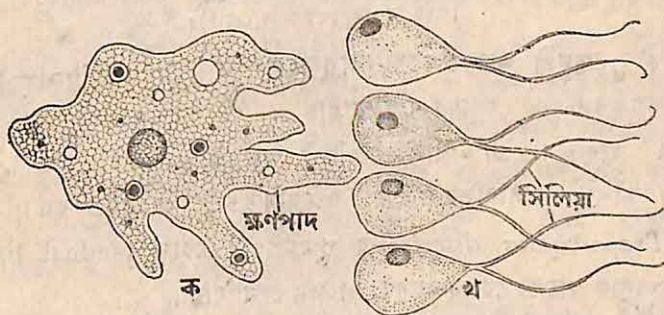
৩৮নং চিত্র—ক. অ্যামিবয়েড চলন (অ্যামিবা), খ. সিলিয়ারী চলন (মসের পুং-জনন-কোষ)।

করিতে পারে। ক্লামাইডোমোনাস (৩০নং চিত্র-গ) নামক এককোষী শেওলায়, কয়েক ধরনের এককোষী প্রাণীতে এবং মস ও ফার্ণের পুং-জনন-কোষ(Male gamete)-এ এইরকম চলন দেখা যায়।

(৩) আবর্তন বা **সাইক্লোসিস** (Cyclosis)—নির্দিষ্ট কোষ-প্রাচীর-যুক্ত কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মে যে চলন দেখা যায়, তাহাকে আবর্তন বলে। ইহা আবার দুই ধরনের। যেমন—

(ক) **একমুখী আবর্তন** বা **রোটেশান** (Rotation)—যে কোষে এই ধরনের চলন দেখা যায়, তাহার কেন্দ্রে একটি বড় ভ্যাকুওল থাকে এবং প্রোটোপ্লাজ্‌ম কোষ-প্রাচীরের ধার ঘেঁষিয়া একটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে। এক্ষেত্রে প্রোটোপ্লাজ্‌ম অনবরত একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া,

* বহুবচন ; সিলিয়াম (Cilium) — একবচন।

এইরকম চলনকে একমুখী আবর্তন বলা হয়। পাতাশেওলা, ঝাঁঝি এবং অন্যান্য অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদের কোষে একমুখী আবর্তন দেখা যায়।
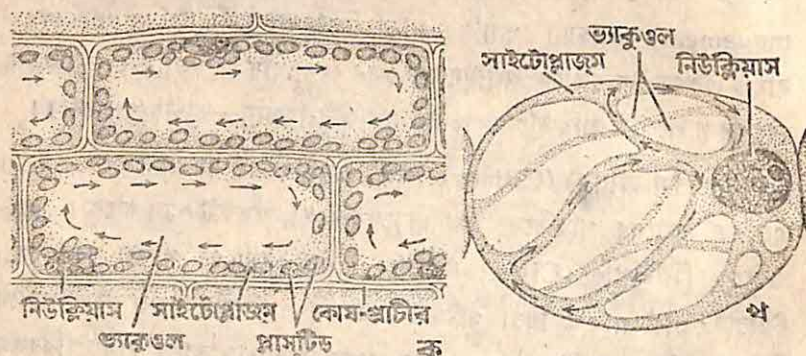
৩৯নং চিত্র—ক. একমুখী আবর্তন (পাতাশেওলার পত্রে), খ. বহুমুখী আবর্তন (জহর-চাঁপার পুংকেশরীয় রোমে)।

(খ) **বহুমুখী আবর্তন বা সার্কুলেশান (Circulation)**—অনেকগুলি ভ্যাকুওল-যুক্ত কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মে এইরকম আবর্তন দেখা যায়। বহুমুখী আবর্তনে প্রোটোপ্লাজ্‌ম প্রতিটি ভ্যাকুওলের পরিধি-বরাবর, নানা দিকে, আলাদা-আলাদাভাবে এবং অনিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয়। জহর-চাঁপা(*Tradescantia discolor*)-র পুংকেশরীয় রোম(Staminal hair)-এ এবং কুমড়ার কাণ্ডের রোমে বহুমুখী আবর্তন দেখা যায়।

নিচে প্রোটোপ্লাজ্‌মের বিভিন্ন রকম চলনের ছক দেওয়া হইল।
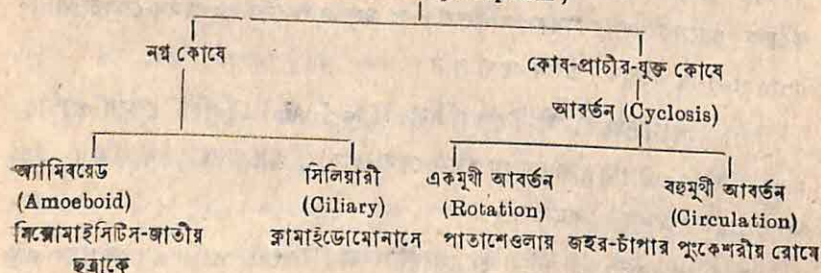
প্রোটোপ্লাজ্‌মীয় বস্তু
(Protoplasmic contents)

আদর্শ উদ্ভিদ-কোষের বিবরণ হইতে সহজে বোঝা যায় যে, উদ্ভিদ-কোষের অংশগুলিকে সজীব ও জড়—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কোষের সজীব

অংশগুলি (Living contents of the cell) প্রোটোপ্লাজ্‌ম-নির্মিত বলিয়া, ইহাদের কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মীয় বস্তু (Protoplasmic contents of the cell)-ও বলা যায়। নিচে ইহাদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

নির্দিষ্ট কোষ-প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত, সংগঠিত প্রোটোপ্লাজ্‌মের অংশকে **প্রোটোপ্লাস্‌ট** (Protoplast) বলা হয়। **হ্যান্‌স্‌টেইন** (Hanstein) ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রোটোপ্লাস্‌ট কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। সাইটোপ্লাজ্‌ম, নিউক্লিয়াস, প্লাস্‌টিড, মাইটোকন্‌ড্রিয়া ইত্যাদি প্রোটোপ্লাস্‌টের বিভিন্ন অংশের গঠন, কাজ প্রভৃতি নিম্নরূপ।

সাইটোপ্লাজ্‌ম (Cytoplasm)

নিউক্লিয়াস, প্লাস্‌টিড, মাইটোকন্‌ড্রিয়া প্রভৃতি সজীব বস্তু এবং (৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত) জড় বস্তুগুলি ছাড়া, প্রোটোপ্লাজ্‌মের যে প্রধান ভাগ বাকি থাকে, তাহার নামই **সাইটোপ্লাজ্‌ম** (Cytoplasm ; গ্রীক *kytos*=ফাঁপা+*plasma*=আকার)। **কলিকার** (Kolliker) ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সাইটোপ্লাজ্‌ম কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। সাইটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে প্রোটোপ্লাজ্‌মের অন্যান্য অংশ বিন্যস্ত থাকে। সেইজন্য, ইহাকে প্রোটোপ্লাজ্‌মের ধাত্র (Matrix) বলা যায়। ৭৪—৭৬ পৃষ্ঠায় প্রোটোপ্লাজ্‌মের গঠন ও ধর্মের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সাইটোপ্লাজ্‌মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সাইটোপ্লাজ্‌মের পরিধিস্থ অংশ একটি খুব সূক্ষ্ম পর্দার মতো। ইহাকে **এক্টোপ্লাজ্‌ম** (Ectoplasm ; গ্রীক *ektos*=বাহির+*plasma*=আকার) বলা হয়। অনেকে ইহাকে **প্লাজ্‌মা মেম্‌ব্রেন** (Plasma membrane)-ও বলিয়া থাকেন। এক্টোপ্লাজ্‌ম কাচিক এবং অপেক্ষাকৃত ঘন। ইহা আভেদ্য পর্দার কাজ করে। তবে এক্টোপ্লাজ্‌ম হুবহু জড় আভেদ্য পর্দার মতো নয়। সাইটোপ্লাজ্‌মের বাকি অংশ বেশি ঘন এবং দানাদার। ইহাকে **এণ্ডোপ্লাজ্‌ম** (Endoplasm ; গ্রীক *endon*=ভিতর+*plasma*=আকার) বলা হয়।

কাজ (Functions)—সাইটোপ্লাজ্‌ম-ই অধিকাংশ বিপাকের কেন্দ্রস্থল। প্লাজ্‌মা মেম্‌ব্রেন কোষ হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে কোষে গ্যাস ও জলীয় দ্রবণের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে। কোষ-প্রাচীর ছাড়া, কোষের অন্যান্য সমস্ত জড় ও সজীব বস্তু ধারণ করাও সাইটোপ্লাজ্‌মের কাজ।

নিউক্লিয়াস (Nucleus)

সাধারণতঃ সমস্ত সজীব কোষেই প্রোটোপ্লাজ্‌ম দিয়া গঠিত একটি বড় গোল অথবা ডিম্বাকার অংশ থাকে। ইহাকে **নিউক্লিয়াস** (Nucleus ;

ল্যাটিন *nucleus*=শাঁস) বলে। অপরিণত কোষে ইহা কোষের মাঝখানে দুই-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া থাকে। পরিণত কোষে ইহা কোষ-প্রাচীরের ধার ঘেঁষিয়া থাকে। অধিকাংশ কোষে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস থাকে। তবে কারা (*Chara*) নামক শেওলার কোষে দুইটি এবং ভাউকেরিয়া (*Vaucheria*) ও ক্লাডোফোরা (*Cladophora*) ইত্যাদি শেওলার কোষে এবং সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষীরকোষ(Latex cell)-এ অনেকগুলি করিয়া নিউক্লিয়াস দেখা যায়। উৎপত্তির সময়, সীভ নল(Sieve tube)-এর কোষগুলিতে নিউক্লিয়াস থাকিলেও, পরিণত কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না। নিচে নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হইল।

(১) **নিউক্লিয়ার মেমব্রেন (Nuclear membrane)**—ইহা নিউক্লিয়াসের পরিধি-বরাবর অবস্থিত সূক্ষ্ম আভেদ্য পর্দা-বিশেষ। সাইটোপ্লাজ্‌ম ও নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের প্রবেশ ও বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা ইহার কাজ।

(২) **নিউক্লিওপ্লাজ্‌ম (Nucleoplasm), নিউক্লিয়ার স্যাপ (Nuclear sap)** বা **ক্যারিওলিম্ফ (Karyolymph** ; গ্রীক *karyon*= নিউক্লিয়াস+ল্যাটিন *lympha*=জল)—নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজ্‌মকে নিউক্লিওপ্লাজ্‌ম বলা হয়। ইহার রাসায়নিক ধর্ম ও ভৌত ধর্ম প্রোটোপ্লাজ্‌মের মতো; তবে বেশি ঘন। নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম ধারণ করা নিউক্লিওপ্লাজ্‌মের কাজ।
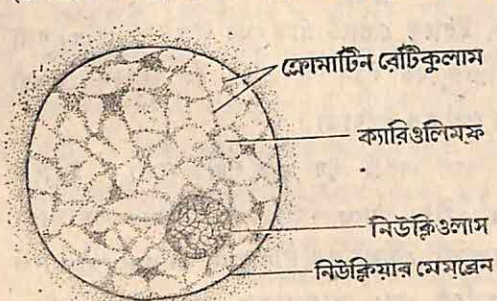
৪০নং চিত্র—নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশ।

(৩) **নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম (Nuclear reticulum** ; ল্যাটিন *reticulum*=ছোট জালিকা)—সুতার মতো কতকগুলি বস্তু পরস্পর যুক্ত থাকিয়া, নিউক্লিওপ্লাজ্‌মের মধ্যে জালিকার মতো নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম গঠন করে। সুতার মতো বস্তুগুলিকে **ক্রোমোনিমাটা*** (Chromonemata ; গ্রীক *kroma*=রঙ+*nema*=সুতা) বলে। ক্রোমোনিমাটার উপর **ক্রোমাটিন** (Chromatin) নামক অসংখ্য সূক্ষ্ম কণিকা সাজানো থাকে। সেইজন্য, নিউক্লিয়ার রেটিকুলামকে **ক্রোমাটিন রেটিকুলাম**

* বহুবচন ; ক্রোমোনিমা (Chromonema) — একবচন।

(Chromatin reticulum)-ও বলা হয়। কোষ-বিভাজনের সময়, নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং উহা হইতে সূক্ষ্ম সুতার মতো নির্দিষ্ট-সংখ্যক **ক্রোমোজোম** (Chromosomes ; গ্রীক *kroma*=রঙ+*soma*=দেহ) সৃষ্টি হয়। ক্রোমোজোম প্রোটীন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid) দিয়া গঠিত। ক্রোমোজোমে অবস্থিত **জিন**(Gene ; গ্রীক *genos*=উৎপত্তি)-গুলি বংশগতির ধারক ও বাহক হিসাবে ধরা হয়।

(৪) **নিউক্লিওলাস** (Nucleolus ; ল্যাটিন *nucleolus*=অপেক্ষাকৃত কম শাঁস)—নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ঘন এবং উজ্জ্বল, গোলাকার অংশকে নিউক্লিওলাস বলে। ইহার কোনও আবরণ নাই। কোষ-বিভাজনের সময় ইহা বিলুপ্ত হয়। নিউক্লিয়াসে সাধারণতঃ একটি নিউক্লিওলাস থাকে ; তবে একাধিক নিউক্লিওলাস-ও থাকিতে পারে। ইহাতে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Ribonucleic acid, সংক্ষেপে R.N.A.) বেশি পরিমাণে থাকায়, ইহা প্রোটীন-বিপাকে সাহায্য করে।

কাজ (Functions)—নিউক্লিয়াসকে কোষের প্রাণকেন্দ্র বলা যাইতে পারে। কোষের সমস্ত বিপাক নিয়ন্ত্রণ করা ইহার কাজ। বেশি পরিমাণে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকায়, প্রোটীন-বিপাকে ইহা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। কোষ-বিভাজনেও নিউক্লিয়াসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ক্রোমোজোমগুলি বংশগতি নিয়ন্ত্রণ করে।

প্লাস্‌টিড (Plastids)

উদ্ভিদ-কোষের সাইটোপ্লাজ্‌মে নিউক্লিয়াসের চেয়ে অনেক ছোট, সাধারণতঃ গোল, লম্বাটে অথবা দানার মতো অনেকগুলি সজীব বস্তু থাকে। ইহাদের **প্লাস্‌টিড** (Plastids ; গ্রীক *plastos*=আকার-যুক্ত) বলে। নীল-হরিৎ শেওলা (Blue-green algae) এবং ছত্রাকের কোষে, অবশ্য, প্লাস্‌টিড থাকে না! আবার, অধিকাংশ শেওলার কোষে একটি, জিগ্‌নেমা (*Zygnema*) নামক শেওলার কোষে মাত্র দুইটি প্লাস্‌টিড থাকে (৪৪নং চিত্র-গ)। উন্নততর উদ্ভিদের প্লাস্‌টিডের ব্যাস ৪ হইতে ৬ মাইক্রা* (Micra)। অবশ্য, ইহার অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। ভাজক কলার কোষে দানার মতো **প্রো-প্লাস্‌টিড** (Proplastid) বা **প্লাস্‌টিড প্রাইমর্‌ডিয়া** (Plastid primordia) নামক অংশ হইতে প্লাস্‌টিড উৎপন্ন হয়। প্লাস্‌টিডে বিভিন্ন ধরনের **রঞ্জক** বা

* বহুবচন ; মাইক্রন (Micron) — একবচন। ১ মাইক্রন=$\frac{১}{১,০০০}$ মিলিমিটার।

পিগ্‌মেন্ট (Pigment) থাকে। রঙ্গকের ভিত্তিতে, উদ্ভিদ-কোষে তিন রকম প্লাস্‌টিড দেখা যায়। যেমন—(১) লিউকোপ্লাস্‌টিড (Leucoplastids), (২) ক্রোমোপ্লাস্‌টিড (Chromoplastids) এবং (৩) ক্লোরোপ্লাস্‌টিড (Chloroplastids)। লিউকোপ্লাস্‌টিডে, অবশ্য, কোনও রঙ্গক থাকে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ক্লোরোপ্লাস্‌টিড প্রকৃতপক্ষে ক্রোমোপ্লাস্‌টিডের অন্তর্গত এক বিশেষ ধরনের প্লাস্‌টিড। তবে উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় ইহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায়, ইহাকে পৃথক শ্রেণীতে গণ্য করা হয়।

(১) **লিউকোপ্লাস্‌টিড** (Leucoplastids ; গ্রীক *leukos*=সাদা)—ইহারা বর্ণহীন প্লাস্‌টিড। উদ্ভিদের যে অঙ্গ সূর্যালোক পায় না, সেই অঙ্গে লিউকোপ্লাস্‌টিড বা **লিউকোপ্লাস্ট** (Leucoplasts) দেখা যায়। সব ভাজক কলায়, মূলে এবং মৃদ্‌গত কাণ্ডে লিউকোপ্লাস্ট থাকে। ইহাদের আকার দানার মতো অথবা লম্বাটে। অধিকাংশ মূলে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের লিউকোপ্লাস্ট দেখা যায়। ইহাদের **অ্যামাইলোপ্লাস্ট** (Amyloplast ; গ্রীক *amylon*=শ্বেতসার) বলে। রজনীগন্ধার পুষ্পের ত্বকে বিশেষ ধরনের লিউকোপ্লাস্ট দেখা যায়। ইহার গায়ে বিন্দু বিন্দু তৈল থাকে। ইহা **ইলায়োপ্লাস্ট** (Elaioplast ; গ্রীক *elaion*=তৈল) নামে পরিচিত।
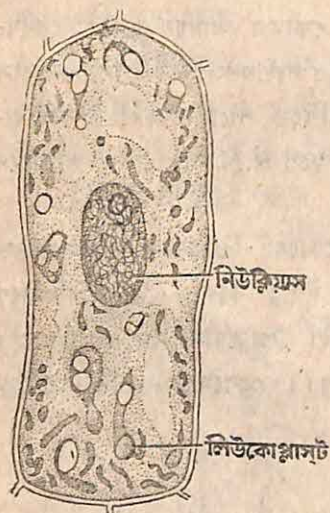
৪১নং চিত্র—রাইয়ের মূলের কোষে লিউকোপ্লাস্ট।

কাজ (Functions)—অ্যামাইলোপ্লাস্ট প্রয়োজন অনুসারে শর্করাকে শ্বেতসারে পরিণত করে। ইলায়োপ্লাস্ট তৈল-বিপাকে অংশ গ্রহণ করে।
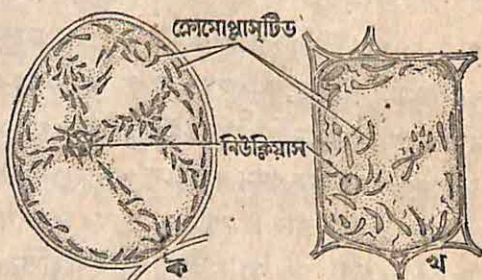
৪২নং চিত্র—ক্রোমোপ্লাস্ট: ক. টম্যাটোর কোষে, খ. গাজরের মূলের কোষে।

(২) **ক্রোমোপ্লাস্‌টিড** (Chromoplastids ; গ্রীক *chroma*=রঙ)—উদ্ভিদের রঙিন অংশে, অর্থাৎ পুষ্প, ফলত্বক এবং ক্ষেত্রবিশেষে

পত্রে ক্রোমোপ্লাস্টিড বা **ক্রোমোপ্লাস্ট** (Chromoplasts) দেখা যায়। ইহার মধ্যে দুই ধরনের রঙ্গক থাকে—**ক্যারোটিন** (Carotin, Carotene ; ল্যাটিন *carota*=গাজর) এবং **জ্যান্থোফিল** (Xanthophyll ; গ্রীক *xanthos*=হলুদ+*phyllon*=পত্র)। ইহাদের মধ্যে প্রথমটির রঙ কমলা এবং শেষেরটি হলুদ রঙের। এই দুইটি রঙ্গককে একসঙ্গে **ক্যারোটিনয়েড্স** (Carotinoids) বলা হয়।

কাজ (Functions)—পুষ্পের উজ্জ্বল রঙে আকৃষ্ট হইয়া কীট-পতঙ্গ পরাগ-যোগ (Pollination) ঘটায়। অতএব, ক্রোমোপ্লাস্টিড পরোক্ষভাবে পরাগ-যোগে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া, ক্যারোটিনয়েড্স অংশতঃ সালোকসংশ্লেষেও সাহায্য করিয়া থাকে।

(৩) **ক্লোরোপ্লাস্টিড** (Chloroplastids ; গ্রীক *chloros*=সবুজ)—উদ্ভিদের সূর্যালোকিত অংশে ক্লোরোপ্লাসটিড বা **ক্লোরোপ্লাস্ট** (Chloroplasts) থাকে। পত্রে এবং সবুজ কাণ্ডের কোষে ইহাদের বেশি পরিমাণে দেখা যায়। মূল এবং মৃদ্‌গত কাণ্ডের কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না।

উন্নততর উদ্ভিদের কোষে ক্লোরোপ্লাস্টিডের আকার সাধারণতঃ গোল অথবা ডিম্বাকার। এক্ষেত্রে প্লাস্টিডের প্রধান দেহটিকে **স্ট্রোমা** (Stroma ; গ্রীক *stroma*=শয্যা) বলে। ইহার চারদিকে একটি পাতলা আভেদ্য পর্দা থাকে। স্ট্রোমার মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে একাধিক স্তরযুক্ত অংশ থাকে। ইহাদের **গ্রানা** (Grana ; ল্যাটিন *granum*=দানা) বলে। গ্রানার মধ্যে **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll) নামক সবুজ রঙ্গক থাকে।
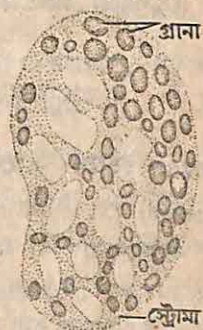
৪৩নং চিত্র—ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন।

শেওলাতে নানা ধরনের ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায় (৪৪নং চিত্র)। যেমন—ক্লামাইডোমোনাসে পেয়ালার মতো (Cup shaped) ; হাইড্রোডিক্টিয়ন (*Hydrodictyon*) এবং ইউডোগোনিয়াম(*Oedogonium*)-এ জালকাকার (Reticulate) ; স্পাইরোগাইরায় সর্পিলাকার (Spiral), জিগ্‌নেমায় তারকাকার (Stellate) ; ইউলোথ্রিক্সে ফিতার মতো (Band shaped) ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায়। শেওলার প্লাস্টিডের মধ্যে একাধিক **পাইরিনয়েড** (Pyrenoid) থাকে। পাইরিনয়েড, প্রোটীন দিয়া আবৃত শ্বেতসার। অ্যান্থোসেরস নামক ব্রা'ওফাইটার কোষে মাকুর মতো (Spindle shaped) ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

কাজ (Functions)—ক্লোরোপ্লাস্ট সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে। ইহা সূর্যালোকে, ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে, জল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড মিলিয়া এক বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ-দেহে প্রাথমিক খাদ্য গ্লুকোজ উৎপন্ন
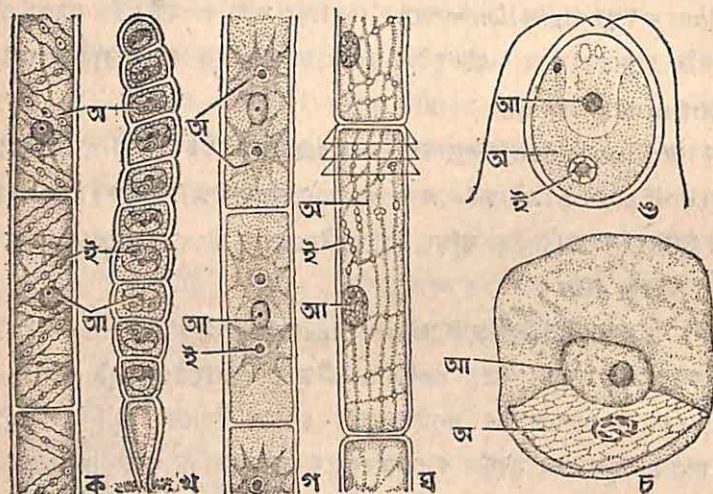
৪৪নং চিত্র—ক্লোরোপ্লাস্ট : ক. স্পাইরোগাইরা, খ. ইউলোথিকস, গ. জিগ্নেমা, ঘ. ইউডোগোনিয়াম, ঙ. ক্লামাইডোমোনাস, চ. অ্যান্থোসেরসের কোষ। [অ—ক্লোরোপ্লাস্ট, আ—নিউক্লিয়াস, ই—পাইরিনয়েড।]

করে। ইহাকে **সালোকসংশ্লেষ** বা **ফোটোসিন্থিসিস (Photosynthesis)** বলে। প্রাথমিক খাদ্য হইতে অন্যান্য খাদ্য তৈয়ারি হয়।

অ্যান্থোসায়ানিন (Anthocyanin) নামক একধরনের রঙ্গক কণা কোনও প্লাস্টিডে থাকে না; সাধারণতঃ ভ্যাকুওলে দ্রবীভূত থাকে। বেশিমাত্রায় অ্যান্থোসায়ানিন থাকায়, বীট এবং কতকগুলি পুষ্পের রঙ লাল হয়।

সাইটোপ্লাজ্ম, নিউক্লিয়াস ও প্লাস্টিড ছাড়া, নিম্নলিখিত সজীব বস্তুগুলিও প্রোটোপ্লাজ্মে থাকে।

(ক) **মাইটোকন্ড্রিয়া*** (Mitochondria) বা **কন্ড্রিওসোম** (Chondriosomes)—সাইটোপ্লাজ্মে খুব সূক্ষ্ম দানা অথবা দণ্ডের মতো একাধিক সজীব বস্তু থাকে; ইহাদের **মাইটোকন্ড্রিয়া** (Mitochondria; গ্রীক *mitos*=সুতা+*kondrion*=দানা) বা **কন্ড্রিওসোম** (Chondriosomes; গ্রীক *kondrion*=দানা+*soma*=দেহ) বলে। ইহারা প্রধানতঃ লিপিড (Lipid) এবং প্রোটীন দিয়া গঠিত। ইহাদের আকার ·২ হইতে ·৩ মাইক্রন। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাদের সহজে দেখা যায় না। প্রতিটি কন্ড্রিওসোমের চারদিকে একটি আভেদ্য পর্দা এবং ঐ পর্দা হইতে উৎপন্ন তাক(Shelf)-এর মতো অনেকগুলি উপবৃদ্ধি থাকে। ইহারা সাইটোপ্লাজ্মের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলাফেরা করে। মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শ্বাস-উৎসেচক (Respiratory enzymes) থাকায়, ইহারা শ্বসন নিয়ন্ত্রণ করে।

---

* বহুবচন; মাইটোকন্ড্রিয়ন (Mitochondrion) — একবচন।

(খ) মাইক্রোসোম (Microsomes) বা রাইবোসোম (Ribosomes)—উদ্ভিদ-কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মে মাইটোকনড্রিয়ার চেয়ে ছোট, দানাদার, কতকগুলি সজীব বস্তু থাকে। ইহাদের **মাইক্রোসোম** (Microsomes ; গ্রীক *micros*=ক্ষুদ্র+*soma*=দেহ) বা **রাইবোসোম** (Ribosomes) বলে। ইহাদের মধ্যে রাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড (Ribose nucleic acid) বা (সংক্ষেপে) আর.এন.এ. (R.N.A.) বেশি থাকায়, ইহারা প্রোটীন-বিপাকে সাহায্য করে।

(গ) গল্‌জি বস্তু (Golgi material)—কয়েক ধরনের অনুন্নত উদ্ভিদের কোষে গল্‌জি বস্তু (Golgi material ; বিজ্ঞানী Golgi-র নাম অনুসারে) নামে আর একরকম সজীব বস্তু পাওয়া যায়। ইহাদের আকার সুতার মতো এবং ইহারা দলবদ্ধভাবে থাকে। ইহাদের কাজ সম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ ইহারা কোষ-প্রাচীর গঠনে সাহায্য করে। উন্নততর উদ্ভিদের কোষে, অবশ্য, গল্‌জি বস্তু থাকে না।

(ঘ) সেন্‌ট্রোসোম (Centrosome)—অধিকাংশ প্রাণি-কোষে এবং শেওলা ও ছত্রাকের কোষে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি গোলাকার একধরনের সজীব বস্তু দেখা যায়। ইহাকে **সেন্‌ট্রোসোম** (Centrosome ; গ্রীক *kentron*=বিন্দু+*soma*=দেহ) বলে। সেন্‌ট্রোসোমের মধ্যে একটি অথবা দুইটি সূক্ষ্ম দানার মতো অংশ থাকে। ইহাদের **সেন্‌ট্রিওল** (Centriole) বলা হয়। কোষ-বিভাজনের সময় ইহা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। উন্নততর উদ্ভিদের কোষে ইহাদের পাওয়া যায় না।

কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌ম-বিহীন বস্তু
(Non-protoplasmic cell contents)

সজীব বস্তু ছাড়া, প্রোটোপ্লাজ্‌মে বিভিন্ন ধরনের জড় বস্তু অথবা জড়-অংশ দেখা যায়। ইহাদের **কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌ম-বিহীন বস্তু** (Non-protoplasmic cell contents), **অজীবীয় বস্তু** বা **আর্‌গ্যাস্‌টিক বস্তু** (Ergastic substances ; গ্রীক *ergastikos*=শক্তিদায়ক)-ও বলে। নিচে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

ভ্যাকুওল (Vacuole)

উদ্ভিদ-কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মে একটি অথবা কয়েকটি আপাতদৃষ্টিতে শূন্য-স্থান বা গহ্বর থাকে। ইহাদের **ভ্যাকুওল** (Vacuole ; ল্যাটিন *vacuus* =শূন্য) বা **কোষ-গহ্বর** বলে। ভ্যাকুওলগুলি তরল পদার্থে পূর্ণ। এই তরল পদার্থকে **কোষ-রস** বা **সেল স্যাপ** (Cell sap) বলা হয়। কোষ-রসে বিভিন্ন ধরনের সঞ্চিত খাদ্য, জৈব অ্যাসিড, অজৈব লবণ, রঙ্গক, বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি দ্রবীভূত থাকে। একটি আভেদ্য পর্দা দিয়া ভ্যাকুওল প্রোটোপ্লাস্ট হইতে পৃথক থাকে। পর্দাটিকে **টোনোপ্লাজ্‌ম** (Tonoplasm ; গ্রীক *tonos* =টান+*plasma*=আকার) বা **টোনোপ্লাস্ট** (Tonoplast) বলে।

অপরিণত কোষে, আকারে ছোট (অনেক সময় গুঁড়ি গুঁড়ি দানার মতো) অনেকগুলি ভ্যাকুওল থাকে। কোষের আয়তন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকুওল-গুলিও একসঙ্গে যুক্ত হইয়া এবং কোষের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া একটি বড়
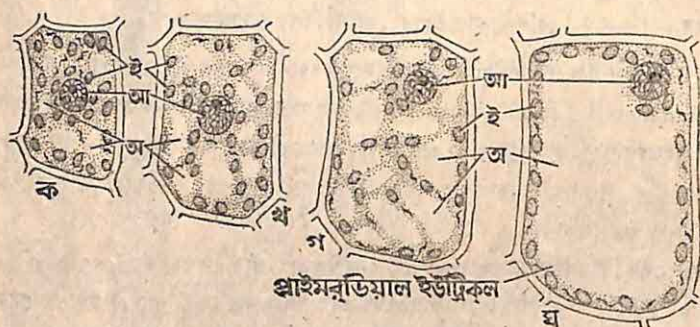
৪৫নং চিত্র—ক. হইতে ঘ. প্রাইমর্‌ডিয়াল ইউট্রিক্‌ল-সৃষ্টির ক্রমিক দশা।

ভ্যাকুওল গঠন করে। ফলে, প্রোটোপ্লাস্ট কোষ-প্রাচীরের ধার ঘেঁষিয়া একটি পাতলা স্তরে বিন্যস্ত থাকে। প্রোটোপ্লাস্টের এই পাতলা স্তরকে **প্রাইমর্‌ডিয়াল ইউট্রিক্‌ল** (Primordial utricle) বলা হয়।

শর্করা (Sugar)

শর্করা সরল **জল-অঙ্গার** বা **কার্বোহাইড্রেট** (Carbohydrate)। ইহা জলে দ্রাব্য এবং সাইটোপ্লাজ্‌মে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। দ্রাক্ষাশর্করা (Grape sugar) বা গ্লুকোজ (Glucose ; রাসায়নিক সঙ্কেত—$C_6H_{12}O_6$), ফ্রুক্‌টোজ (Fructose ; রাসায়নিক সঙ্কেত গ্লুকোজের মতো), ইক্ষুশর্করা (Cane sugar) বা সুক্রোজ (Sucrose ; রাসায়নিক সঙ্কেত—$C_{12}H_{22}O_{11}$) প্রভৃতি উদ্ভিদ-কোষের উল্লেখযোগ্য শর্করা। সালোকসংশ্লেষের সময় কোষে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। পরে ইহা হইতে অন্যান্য শর্করা এবং শ্বেতসার (Starch) তৈয়ারি হয়। প্রায় সমস্ত উদ্ভিদ-কোষের সাইটোপ্লাজ্‌মে কম-বেশি গ্লুকোজ থাকে। তবে আঙুর (১২%—১৫%), আপেল (৭%—১০%), কুল (৩%—৫%) ইত্যাদি ফলে এবং পিঁয়াজের শল্কপত্রে বেশি পরিমাণে গ্লুকোজ সঞ্চিত থাকে। আখের কাণ্ডে (১৫%—২০%) এবং বীটে (১০%—২০%) প্রচুর পরিমাণে সুক্রোজ থাকে। উদ্ভিদ-কোষে ম্যাল্‌টোজ (Maltose) নামক আর একধরনের শর্করা পাওয়া যায়। ইহার আণবিক সঙ্কেত সুক্রোজের মতো। অঙ্কুরোদ্গমের সময় উৎসেচকের সাহায্যে শ্বেতসার হইতে ম্যাল্‌টোজ উৎপন্ন হয়।

গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ বিজারক শর্করা (Reducing sugar)। ইহারা ফেলিং-এর দ্রবণ(Fehling's solution)-কে বিজারিত করে। সুক্রোজ এবং ম্যাল্টোজ ফেলিং-এর দ্রবণকে সরাসরি বিজারিত করে না। তবে সাল্ফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric acid) দিয়া উত্তপ্ত করিলে, ইহারা গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ আর্দ্র-বিশ্লেষিত (Hydrolysed) হইয়া যায়। তখন ঐ দ্রবণে ফেলিং-এর দ্রবণ দিলে, উহা বিজারিত হয়।

শ্বেতসার কণা (Starch grains)

শ্বেতসার বা স্টার্চ (Starch) ঠাণ্ডা জলে অদ্রাব্য, অপেক্ষাকৃত জটিল কার্বোহাইড্রেট। ইহার আণবিক সঙ্কেত $(C_6H_{10}O_5)n$। প্রকৃতপক্ষে, কতগুলি $C_6H_{10}O_5$ একক দিয়া শ্বেতসার গঠিত, তাহা ঠিক জানা যায় না। সেই কারণে n-এর মান অজ্ঞাত।

অধিকাংশ উদ্ভিদ-কোষের সাইটোপ্লাজ্মে দানা(Grain)-র মতো শ্বেতসার দেখা যায়। ছত্রাকের কোষে শ্বেতসার থাকে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে
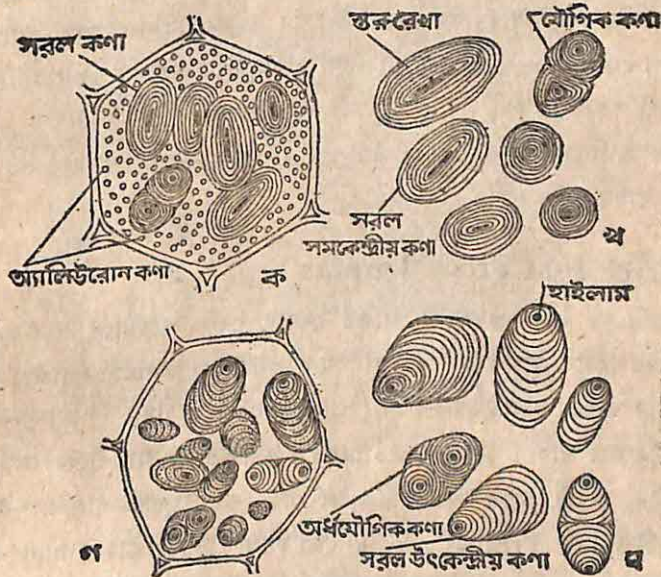
৪৬নং চিত্র—শ্বেতসার কণা : ক. মটরের বীজপত্রের কোষে শ্বেতসার কণা, খ. মটরের শ্বেতসার কণা, গ. গোল-আলুর স্ফীতকন্দের কোষে শ্বেতসার কণা, ঘ. গোল-আলুর শ্বেতসার কণা।

পরীক্ষা করিলে, প্রতিটি শ্বেতসার কণা(Starch grain)-য় সাধারণতঃ একটি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল এবং প্রতিসরণশীল (Refractive) বিন্দু দেখা যায়। ইহাকে **হাইলাম** (Hilum) বলা হয়। হাইলামকে ঘিরিয়া শ্বেতসার পদার্থ কয়েকটি

স্তরে সাজানো থাকে। ইহাদের **স্তর-রেখা** (Lines of stratifications) বলা হয়। হাইলাম শ্বেতসার কণার উৎপত্তি-বিন্দু। উহার চারদিকে কম ঘনত্ব-বিশিষ্ট (অর্থাৎ, বেশি জলযুক্ত) এবং বেশি ঘনত্ব-বিশিষ্ট (অর্থাৎ, কম জল-যুক্ত) শ্বেতসার পদার্থের স্তর ক্রমান্বয়ে সাজানো থাকে বলিয়া, উহাদের স্তরীভূত দেখায়। ভিতরের দিকে স্তরগুলিতে জলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি।

শ্বেতসার কণায় একটিমাত্র হাইলাম থাকিলে, তাহাকে **সরল** (Simple) শ্বেতসার কণা বলে। গোল-আলুতে হাইলাম শ্বেতসার কণার এক পাশে থাকে; ইহাকে **উৎকেন্দ্রীয়** (Eccentric) কণা বলে। আবার, গম, ভুট্টা, মটর ও অন্যান্য ডাল-জাতীয় বীজে কণার মাঝখানে হাইলাম থাকে। ইহাদের **সম-কেন্দ্রীয়** (Concentric) শ্বেতসার কণা বলা হয়। দুইটি অথবা তাহার বেশি শ্বেতসার কণা একসঙ্গে জুড়িয়া গেলে, সেইরকম কণাকে **যৌগিক** (Compound) কণা বলে। রাঙা-আলু, চাউল, যব এবং গোল-আলুতে যৌগিক কণা দেখা যায়। অনেক সময় দুইটি শ্বেতসার কণা জুড়িয়া যাওয়ার পর উহাদের ঘিরিয়া কয়েকটি সাধারণ স্তর-রেখা সৃষ্টি হয়। এইরকম কণাকে **অর্ধ-যৌগিক** (Semi-compound) কণা বলে। গোল-আলুর স্ফীতকন্দের কোষে এইরকম অর্ধ-যৌগিক কণা দেখা যায়।

আয়োডিনের দ্রবণ(Iodine solution)-এর সংস্পর্শে শ্বেতসার কণা নীল হইয়া যায়।

প্রোটিড কণা (Proteid grains)

উদ্ভিদের খাদ্য-সঞ্চয়কারী অঙ্গের কোষে বেশি পরিমাণে এবং বর্ধনশীল অঞ্চলের কোষে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে প্রোটীন (Proteins) পাওয়া যায়। প্রোটীন অন্যতম নাইট্রোজেন-ঘটিত (Nitrogenous) যৌগ। অল্প কিছু-সংখ্যক প্রোটীন জলে দ্রাব্য। ইহারা সাইটোপ্লাজ্‌মে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। অধিকাংশ প্রোটীন, অবশ্য, জলে অদ্রাব্য, জটিল এবং কণা হিসাবে থাকে। ইহাদের **প্রোটিড কণা** (Proteid grains) বলা হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদে নানা ধরনের প্রোটিড কণা পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে গমে গ্লিয়াডিন (Gliadin, আণবিক সঙ্কেত—$C_{685}H_{1068}N_{196}S_5$), ভুট্টায় জিইন (Zein, আণবিক সঙ্কেত—$C_{736}H_{1161}N_{174}O_{208}S_3$) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

খাদ্য-সঞ্চয়কারী কোষের সাইটোপ্লাজ্‌মে প্রোটিড কণার আকার বিশিষ্ট ধরনের। ইহাদের **অ্যালিউরোন কণা** (Aleurone grains) বলে। গম,

ভুট্টা ইত্যাদিতে যুক্ত ফলত্বক্ ও বীজত্বকের ঠিক ভিতরে, এক স্তর কোষের মধ্যে ছোট ছোট অ্যালিউরোন কণা বিন্যস্ত থাকে। এই কোষ-স্তরকে **অ্যালিউ-রোন স্তর** (Aleurone layer) বলা হয়। মটর, ছোলা এবং অন্যান্য ডাল-জাতীয় বীজের কোষে বড় বড় শ্বেতসার কণার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ছোট অ্যালিউ-রোন কণা পাশাপাশি থাকে। রেড়ি-বীজের সস্য-কোষে অ্যালিউরোন কণার গঠন বিশিষ্ট ধরনের। ইহারা আকারে গোল অথবা ডিম্বাকার। কণার ভূমিবস্তু (Ground substance) বা ধাত্র (Matrix) প্রোটীন দিয়া গঠিত। ধাত্রের মধ্যে **ক্রিস্‌টালয়েড** (Crystalloid) নামক একটি কেলাস এবং **গ্লোবয়েড** (Globoid) নামক একটি গোল অংশ থাকে। ক্রিস্‌টালয়েডটি প্রোটীন-নির্মিত
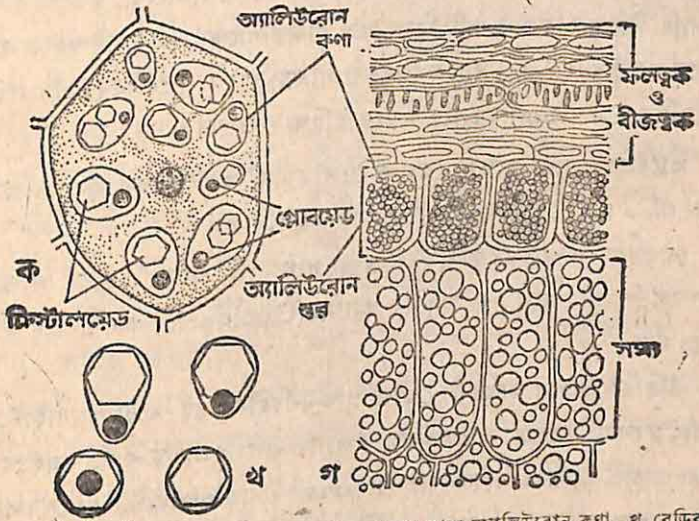
৪৭নং চিত্র—অ্যালিউরোন কণা : ক. রেড়ির সস্যের কোষে অ্যালিউরোন কণা, খ. রেড়ির বিভিন্ন রকম অ্যালিউরোন কণা, গ. গমের অ্যালিউরোন কণা।

এবং অ্যালিউরোন কণার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া থাকে। গ্লোবয়েডটি অপেক্ষাকৃত অল্প জায়গা অধিকার করে; ইহা ক্যাল্‌শিয়াম ও ম্যাগ্‌নেশিয়াম ফস্‌ফেট দিয়া গঠিত। প্রত্যেক অ্যালিউরোন কণায়, অবশ্য, একটি করিয়া ক্রিস্‌টালয়েড এবং গ্লোবয়েড না-ও থাকিতে পারে। কোনও কোনও কণায় কয়েকটি ক্রিস্‌টালয়েড থাকে, আবার কয়েকটি কণায় আদৌ গ্লোবয়েড থাকে না।

শ্বেতসার-প্রধান বীজের সাইটোপ্লাজ্‌মে প্রোটীনের পরিমাণ কম; যেমন—চাউলে মাত্র ৭% এবং গমে ১২% প্রোটীন থাকে। তৈল-প্রধান বীজের কোষে, অবশ্য, বেশি প্রোটীন পাওয়া যায়; যেমন—সূর্যমুখীর বীজে ৩০% প্রোটীন থাকে।

ডাল-জাতীয় বীজেও প্রচুর পরিমাণে প্রোটীন থাকে, সয়াবীনে ৪২%—৪৭% এবং অন্যান্য ডালে গড়ে প্রায় ২৫% প্রোটীন পাওয়া যায়।

আয়োডিন দ্রবণের সংস্পর্শে অ্যালিউরোন কণার ক্রিস্টালয়েড অংশ বাদামী হইয়া যায়।

স্নেহদ্রব্য ও তৈল (Fats and oils)

উদ্ভিদের প্রায় সমস্ত কোষের সাইটোপ্লাজ্‌মে স্নেহ ও তৈল ছোট ছোট বিন্দুর মতো ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত থাকে। স্নেহ ও তৈল জলে অদ্রাব্য। খাদ্য-সঞ্চয়কারী অঙ্গে, বিশেষতঃ তৈল-প্রধান বীজের কোষে, ভ্রূণ এবং ভাজক কলায় প্রচুর তৈল থাকে ; যেমন—রেড়ি ও নারিকেলের সস্যে, সরিষা, সূর্যমুখী, বাদাম ইত্যাদি বীজের বীজপত্রে অতিরিক্ত তৈল সঞ্চিত থাকে। জলপাই হইতে প্রাপ্ত তৈলে ওলেইন (Olein) নামক স্নেহদ্রব্য পাওয়া যায়। পামেটিন (Palmatin), লেসিথিন (Lecithin) ইত্যাদি অন্যান্য উদ্ভিজ্জ স্নেহদ্রব্য।

কার্বোহাইড্রেটের মতো, স্নেহ ও তৈল কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়া গঠিত। তবে এক্ষেত্রে অক্সিজেনের অনুপাত কম।

স্নেহদ্রব্য ও তৈল কাগজে ঈষদচ্ছ দাগ সৃষ্টি করে ; ইহারা আগুনের সংস্পর্শে শিখাসহ জলে এবং অস্‌মিক অ্যাসিড(Osmic acid)-এর প্রভাবে কালো হইয়া যায়।

উল্লিখিত প্রধান কয়েকটি প্রোটোপ্লাজ্‌ম-বিহীন বস্তুর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, অর্থাৎ গ্লুকোজ, সুক্রোজ, শ্বেতসার ইত্যাদি এবং প্রোটিড কণা, স্নেহদ্রব্য ও তৈল প্রভৃতি উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য (Reserve food materials)। শ্বেতসারের মতো রাসায়নিক গঠনযুক্ত, **গ্লাইকোজেন**(Glycogen)-ও একধরনের কার্বোহাইড্রেট। ইহা ছত্রাকের কোষে খাদ্যরূপে জমা থাকে।

নারিকেল, খেজুর, তাল ইত্যাদির সস্যের কোষে **হেমিসেলুলোজ** (Hemicellulose) নামক জলে অদ্রাব্য কার্বোহাইড্রেট জমা থাকে। ডালিয়া, হাতিচোখ ইত্যাদি উদ্ভিদের মূলের কোষে **ইন্যুলিন** (Inulin) নামক কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino acids), জৈব অম্ল (Organic acids), খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন (Vitamins), উৎসেচক বা এন্‌জাইম (Enzymes), অক্সিন (Auxins), জিব্রাইলিক অ্যাসিড (Gibberelic acid) ইত্যাদি হর্‌মোন (Hormones) প্রভৃতি উদ্ভিদ-কোষের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সঞ্চিত খাদ্য অথবা ক্ষরিত পদার্থ (Secretory materials)।

উদ্ভিদ-কোষে সিস্‌টোলিথ (Cystolith) ও র‍্যাফাইড (Raphide) নামে আরও দুই ধরনের অজীবীয় বস্তু দেখা যায়। ইহারা উদ্ভিদের বর্জ্য পদার্থ (Waste products)।

সিস্‌টোলিথ (Cystolith)

ইহারা উদ্ভিদে প্রাপ্য অন্যতম ধাতব কেলাস (Mineral crystal) এবং ক্যাল্‌শিয়াম কার্বোনেট (Calcium carbonate) দিয়া গঠিত। বট (*Ficus bengalensis*), রবার (*Ficus elastica*) প্রভৃতি উদ্ভিদের পত্রের বহুস্তর-যুক্ত ত্বক্‌ অর্থাৎ যৌগিক ত্বক্‌(Multiple epidermis)-এর ভিতরের দিকের স্তরে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বড় কোষ থাকে। এইসব কোষের মধ্যে **সিস্‌টোলিথ** (Cystolith ; গ্রীক *kystis*=থলি +*lithos*=পাথর)-এর কেলাস-গুলি আঙুর-গুচ্ছের মতো ঝুলিতে দেখা যায়। আঙুর গুচ্ছের বোঁটার মতো অংশটি বস্তুতঃপক্ষে কোষ-প্রাচীরের ভিতরের তল হইতে উৎপন্ন কীলক (Peg)-এর মতো (সেলুলোজ-নির্মিত) অংশ-বিশেষ। বট ও রবার ছাড়া, বাসক-গোত্র (Acanthaceae) এবং কুষ্মাণ্ড-গোত্র(Cucurbitaceae)-এর অনেক উদ্ভিদের কোষে সিস্‌টোলিথ পাওয়া যায়।
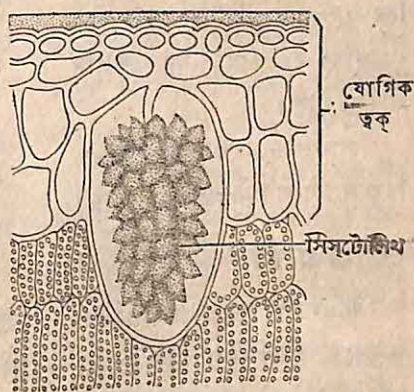
৪৮নং চিত্র—রবারের পত্রের কোষে সিস্‌টোলিথ।

লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড(Hydrochloric acid)-এর দ্রবণের সংস্পর্শে সিস্‌টোলিথের কেলাস দ্রবীভূত হইয়া যায়।

র‍্যাফাইড (Raphide)

র‍্যাফাইড (Raphide ; গ্রীক *raphis*=সূচ) ক্যাল্‌শিয়াম অক্সালেট (Calcium oxalate)-এর কেলাস। সবগুলি কেলাসের আকার একধরনের নয়। কতকগুলি কেলাস সরু সূচের মতো। ইহারা কোষের মধ্যে পাশাপাশি গুচ্ছাকারে থাকে। ইহাদের **অ্যাসিকিউলার র‍্যাফাইড** (Acicular raphide ; ল্যাটিন *acicula*=ছোট সূচ) বলে। কচু এবং কচুরিপানার পত্রের বৃন্তের কোষে এই ধরনের র‍্যাফাইড পাওয়া যায় (৪৯নং চিত্র)।

কচু এবং বড় পানার পত্রমূলের কোষে এবং অনেক সময় কচুরিপানার পত্রের বৃন্তে তারকার মতো একরকম র‍্যাফাইড কেলাস দেখা যায়। ইহাদের **স্ফিয়র‍্যাফাইড** (**Sphaeraphide**; গ্রীক *sphaira*=গোলক) বলা হয়।

৪৯নং চিত্র—কচুর বৃন্তের কোষে র‍্যাফাইড।

পিঁয়াজের শল্কপত্র(Scale leaves)-এ-ও বিভিন্ন আকারের ক্যাল্‌শিয়াম অক্সালেটের কেলাস পাওয়া যায়।

র‍্যাফাইড-ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হইয়া যায়।
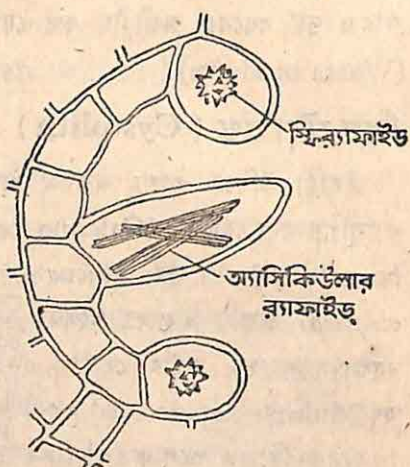
কোষ-প্রাচীর (Cell wall)

উদ্ভিদ-কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মের চারদিকে যে নির্দিষ্ট জড় আবরণ থাকে, তাহাকে **কোষ-প্রাচীর** (**Cell wall**) বলা হয়। মিক্সোমাইসিটিস-জাতীয় ছত্রাক এবং জনন-কোষ (Reproductive cells) ছাড়া, সমস্ত কোষেই প্রাচীর থাকে। ইহা সাধারণতঃ শক্ত ও পুরু। কোষ-প্রাচীর প্রোটোপ্লাজ্‌মকে সম্ভাব্য আঘাত অথবা প্রতিকূল অবস্থা হইতে রক্ষা করে, কোষকে নির্দিষ্ট আকার দেয়, কোষের কাঠামোর কাজ করে এবং পাশাপাশি অবস্থিত কোষগুলি হইতে কোষটিকে আলাদা রাখে।

প্রোটোপ্লাজ্‌মের আভ্যন্তরীণ বিপাকের ফলে কোষ-প্রাচীর সৃষ্টি হয়। নিউক্লিয়াস-বিভাজনের টেলোফেজ দশায় (চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) স্পিন্‌ড্‌লের বিষুবতল-বরাবর দানার মতো কোষ-প্রাচীর পদার্থ জমিতে থাকে এবং একটি পাত গঠন করে। ইহাকে **কোষভাগ-প্রাকার** (**Cell plate**) বলে। পাতটি পরিধি-বরাবর ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং শেষে মাতৃ-কোষ-প্রাচীরের সঙ্গে জুড়িয়া যায়। ইহার উপর ক্রমাগত ক্যাল্‌শিয়াম পেক্‌টেট (Calcium pectate) নামক যৌগ সমানভাবে জমা হইতে থাকে ; ফলে, **মধ্যপর্দা** বা **মিড্‌ল ল্যামেলা**(**Middle lamella**)-র সৃষ্টি হয়। ক্যাল্‌শিয়াম পেক্‌টেট অনেকটা সিমেণ্টের মতো কাজ করে ; অর্থাৎ, ইহা পাশাপাশি অবস্থিত কোষগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখে। ইহার পর, মধ্যপর্দার ভিতরের তলে

সেলুলোজ (Cellulose) ও পেক্‌টিন(Pectin)-এর, এবং সবশেষে শুধু সেলু-লোজের স্তর জমা হয়। ফলে, **প্রাথমিক প্রাচীর** (**Primary wall**) গঠিত হয়। প্রাথমিক প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং স্থিতিস্থাপক (Elastic)।

কোষের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ কোষ-প্রাচীরের উপর নানারকম উপাদান সংযোজিত হয়। ফলে, কোষ-প্রাচীর ভিতরের দিকে স্থূল হইতে থাকে। এইভাবে **গৌণ প্রাচীর** (**Secondary wall**) গঠিত হয়। অবশ্য, সবসময়ই এই উপাদানগুলি সংযোজিত হয় না; যেমন—প্যারেন্‌কাইমা কোষের প্রাচীর শুধু সেলুলোজ দিয়া গঠিত।

দুইটি পদ্ধতিতে কোষ-প্রাচীর উপাদানগুলি প্রাথমিক প্রাচীরে সংযোজিত হয়। অতএব, কোষ-প্রাচীরে দুই ধরনের বৃদ্ধি দেখা যায়। যেমন—**পৃষ্ঠবৃদ্ধি** বা **ইন্‌টুস্‌সাসেপ্‌শান** (**Intussusception** ; ল্যাটিন *intus* = ভিতরে + *suscipere* = গ্রহণ করা)—এক্ষেত্রে প্রাথমিক কোষ-প্রাচীরের ভিতরে ক্রমাগত নূতন কোষ-প্রাচীর উপাদান নিবেশিত (Intercalated) হয়; এবং **স্থূলত্ব-বৃদ্ধি** বা **অ্যাপোজীশান** (**Apposition** ; ল্যাটিন *ad* = তে + *ponere* = রাখা)—এক্ষেত্রে প্রাচীরের উপর কোষ-প্রাচীর উপাদান স্তরে স্তরে জমা হয়।

নিচে বিভিন্ন রকম কোষ-প্রাচীরের উপাদান আলোচনা করা হইল।

(ক) **পেক্‌টিন** (**Pectin**)—পেক্‌টিন একধরনের জটিল কার্বোহাইড্রেট। ইহা ক্যাল্‌শিয়ামের সঙ্গে ক্যাল্‌শিয়াম পেক্‌টেট (Calcium pectate) যৌগরূপে মধ্যপর্দা গঠন করে। জলের সংস্পর্শে ক্যাল্‌শিয়াম পেক্‌টেট জেলির মতো আঠালো হইয়া যায়। সেইজন্য ইহা সিমেন্টের মতো দুইটি কোষকে যুক্ত রাখে।

(খ) **সেলুলোজ** (**Cellulose**)—সেলুলোজ জলে অদ্রাব্য জটিল কার্বো-হাইড্রেট এবং একাধিক গ্লুকোজ একক দিয়া গঠিত। ইহার রাসায়নিক সঙ্কেত $(C_6H_{10}O_5)n$। ইহা প্রাথমিক প্রাচীরের অপরিহার্য উপাদান। প্যারেন্‌কাইমা ও কোলেন্‌কাইমা (পরে আলোচ্য) কোষেরও প্রাচীর সেলুলোজ দিয়া গঠিত। অনেক সময় সেলুলোজ, লিগ্‌নিনে রূপান্তরিত হইতে পারে। সেলুলোজ-গঠিত প্রাচীর স্থিতিস্থাপক।

(গ) **লিগ্‌নিন** (**Lignin**)—লিগ্‌নিন একধরনের জটিল জৈব পদার্থ। ইহার রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না। ইহা গৌণ প্রাচীরের প্রধান উপাদান। কোষ-প্রাচীরের উপর লিগ্‌নিন জমা হইলে, কোষের **লিগ্‌নি-ভবন** বা **লিগ্‌নিফিকেশান** (**Lignification**) বলা হয়। লিগ্‌নিন-যুক্ত প্রাচীর স্থিতিস্থাপক নয় বলিয়া, ইহা কোষকে ঋজু রাখে। স্ক্লেরেন্‌কাইমা ও স্ক্লেরাইড

কোষে, জাইলেম কলার ট্রাকিড, ট্রাকীয়া এবং কাষ্ঠল তন্তু কোষের, ফ্লোয়েম কলার বাস্ট-তন্তু কোষের গৌণ প্রাচীর প্রধানতঃ লিগ্‌নিন দিয়া গঠিত। পরিণত লিগ্‌নিন-যুক্ত কোষ মৃত। এই ধরনের কোষ প্রধানতঃ খাদ্য-সংবহন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজ, এবং উদ্ভিদের দৈহিক শক্তি দান করে।

কোষ-প্রাচীরে লিগ্‌নিন সব জায়গায় সমানভাবে জমা হয় না; ফলে, কোনও অংশ বেশি পুরু হয়, আবার কোনও অংশ পাতলা থাকিয়া যায়। কোষ-প্রাচীরে বিভিন্ন ধরনের লিগ্‌নি-ভবন দেখা যায়। যেমন—

(১) **বলয়াকার** বা **অ্যান্নুলার** (**Annular**; ল্যাটিন *annulus* = আংটি)—এক্ষেত্রে প্রাচীরে আংটির মতো, একটির কিছু উপরে আর একটি স্তর জমা হয়।

(২) **সর্পিলাকার** বা **স্পাইরাল** (**Spiral**; ল্যাটিন *spira* = পাকানো) —লিগ্‌নিনের স্তর প্যাচানো ফিতার মতো কোষ-প্রাচীরের উপর জমা হয়।
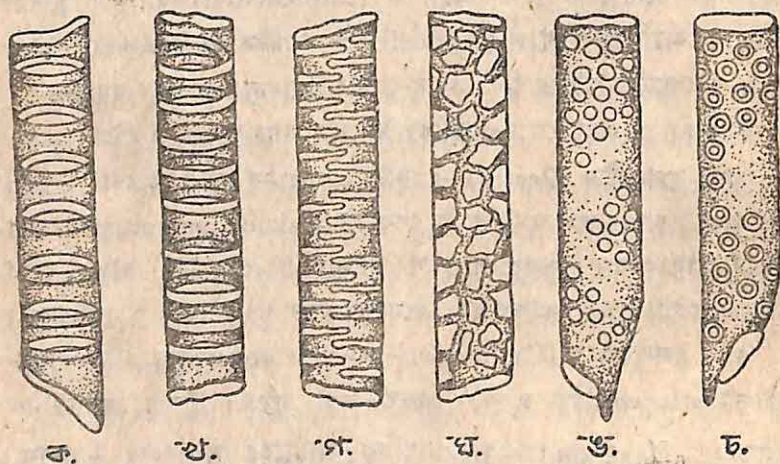
৫০নং চিত্র—কোষ-প্রাচীরের স্থূলীকরণ: ক. বলয়াকার, খ. সর্পিলাকার, গ. সোপানাকার, ঘ. জালকাকার, ঙ. সাধারণ কূপ-যুক্ত, চ. সপাড় কূপ-যুক্ত।

(৩) **সোপানাকার** বা **স্ক্যালারিফর্ম** (**Scalariform**; ল্যাটিন *scala* = সিঁড়ি + *forma* = আকার)—এই ধরনের স্থূলীকরণে প্রাচীরের উপর লিগ্‌নিনের স্তর এমনভাবে জমা হয়, যাহাতে পুরু অংশগুলি সিঁড়ির ধাপের মতো দেখায়।

(৪) **জালকাকার** বা **রেটিকুলেট** (**Reticulate**; ল্যাটিন *reticulatus* = জাফ্‌রি-কাটা)—এক্ষেত্রে জালিকার মতো লিগ্‌নি-ভবন দেখা যায়।

(৫) **কূপযুক্ত** বা **পিটেড** (Pitted)—এক্ষেত্রে কোষ-প্রাচীরের সব অংশেই সমানভাবে লিগ্‌নি-ভবন হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু অংশে একেবারেই স্থূলীকরণ হয় না। ফলে, এই স্থানগুলি ছোট ছোট গর্তের মতো দেখায়। গর্তগুলিকে **কূপ** বা **পিট** (Pit) বলে। মধ্যপর্দার এক পাশে কূপ গঠিত হইলে, উহার বিপরীত দিকের কোষ-প্রাচীরেও ঐরকম কূপ সৃষ্টি হয়। এইরকম দুইটি কূপের মধ্যবর্তী মধ্যপর্দাকে **সমাপন-ঝিল্লী** (Closing membrane) বলে। দুই ধরনের কূপ দেখা যায়। যেমন—

৫১নং চিত্র—সাধারণ কূপ: ক. আংশিক প্রস্থ-দৃশ্য, খ. আংশিক ত্রি-আয়তনিক দৃশ্য।

(অ) **সাধারণ কূপ** (Simple pit)—অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই ধরনের কূপকে গোলাকার দেখায়। প্রাচীরের শুরু হইতে মধ্যপর্দা (সমাপন-ঝিল্লী) পর্যন্ত সাধারণ কূপের ব্যাস সমান থাকে।

(আ) **সপাড় কূপ** (Bordered pit)—অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই ধরনের কূপকে বৃত্ত দিয়া পরিবেষ্টিত সাধারণ কূপের মতো দেখায়। ইহারা সাধারণ কূপের মতো উৎপন্ন হয়। ক্রমে স্থূলীকরণের উপাদান জমা হইতে থাকিলে, কূপের পাড় ঝুঁকিয়া যায়। কূপটিকে তখন উল্টা ফানেলের মতো দেখায়।
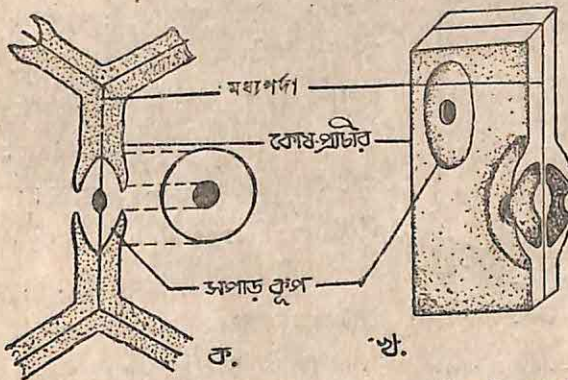
৫২নং চিত্র—সপাড় কূপ: ক. আংশিক প্রস্থ-দৃশ্য, খ. আংশিক ত্রি-আয়তনিক দৃশ্য।

এস্থলে কূপের ব্যাস ভিতর হইতে বাহিরের মুখের দিকে ক্রমাগত ছোট হইয়া আসে। সপাড় কূপের মধ্যপর্দা অল্প স্ফীত হয়। মধ্যপর্দার এই স্ফীত অংশকে **টোরাস** (Torus ; ল্যাটিন *torus* = স্ফীত) বলে।

(ঘ) **সুবারিন** (Suberin)—সুবারিন মোমের মতো, স্নেহ-জাতীয় পদার্থ। কোষ-প্রাচীরে সুবারিন জমা হওয়াকে **সুবারি-ভবন** বা **সুবারাইজেশান** (Suberization) বলা হয়। সুবারিন-যুক্ত কোষ-প্রাচীরের মধ্য দিয়া জল অথবা গ্যাস যাতায়াত করিতে পারে না। কর্ক (Cork) কলার কোষে, অন্তস্ত্বকের ক্যাস্‌পেরিয়ান পটি(পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)-তে প্রচুর পরিমাণে সুবারিন জমা হয়।

(ঙ) **কিউটিন** (Cutin)—সুবারিনের মতো, কিউটিন-ও একধরনের স্নেহ-দ্রব্য-জাতীয় পদার্থ—অনেকটা মোমের মতো। কোষ-প্রাচীরে কিউটিন জমা হওয়াকে **কিউটিন-পরিণতি** বা **কিউটিনাইজেশান** (Cutinization) বলে। কাণ্ড এবং পত্রের ত্বকে কিউটিন-পরিণতি হয়। পত্রের ত্বকে কিউটিনের উপর মোম(Wax)-এর পুরু আবরণ থাকে। ইহাকে **কিউটিকূল** (Cuticle) বলে। কিউটিন-যুক্ত কোষ-প্রাচীরের মধ্য দিয়াও জল অথবা গ্যাস যাতায়াত করিতে পারে না।

উপরে বর্ণিত পদার্থ ছাড়া, আরও কয়েকটি পদার্থ জমা হওয়ায়, কোষ-প্রাচীর স্থূল হয়। যেমন—অনেক কোষের প্রাচীরে **মিউসিলেজ** (Mucilage) নামক আঠার মতো চট্‌চটে পদার্থ জমা থাকে। শুষ্ক অবস্থায় মিউসিলেজ কঠিন, কিন্তু জলের সংস্পর্শে আসিলে, জল শোষণ করিয়া স্ফীত ও আঠালো হয়। তোকমারি, ইসব্‌গুল ইত্যাদি বীজের ত্বকে মিউসিলেজ থাকে। জৈব পদার্থ ছাড়াও, কতকগুলি উদ্ভিদের কোষ-প্রাচীরে বিভিন্ন ধরনের **ধাতব কেলাস** (Mineral crystals) জমা হয়। ইহাদের মধ্যে সিলিকা(Silica) এবং ক্যাল্‌শিয়াম কার্বোনেট উল্লেখযোগ্য। ধান, গম প্রভৃতি অধিকাংশ তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদের পত্রের ত্বকে সিলিকার আবরণ থাকে।
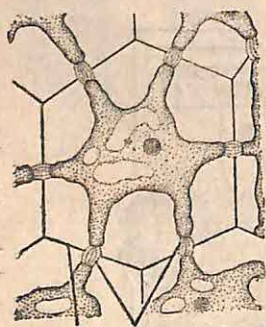
৫৩নং চিত্র—খেজুরের সস্থে প্লাজ্‌মোডেস্‌মাটা।

সজীব কোষ প্রতিবেশী কোষের সঙ্গে সুতার মতো সরু প্রোটোপ্লাজ্‌মের অংশ দিয়া যুক্ত থাকে। কোষ-প্রাচীর এবং মধ্যপর্দার কতকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্র

দিয়া প্রোটোপ্লাজ্‌মের অংশগুলি পাশাপাশি কোষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। ইহাদের প্লাজ্‌মোডেস্‌মাটা* (Plasmodesmata ; গ্রীক *plasma* =আকার+*desma*=বন্ধন) বলা হয়। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সাধারণতঃ ইহাদের দেখা যায় না।

অনুশীলনী

১। আদর্শ সজীব কোষ এবং উহার মধ্যস্থ বস্তুগুলির বিবরণ দাও। নিউক্লিয়াস ও প্লাস্টিডের কাজ কি? [H. S. 1968]

Describe a typical living cell and its contents. What are the functions of nucleus and plastids ?

২। সজীব কোষ অঙ্কন করিয়া উহার মধ্যস্থ বস্তুগুলি নির্দেশ কর। কোষ-মধ্যস্থ বস্তুগুলির প্রত্যেকটির কাজ লেখ। কোষের মধ্যে কেবল সাময়িকভাবে জমা হয়, এমন কয়েকটি বস্তুর উল্লেখ কর। [H. S. 1967 (Comp.) ; *cp.* 1970 (Comp.), 1969 (Comp.)]

Draw a living cell and mention its cell contents. State the functions of each of these cell contents. Mention a few inclusions of a cell which are accumulated only temporarily in the cell.

৩। প্রোটোপ্লাজ্‌ম কাহাকে বলে? ইহার বিভিন্ন কার্যকারিতা বর্ণনা কর। [H. S. 1968 (Comp.)]

What is protoplasm ? Describe the functions of protoplasm.

৪। উদ্ভিদ-কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌ম-বস্তুগুলি অঙ্কন করিয়া চিহ্নিত কর। সংক্ষেপে উহাদের কাজ উল্লেখ কর। উল্লিখিত সব বস্তুগুলিই কি উদ্ভিদ-দেহের প্রত্যেকটি কোষে থাকে? [H. S. 1964 (Comp.) ; *cp.* 1966, 1962]

Draw and label the protoplasmic contents of a plant cell. Mention briefly their functions. Are the contents, you mention, present in each cell in a plant body ?

৫। নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশ অঙ্কন করিয়া চিহ্নিত কর। নিউক্লিয়াসের গুরুত্ব কি? ইহা কি উদ্ভিদের সমস্ত কোষেই থাকে? [H. S. 1965 (Comp.)]

Draw and label the different parts of a nucleus. What is the importance of nucleus ? Is it present in all the cells of a plant ?

৬। নিউক্লিয়াসের প্রাপ্তিস্থান, গঠন এবং কাজ সম্বন্ধে যাহা জান, লেখ। [H. S. 1963]

Write what you know about the place of occurrence, structure and function of nucleus.

৭। প্লাস্টিডের প্রকারভেদ, প্রাপ্তিস্থান এবং কাজ সম্বন্ধে যাহা জান, লেখ। [H. S. 1963 (Comp.) ; *cp.* 1965]

Write what you know about the types, places of occurrence and functions of plastids.

---

* বহুবচন ; প্লাজ্‌মোডেস্‌মা (Plasmodesma) — একবচন।

৮। ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন, প্রাপ্তিস্থান এবং কাজ সম্বন্ধে যাহা জান, লেখ। উদ্ভিদ-দেহের যেসব অংশে ক্লোরোপ্লাস্ট অনুপস্থিত, তাহাদের নাম কর। ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না, এমন একটি উদ্ভিদের নাম কর। [H. S. 1964 ; *cp*. 1966 (Comp.)]

Write what you know about the structure, place of occurrence and function of chloroplasts. Name the parts of a plant body where they are absent. Name a plant in which they are absent.

৯। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) প্রোটোপ্লাজ্‌মের চলন [H. S. 1966 (Comp.), 1961] ; (খ) কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজ্‌মের চলন [H. S. 1964 (Comp.), 1964] ; (গ) প্রোটোপ্লাজ্‌মের একমুখী আবর্তন [H. S. 1963 (Comp.)] ; (ঘ) প্রোটোপ্লাজ্‌মের বহুমুখী আবর্তন [H. S. 1963] ; (ঙ) সাইটোপ্লাজ্‌ম [H. S. 1961 (Comp.)] ; (চ) নিউক্লিয়াস [H. S. 1971 (Comp.), 1966 (Comp.) ; *cp*. 1967] ; (ছ) লিউকোপ্লাসট ; (জ) ক্রোমোপ্লাস্ট ; (ঝ) ক্লোরোপ্লাস্ট [H. S. 1965 (Comp.)] ; (ঞ) ক্লোরোফিল [H. S. 1967 (Comp.), 1961 (Comp.)] ; (ট) ভ্যাকুওল ; (ঠ) শ্বেতসার কণা [H. S. 1969 (Comp.), 1968, 1966, 1963 ; *cp*. 1971, 1960] ; (ড) প্রোটীন কণা [H. S. 1963 (Comp.); *cp*. 1960] ; (ঢ) অ্যালিউরোন কণা [H. S. 1971 (Comp.), 1968 (Comp.), 1966 (Comp.)] ; (ণ) সিস্টোলিথ [H. S. 1965, 1964 (Comp) ; *cp*. 1967, 1960] ; (ত) র‍্যাফাইড [H. S. 1967 (Comp.), 1965 (Comp.), 1962 ; *cp*. 1960] ; (থ) কোষ-প্রাচীর [H. S. 1968 (Comp.), 1967 (Comp.)] ; (দ) সেলুলোজ [H. S. 1965, 1963, 1962 (Comp.), 1961] ; (ধ) লিগ্‌নিন [H. S. 1963 (Comp.), 1962]।

Write short notes on :—

(*a*) Movements of protoplasm ; (*b*) Movements of protoplasm inside a cell ; (*c*) Rotation of protoplasm ; (*d*) Circulation of protoplasm ; (*e*) Cytoplasm ; (*f*) Nucleus ; (*g*) Leucoplasts ; (*h*) Chromoplasts ; (*i*) Chloroplasts ; (*j*) Chlorophyll ; (*k*) Vacuole ; (*l*) Starch grains ; (*m*) Protein grains ; (*n*) Aleurone grains ; (*o*) Cystolith ; (*p*) Raphide ; (*q*) Cell wall ; (*r*) Cellulose ; (*s*) Lignin.

একক্কের সংখ্যা-বৃদ্ধি
(Increase in the number of unit)

8

আগের পরিচ্ছেদে কোষ বা জীবনের একক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। একটিমাত্র কোষ বা একক হইতেই এককোষী অথবা বহু-কোষী উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর জীবনের সূত্রপাত হয়। এককোষী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় একটি পরিণত কোষ বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষ গঠন করে। এক্ষেত্রে পরিণত কোষকে **মাতৃ-কোষ** (**Mother cell**) এবং উৎপন্ন কোষ দুইটিকে **অপত্য কোষ** (**Daughter cells**) বলা হয়। অপত্য কোষ ক্রমে আয়তনে বাড়িতে থাকে এবং পরিণত হইলে যথাসময়ে একইভাবে অপত্য কোষ সৃষ্ট করে। যে প্রক্রিয়ায় মাতৃ-কোষ বিভাজিত হইয়া দুইটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে, তাহাকে **কোষ-বিভাজন** (**Cell division**) বলা হয়।

কয়েক ধরনের শেওলার ক্ষেত্রে (যেমন—স্পাইরোগাইরা) দুইটি একই আকৃতির পরিণত কোষ প্রথমে পাশাপাশি অবস্থান করে। পরে কোষ দুইটি হইতে পরস্পরের দিকে নলের মতো উপবৃদ্ধি বাহির হয়। ইহাদের **সংশ্লেষ-নলিকা** বা **কন্‌জুগেশান টিউব** (**Conjugation tube**) বলে। সংশ্লেষ-
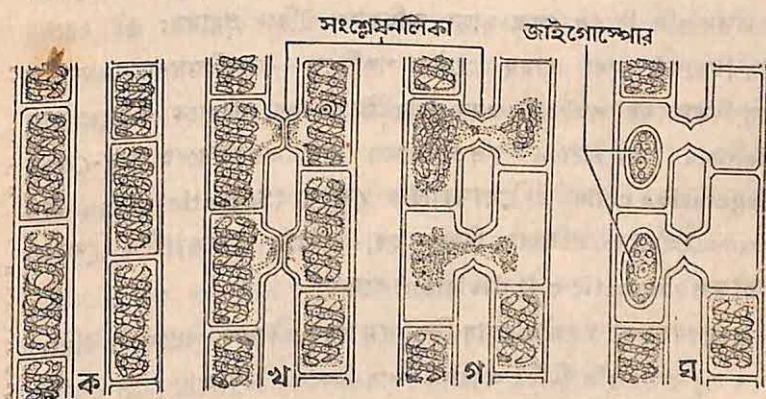
৫৪নং চিত্র—ক. হইতে ঘ. সংশ্লেষ(স্পাইরোগাইরা)-এর বিভিন্ন দশা।

নলিকা দুইটি পরস্পর যুক্ত হইয়া যায় এবং শেষে ইহাদের যুক্ত প্রাচীর বিলুপ্ত হয়; ফলে, একটি পথ সৃষ্টি হয়। ঐ পথ দিয়া একটি কোষের প্রোটো-প্লাজ্‌ম অন্য কোষে প্রবেশ করিয়া, সেই কোষের প্রোটোপ্লাজমের সঙ্গে মিলিত হয়। মিলিত কোষটিকে **জাইগোস্পোর** (Zygospore) বলে। জাইগো-

স্পোর ইহার পর বিভক্ত হইতে থাকে এবং নূতন স্পাইরোগাইরা সৃষ্টি করে। এই ধরনের জননকে **সংশ্লেষ** বা **কন্‌জুগেশান** (Conjugation ; ল্যাটিন *conjugare*=একত্রে যুক্ত) বলা হয়।

উন্নততর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, জননের জন্য **জনন-কোষ** (Reproductive cells) বা **জার্‌ম সেল** (Germ cells) উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে দুই ধরনের জনন-কোষ দেখা যায়। কতকগুলি কোষ আকারে ছোট এবং সচল (Motile)। ইহাদের **পুং-জনন-কোষ** (Male reproductive cells) বলে। অপেক্ষাকৃত বড় ও স্থির জনন-কোষকে **স্ত্রী-জনন-কোষ** (Female reproductive cells) বলে। উভয় জনন-কোষ মিলিত হইয়া **ভ্রূণাণু** বা **জাইগোট** (Zygote) গঠন করে। এই ধরনের জনন-কোষের মিলনকে **নিষেক, গর্ভাধান** (Fertilisation) বা **সিন্‌গ্যামী** (Syngamy ; গ্রীক *syn*=যুক্ত+*gamos*=বিবাহ) বলা হয়। নিষিক্ত কোষ বা জাইগোট ক্রমাগত বিভক্ত হইতে থাকে এবং শেষে কোষগুলি কার্যগতভাবে পৃথক হইয়া ভ্রূণ (Embryo) তথা শিশু-উদ্ভিদ গঠন করে।

উপরের আলোচনায় জনন এবং কোষ-বিভাজনের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখা যায়। জননের ফলে বংশধরের সূচনা হয় এবং কোষ-বিভাজনের ফলে বংশধরের বৃদ্ধি ও পরিণতি হয়।

কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া, অধিকাংশ উদ্ভিদে প্রধানতঃ দুই ধরনের কোষ-বিভাজন দেখা যায়। যৌন পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তারের সময় যে কোষ-বিভাজনের পদ্ধতিতে জনন-কোষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে **মা'য়োসিস** (Meiosis ; গ্রীক *meion*=ক্ষুদ্রতর) বলে। বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদের **দেহ-কোষ** (Vegetative cells) বা **সোম্যাটিক কোষ** (Somatic cells ; গ্রীক *soma*=দেহ) যে প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়, তাহাকে **সোম্যাটিক কোষ-বিভাজন** (Somatic cell division) বলে।

সাধারণতঃ সমস্ত সজীব কোষ বিভাজনে সক্ষম হইলেও, বহুকোষী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শুধু কতকগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই কোষ-বিভাজন দেখা যায়। ব্রা'ওফাইটা, টেরিডোফাইটা ইত্যাদি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে স্পোর-সৃষ্টি(Spore formation)-র সময়, সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পরাগরেণু (Pollen grain) অথবা ভ্রূণস্থলী (Embryo sac) উৎপত্তির সময় মা'য়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ-বিভাজন হয়। আবার বর্ধনশীল অঞ্চলে, অর্থাৎ কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগে, কিংবা মুকুল-বিকাশের সময়, অথবা দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পরিধি-বৃদ্ধির সময়, সোম্যাটিক কোষ-বিভাজন

দেখা যায়। অন্যান্য অঞ্চলের কোষ সচরাচর বিভক্ত হয় না। তবে কোনও কারণে ক্ষত সৃষ্টি হইলে, ঐ অঞ্চলের কোষে সোম্যাটিক বিভাজন হয়।

বিভাজনের সময়, কোষের নিউক্লিয়াস আগে এবং সাইটোপ্লাজ্‌ম পরে বিভক্ত হয়। কোষ-বিভাজনে নিউক্লিয়াসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া **মাতৃ-নিউক্লিয়াস** (**Mother nucleus**) হইতে তুইটি **অপত্য নিউক্লিয়াস** (**Daughter nuclei**) সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি অবস্থাকে **ফেজ** (**Phase**) বা **দশা** বলে। বিভিন্ন ফেজে নিউক্লিয়াস এবং সংশ্লিষ্ট অংশ-গুলির, বিশেষতঃ ক্রোমোজোমের, আকৃতিগত (Morphological), ভৌত (Physical) এবং রাসায়নিক (Chemical) জটিল পরিবর্তন হয়।

নিচে বিশদভাবে সোম্যাটিক কোষ-বিভাজন এবং সংক্ষেপে আরও কয়েক ধরনের কোষ-বিভাজন আলোচনা করা হইল।

সোম্যাটিক কোষ-বিভাজন
(Somatic cell division)

সোম্যাটিক কোষ-বিভাজনকে প্রধান তুইটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে শুধু নিউক্লিয়াস বিভক্ত হইয়া তুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে। এই প্রক্রিয়াকে **মাইটোসিস** (**Mitosis** ; গ্রীক *mitos* = সুতা) বা **ক্যারিও-কাইনেসিস** (**Karyokinesis** ; গ্রীক *karyon* = নিউক্লিয়াস + *kinesis* = চলন) বলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সাইটোপ্লাজ্‌ম এক-একটি অপত্য নিউক্লিয়াস-সহ তুইটি সমান অংশে বিভক্ত হয়। সাইটোপ্লাজ্‌মের বিভাজনকে **সাইটো-কাইনেসিস** (**Cytokinesis** ; গ্রীক *kytos* = ফাঁপা + *kinesis* = চলন) বলা হয়। অনেক সময় সোম্যাটিক কোষ-বিভাজন এবং মাইটোসিস একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, মাইটোসিস বলিতে কেবলমাত্র নিউক্লিয়াস-বিভাজন বোঝায়, সমগ্র কোষ-বিভাজন বোঝায় না। মাইটোসিসের সময় নিউক্লিয়াস নানা জটিল অবস্থার মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে তুই ভাগে বিভক্ত হয় বলিয়া, ইহাকে **পরোক্ষ নিউক্লিয়াস-বিভাজন**(**Indirect nuclear division**)-ও বলা হয়। নিচে পর্যায় তুইটি পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

মাইটোসিস (Mitosis)

সমগ্র নিউক্লিয়াস-বিভাজন-প্রক্রিয়া চারটি প্রধান ফেজে বিভক্ত। ফেজ-গুলি যথাক্রমে—(১) **প্রোফেজ** (**Prophase** ; গ্রীক *pro* = প্রথম + *phasis* = আকার), (২) **মেটাফেজ** (**Metaphase** ; গ্রীক *meta* = মধ্যবর্তী), (৩)

অ্যানাফেজ (**Anaphase** ; গ্রীক *ana*=উপরে) এবং (৪) **টেলোফেজ** (**Telophase** ; গ্রীক *telos*=শেষ)।

নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ঠিক আগের অবস্থাকে সাধারণতঃ **ইন্টার্ফেজ** (**Interphase**) বলা হয়। ইন্টার্ফেজের নিউক্লিয়সকে **স্থির নিউক্লিয়াস**(**Resting nucleus**)-ও বলা হয়। এই নামকরণের সঙ্গে, অবশ্য, নিউক্লিয়াসের কাজের কোনও সামঞ্জস্য নাই। প্রকৃতপক্ষে, স্থির নিউক্লিয়াসের বিপাকের হার বাড়িয়া যায়। সুতরাং, ইহাকে **মেটাবলিক নিউক্লিয়াস** (**Metabolic nucleus**) বলাই যুক্তিযুক্ত। অতিরিক্ত জল-শোষণের ফলে এই সময় নিউক্লিয়াসটি আয়তনে বাড়িয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে নিউক্লিয়াস-বিভাজনের বিভিন্ন দশা এবং ক্রোমোজোমের পরিবর্তন দেখিতে হইলে, ইহাদের বিশেষ পদ্ধতিতে রঙ করা প্রয়োজন—নচেৎ দেখা যায় না। অর্সিন (Orcein), কার্মিন (Carmine) প্রভৃতি রঙ্গক পদার্থ দিয়া ক্রোমোজোম রঙ করা হয়। অবশ্য, রঙ করিলেও ইন্টার্ফেজের নিউক্লিয়াসে সাধারণতঃ ক্রোমোজোম দেখা যায় না।

নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোজোমগুলি এই সময় বিশৃঙ্খলভাবে গুটানো উলের গোলার মতো থাকে। নিউক্লিয়াস অতিরিক্ত জল-সংপৃক্ত (Hydrated) থাকায়, ক্রোমোজোমে কোনও রঙ ধরে না।

নিচে মাইটোসিসের বিভিন্ন ফেজগুলি ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করা হইল।

প্রোফেজ (Prophase)

প্রোফেজের শুরুতে কোষটি বর্তুলাকার ধারণ করে ও ইহার রসস্ফীতি-চাপ (Turgour pressure) বাড়ে এবং নিউক্লিয়াসের জল-বিয়োজন (Dehydration) হইতে শুরু করে। রঙ করিলে, এই সময় হইতে নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুতার মতো, সর্পিলাকার ক্রোমোজোম দেখা যায়। ক্রোমোজোমগুলি দৈর্ঘ্য-বরাবর লম্বালম্বি দুই ভাগে বিভক্ত থাকে। প্রত্যেকটি ভাগকে **ক্রোম্যাটিড** (**Chromatid** ; গ্রীক *chroma*=রঙিন) বলে।

ঠিক কোন অবস্থায় ক্রোমোজোম দুই ভাগে বিভক্ত হয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকের মতে, ইন্টার্ফেজেই ইহারা বিভক্ত অবস্থায় থাকে। আবার, কাহারও মতে, প্রোফেজের শুরুতেই ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

পরস্পর দড়ির মতো পাকানো থাকায়, প্রোফেজের প্রাথমিক অবস্থায় ক্রোম্যাটিড দুইটি সহজে দেখা যায় না। একটি অঞ্চলে ক্রোম্যাটিড দুইটি যুক্ত

থাকে। এই অঞ্চলকে **সেন্ট্রোমিয়ার** (**Centromere** ; গ্রীক *kentron*= বিন্দু+*meros*=অংশ) বা **কাইনেটোকোর** (**Kinetochore** ; গ্রীক *kinein*=বিচরণ করা+*choros*=স্থান) বলে। সেন্ট্রোমিয়ার অংশে কোনও রঙ ধরে না এবং এই অংশে, ক্রোমোজোমে একটি খাঁজ সৃষ্টি হয়। সেইজন্য এই
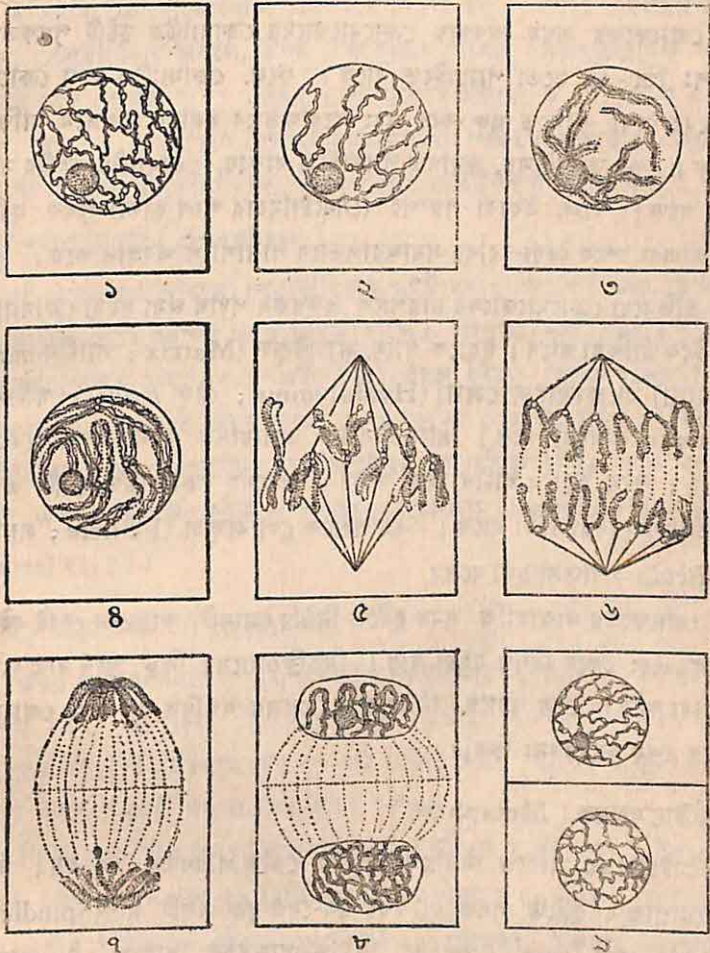
৫৫নং চিত্র—সোম্যাটিক কোষ-বিভাজন (মাইটোসিস ও সাইটোকাইনেসিস): ১. ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াস, ২.—৪. প্রোফেজ, ৫. মেটাফেজ, ৬. অ্যানাফেজ, ৭.—৮. টেলোফেজ, ৯. সাইটোকাইনেসিস।

অঞ্চলটিকে **প্রাথমিক খাঁজ**(**Primary constriction**)-ও বলে। একই প্রজাতির জীবের ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান নির্দিষ্ট।

সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী, তিন রকমের ক্রোমোজোম দেখা যায়—(ক) টেলোসেন্ট্রিক

(Telocentric) বা **টার্মিনাল (Terminal)** ক্রোমোজোম—সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের শীর্ষে থাকে, (খ) **সাব্টেলোসেন্ট্রিক (Subtelocentric)** বা **সাব্টার্মিনাল (Subterminal)** ক্রোমোজোম—সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের শীর্ষদেশের কাছাকাছি থাকে, এবং (গ) **মেটাসেন্ট্রিক (Metacentric)** বা **মিডিয়ান (Median)** ক্রোমোজোম—সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের মাঝখানে থাকে।

প্রোফেজের প্রথম অবস্থায় ক্রোমোজোমের ক্রোম্যাটিড দুইটি পৃথকভাবে ক্রমশঃ স্প্রিং-এর মতো প্যাঁচাইতে থাকে। ফলে, ক্রোম্যাটিড তথা ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য কমিতে শুরু করে এবং পরোক্ষভাবে ইহারা আয়তনে বাড়িতে থাকে। শুধু তাহাই নয়, ক্রমাগত প্যাঁচাইতে থাকায়, ক্রোম্যাটিড দুইটির মধ্যে টান পড়ে। ফলে, ইহারা পরস্পর (সেন্ট্রোমিয়ার অংশ ছাড়া) পৃথক হইতে থাকে এবং শেষে দৈর্ঘ্য-বরাবর সমান্তরালভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে।

ইতিমধ্যে ক্রোমোজোমের চারপাশে একরকম পদার্থ জমা হইয়া ক্রোম্যাটিড দুইটিকে ঢাকিয়া রাখে। ইহাকে ধাত্র, **ম্যাট্রিক্স (Matrix** ; ল্যাটিন *mater* =মাতা) বা **হায়ালোলেমা (Hyalolemma** ; গ্রীক *hyalos*=স্ফটিক+ *lemma*=আবরণ) বলে। ধাত্রের সঠিক রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে মতভেদ আছে ; তবে ইহা প্রোটীন দিয়া গঠিত। ধাত্রসহ ক্রোম্যাটিড দুইটি একটি পাতলা পর্দা দিয়া ঢাকা থাকে। এই পর্দাকে **পেলিক্ল (Pellicle** ; ল্যাটিন *pellicula*=পাতলা চর্ম) বলে।

প্রোফেজের মাঝামাঝি সময় হইতে নিউক্লিওলাসটি আয়তনে ছোট হইতে থাকে এবং শেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। নিউক্লিওলাসের কিছু অংশ ধাত্র গঠনে সাহায্য করে। শেষ পর্যায়ে, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন অন্তর্হিত হয় এবং প্রোফেজ দশার শেষ হয় (৫৫নং চিত্র)।

মেটাফেজ (Metaphase)

মেটাফেজের আরম্ভে নিউক্লিওপ্লাজ্মের ভৌত পরিবর্তন শুরু হয়। ইহা সাইটোপ্লাজ্ম হইতে পৃথক থাকিয়া দুই-মেরু-যুক্ত একটি মাকু(Spindle)-র আকার ধারণ করে। সম্ভবতঃ নিউক্লিওপ্লাজ্মের সান্দ্রতা ও ঘনত্বের পরিবর্তনের ফলে এইরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহাকে **দ্বিমেরু তর্কু** বা **বাইপোলার স্পিন্ড্ল (Bipolar spindle)** বলে। স্পিন্ড্লের মাঝামাঝি অঞ্চলের ব্যাস বেশি ; ইহাকে **বিষুব-অঞ্চল (Equatorial region)** ধরা হয়। ইতিমধ্যে স্পিন্ড্লের মেরু-অঞ্চল হইতে অনেকগুলি সূতার মতো বস্তু আবির্ভূত হয়। ইহাদের **বেমতন্তু**, **স্পিন্ড্ল ফাইবার (Spindle**

fibres) বা **আকর্ষ-তন্তু** (Tractile fibres) বলে। তন্তুগুলি দুই ধরনের—কতকগুলি তন্তু দুইটি মেরুর সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকে এবং কতকগুলি মেরু হইতে বিষুব-অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। শেষোক্ত তন্তুগুলিকে **ক্রোমোসোমিক ফাইবার** (Chromosomic fibres) বলা হয়।

ইতিমধ্যে ক্রোমোজোমগুলি বিষুবতলে বিন্যস্ত হয়। শেষে ক্রোমোজোমগুলি, সেন্ট্রোমিয়ার-অঞ্চলে, উভয় মেরু হইতে আগত ক্রোমোসোমিক ফাইবারের সঙ্গে জুড়িয়া যায়। তখন ক্রোমোজোমগুলিকে V, L অথবা I-এর মতো দেখায়। মেটাফেজে ক্রোমোজোমের সংখ্যা স্পষ্ট গোনা যায়। ক্রোমোজোমের গঠনগত বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করার পক্ষেও মেটাফেজ-ই প্রশস্ত সময়।

অ্যানাফেজ (Anaphase)

অ্যানাফেজের আরম্ভে সেন্ট্রোমিয়ার দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হয় এবং ক্রোম্যাটিড দুইটি পরস্পর পৃথক হইতে থাকে। অপত্য সেন্ট্রোমিয়ার দুইটিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে এবং বিষুব-অঞ্চল হইতে মেরু-অঞ্চলের দিকে অভিসারীভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। সাধারণতঃ ক্রোমোসোমিক ফাইবারের সঙ্কোচনের ফলে ক্রোম্যাটিডগুলি ফাইবারের গা বাহিয়া মেরুর দিকে অগ্রসর হয়। এখন ক্রোম্যাটিড দুইটিকে অপত্য ক্রোমোজোম (Daughter chromosomes) ধরা হয়।

টেলোফেজ (Telophase)

উভয় মেরুতে সমান-সংখ্যক অপত্য ক্রোমোজোম পৌছাইলে, ক্রমশঃ ধাত্র বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং ক্রোমোজোমগুলির প্যাঁচ খুলিতে থাকে। শেষে ইহাদের ঘিরিয়া নিউক্লিয়ার মেম্‌ব্রেন এবং নিউক্লিওলাস আবির্ভূত হয়। এইভাবে অবশেষে দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়।

নিউক্লিয়াস-বিভাজনের স্থিতিকাল বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম। উদাহরণস্বরূপ—জটাকান্‌শিরাতে ৩০ মিনিট, স্পাইরোগাইরাতে ৪৫ মিনিট, কতকগুলি তৃন-জাতীয় উদ্ভিদে ৭৮ হইতে ১১০ মিনিট। প্রধানতঃ, উষ্ণতার তারতম্যের উপর এই স্থিতিকাল নির্ভর করে।

মাইটোসিসের গুরুত্ব (Importance of mitosis)—বহুকোষী জীবের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য মাইটোসিস অপরিহার্য। মাইটোসিসের ফলে মাতৃ-নিউক্লিয়াসের এবং অপত্য নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম-সংখ্যা সবসময় সমান থাকে। যেমন—মাতৃ-নিউক্লিয়াসে ৮ জোড়া ক্রোমোজোম থাকিলে, অপত্য

নিউক্লিয়াস দুইটিতেও ৮ জোড়া করিয়া ক্রোমোজোম থাকিবে। শুধু তাহাই নয়, এক্ষেত্রে অপত্য নিউক্লিয়াসের গঠন ও গুণ হুবহু মাতৃ-নিউক্লিয়াসের মতো হয়। সেইজন্য ইহাকে **সদৃশ বিভাজন** বা **ইকোয়েশানাল ডিভিশান**(**Equational division**)-ও বলা হয়। বংশগতির পরিপ্রেক্ষিতে মাইটোসিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ, ক্রোমোজোমগুলি বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে।

সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis)

টেলোফেজের শেষদিকে স্পিন্‌ড্‌লের ঠিক বিষুব-অঞ্চল-বরাবর বিভিন্ন রকম কোষ-প্রাচীর-উপাদান বিন্দুর মতো পাশাপাশি জমিতে থাকে। ফলে, একটি পাতের মতো অংশ গঠিত হয়। ইহাকে **কোষভাগ-প্রাকার** বা **সেল প্লেট** (**Cell plate**) বলে। ইহা পরিধি-বরাবর বাড়িতে থাকে এবং শেষে মাতৃ-কোষের প্রাচীরের সঙ্গে যুক্ত হয়। ইহার উপর ক্রমাগতঃ সেলুলোজ, পেক্‌টিন ইত্যাদি জমিতে থাকায়, পাতটি পুরু হইতে থাকে। ইহার ফলে মাতৃ-কোষের সাইটোপ্লাজ্‌ম দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হইয়া, এক-একটি নিউক্লিয়াস-সহ দুইটি অপত্য কোষ গঠন করে।

কতকগুলি নিম্ন-শ্রেণীর উদ্ভিদে কোষ-বিভাজনের সময় প্রথমে নিউক্লিয়াস মাইটোসিস-প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে। পরে
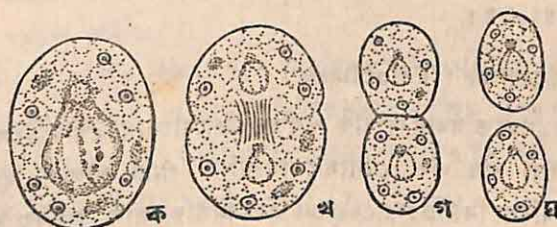
৫৬নং চিত্র—ক. হইতে ঘ. বিভাজন(ঈস্‌ট)-এর বিভিন্ন দশা।

সাইটোপ্লাজ্‌ম কেন্দ্র-বরাবর সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং শেষে দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হয়। ইহাকে **বিভাজন** বা **ফিশান** (**Fission** ; ল্যাটিন *fissus* = ফাটল) বলে। ঈস্‌ট(Yeast)-এর ক্ষেত্রে এইরকম বিভাজন দেখা যায়।

মা'য়োসিস
(Meiosis)

মা'য়োসিস-প্রক্রিয়ায় মাতৃ-নিউক্লিয়াস দুইবার বিভক্ত হইয়া মোট চারটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে। প্রথমে, মাতৃ-নিউক্লিয়াস হইতে বিশেষ প্রক্রিয়ায়

দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। অপত্য নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃ-নিউক্লিয়াসের অর্ধেক হইয়া যায়। সেইজন্য এই প্রথম বিভাজনকে **হ্রাস-বিভাজন** বা **রিডাক্শান ডিভিশান** (Reduction division) বলা হয়।
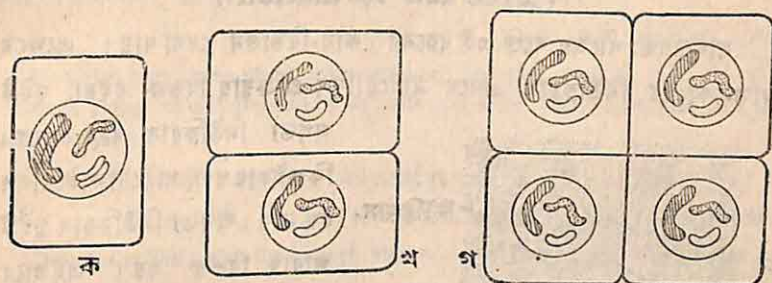
৫৭নং চিত্র—ক. হইতে গ. মা'য়োসিস-এর বিভিন্ন দশা (চিত্ররূপ)।

অপত্য নিউক্লিয়াস দুইটি দ্বিতীয়বার মাইটোসিস-প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া মোট চারটি নিউক্লিয়াস, তথা চারটি কোষ সৃষ্টি করে। কাজেই, মা'য়োসিস-পদ্ধতিতে, অপত্য নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম-সংখ্যা মাতৃ-নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম-সংখ্যার অর্ধেক হইয়া যায়।

মা'য়োসিস-প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত জটিল এবং জীবের যৌন জননের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কোরকোদ্গম
(Budding)

এই পদ্ধতিতে কোষ-বিভাজনের শুরুতে একটি পরিণত কোষের এক পাশ স্ফীত হইয়া উঠে। নিউক্লিয়াসটি ইত্যবসরে লম্বা হইয়া দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়। নিউক্লিয়াসের একটি অংশ এই স্ফীত অংশে প্রবেশ করে, অপর অংশটি মাতৃ-কোষের মধ্যে থাকিয়া যায়। স্ফীত অংশটি ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। ইহাকে তখন **কোরক** বা **বাড** (Bud) বলা হয়। অবশেষে কোরকটি নিউক্লিয়াস-সহ মাতৃ-কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঈস্ট (Yeast) নামক
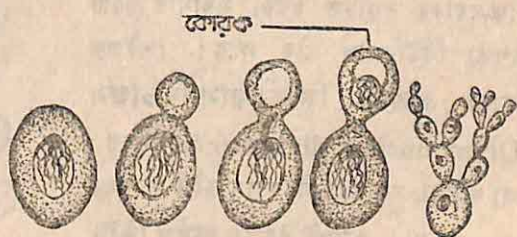
৫৮নং চিত্র—কোরকোদ্গম (ঈস্ট)।

ছত্রাকে এইরকম কোরকোদ্গম দেখা যায়। কোরকগুলি অনেক সময় পর্যন্ত মাতৃ-কোষের গায়ে এবং একটির গায়ে আর একটি লাগিয়া থাকে।

অবাধ কোষ-গঠন
(Free cell formation)

সাধারণতঃ বীজের সস্যে এই ধরনের কোষ-বিভাজন দেখা যায়। এক্ষেত্রে মাতৃ-কোষের নিউক্লিয়াস প্রথমে মাইটোসিস-প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া, দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে। কিন্তু ইহার পরই সাইটোকাইনেসিস হয় না। অপত্য নিউক্লিয়াস দুইটি আবার বিভক্ত হয়। এইভাবে কয়েকবার বিভাজনের ফলে মাতৃ-কোষের মধ্যে অনেকগুলি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। পরে মাতৃ-কোষের সাইটোপ্লাজ্‌মে ফাটল ধরে এবং প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরিয়া কোষ-প্রাচীর গঠিত হয়।
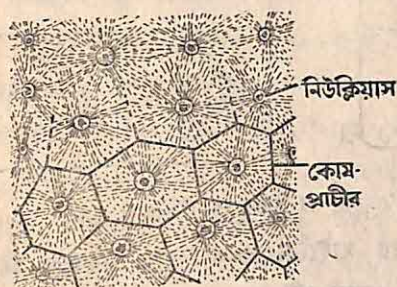
৫৯নং চিত্র—অবাধ কোষ-গঠন (খেজুরের সস্য)।

অনেক সময় কোষ-প্রাচীর গঠিত না হইয়া প্রতিটি অপত্য নিউক্লিয়াস শুধু সাইটোপ্লাজ্‌ম দিয়া পরিবৃত থাকিয়া নগ্ন কোষ সৃষ্টি করে। পরে মাতৃ-কোষের প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া নগ্ন কোষগুলি বাহির হইয়া আসে। কতকগুলি শেওলা ও ছত্রাকের জনন-কালে এই ধরনের কোষ-বিভাজন দেখা যায়।

আমাইটোসিস
(Amitosis)

ইহা একধরনের নিউক্লিয়াস-বিভাজনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে নিউক্লিয়াস মাঝ-বরাবর সঙ্কুচিত হইয়া সরাসরি দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে। সেইজন্য ইহাকে **প্রত্যক্ষ নিউক্লিয়াস-বিভাজন** (**Direct nuclear division**)-ও বলা হয়। বলা বাহুল্য, অপত্য নিউক্লিয়াস দুইটি সবসময় সমান হয় না। কাজেই ইহাকে **অসম নিউক্লিয়াস-বিভাজন**(**Unequal nuclear division**)-ও বলা যায়। কারা (*Chara*) নামক সবুজ শেওলায় আমাইটোসিস-পদ্ধতিতে নিউক্লিয়াস-বিভাজন হয়।
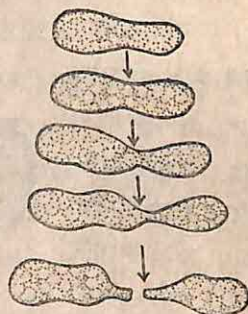
৬০নং চিত্র—আমাইটোসিস।

অনুশীলনী

১। উদ্ভিদ-দেহের কোন অংশে সক্রিয় কোষ-বিভাজন হয় ? যথাযথ চিত্রসহ কোষ-বিভাজনের দশাগুলি বর্ণনা কর। এইরকম বিভাজনকে সদৃশ বিভাজন বলা হয় কেন ?

[H. S. 1969 ; *cp*. 1972, 1967]

In which part of the plant body active cell division occurs ? Describe the different stages of cell division by suitable diagrams. Why such divisions are called equational ?

২। চিত্রসহ মাইটোসিস বর্ণনা কর। মাইটোসিসের গুরুত্ব কি ?

[H. S. 1965 ; *cp*. 1968 (Comp.), 1963 (Comp.), 1962 (Comp.), 1961]

Describe mitosis with the help of diagrams. What is the importance of mitosis ?

৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) সংশ্লেষ [H. S. 1966 (Comp.), 1963] ; (খ) নিষেক [H. S. 1964, 1963] ; (গ) ক্রোমোজোম [H. S. 1971, 1969, 1967 (Comp.)] ; (ঘ) মাইটোসিস ; (ঙ) সাইটোকাইনেসিস ; (চ) বিভাজন [H. S. 1963] ; (ছ) মা'য়োসিস ; (জ) কোরকোদ্গম [H. S. 1966, 1964 (Comp.), 1963 ; *cp*. 1960] ; (ঝ) অবাধ কোষ-গঠন ; (ঞ) আমাইটোসিস।

Write short notes on :—

(*a*) Conjugation ; (*b*) Fertilisation ; (*c*) Chromosome ; (*d*) Mitosis ; (*e*) Cytokinesis ; (*f*) Fission ; (*g*) Meiosis ; (*h*) Budding ; (*i*) Free cell formation ; (*j*) Amitosis.

এককের শ্রম-বিভাগ

(Division of labour among the units)
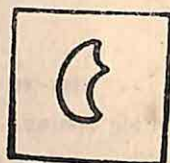
বহুকোষী উদ্ভিদের দেহে বিভিন্ন ধরনের কোষ একসঙ্গে এবং সংঘবদ্ধভাবে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। কতকগুলি কোষ খাদ্যের রসদ সংবহন করে ; কিছু-সংখ্যক কোষ খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে ; কতকগুলি কোষ অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ জমা করিয়া রাখে ; আবার, কতকগুলি কোষ উদ্ভিদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। এইভাবে, নির্দিষ্ট শ্রম-বণ্টনের দ্বারা এবং পারস্পরিক সহ-যোগিতার মাধ্যমে নানা ধরনের কোষ ছন্দোবদ্ধভাবে বহুকোষী উদ্ভিদ-দেহের যাবতীয় কাজ করে।

নির্দিষ্ট অথবা পৃথক আকারের কতকগুলি কোষ একইভাবে উৎপন্ন হইয়া, একসঙ্গে এবং সংঘবদ্ধভাবে একই ধরনের কাজ করিলে, এইরকম কোষ-সমষ্টিকে **কলা** বা **টিস্যু (Tissue** ; ল্যাটিন *texo* = বয়ন করা) বলা হয়।

শ্রম-বিভাগ প্রসঙ্গে, প্রথমে বিভিন্ন ধরনের কলা এবং উহাদের কোষগুলির আকার, প্রকৃতি, গঠন ও কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

বিভিন্ন ধরনের কলা
(Different types of tissues)

কলার কোষগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকৃতিগতভাবে সমান। অবশ্য, কতকগুলি ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারের কোষ নিয়াও কলা গঠিত হয়। অপরিণত অবস্থায়, কলার কোষগুলির পাশে কোনও ফাঁক থাকে না। পরিণত অবস্থায়, অনেক সময় কোষগুলির চারপাশে ফাঁক সৃষ্টি হয়। এই ফাঁকগুলিকে **আন্তঃ-কোষীয় রন্ধ্র (Intercellular spaces)** বলে। আন্তঃকোষীয় রন্ধ্রে সাধারণতঃ জল অথবা বায়ু থাকে।

কলা প্রধানতঃ দুই ধরনের—**ভাজক কলা (Meristematic tissue)** বা **মেরিস্টেম (Meristem** ; গ্রীক *meristos* = বিভক্ত) এবং **স্থায়ী কলা (Permanent tissue)**।

ভাজক কলা (Meristematic tissue)

ভাজক কলার কোষগুলি অপরিণত এবং ক্রমাগত বিভাজনে সক্ষম। এই কলায় আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র থাকে না। কোষগুলি সমব্যাস-যুক্ত (Isodiametric),

কয়েকটি ছোট ছোট ভ্যাকুওল ছাড়া, ঘন সাইটোপ্লাজ্‌মে পূর্ণ। ইহাদের নিউক্লিয়াস বড় এবং কোষের প্রায় দুইয়ের তিন অংশ জুড়িয়া থাকে। ভাজক কলার কোষে প্লাস্টিডের পরিবর্তে প্রোপ্লাস্টিড (Proplastids) থাকে এবং অজীবীয় বস্তু থাকে না। ইহাদের কোষ-প্রাচীর পাতলা, সমসত্ব (Homogeneous) এবং কেবল সেলুলোজ দিয়া গঠিত। উৎপত্তির সময় অনুসারে, ভাজক কলা দুই রকম—(ক) **প্রাথমিক ভাজক কলা (Primary meristem)** এবং (খ) **গৌণ ভাজক কলা (Secondary meristem)**। প্রাথমিক ভাজক কলা উদ্ভিদ-দেহে প্রথমে সৃষ্টি হয়, এবং গৌণ ভাজক কলা পরে প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপন্ন হয়।
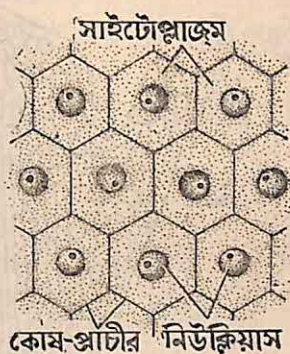
৬১নং চিত্র—ভাজক কলা।

প্রাথমিক ভাজক কলা (Primary meristem)

যে ভাজক কলা উদ্ভিদের ভ্রূণ অবস্থা হইতে মৃত্যু পর্যন্ত উদ্ভিদ-দেহে থাকে, তাহাকে প্রাথমিক ভাজক কলা বলা হয়। উদ্ভিদ-দেহে অবস্থান অনুসারে, ইহা আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন—

(১) **অগ্রস্থ ভাজক কলা (Apical meristem)**—উদ্ভিদের মূল এবং কাণ্ডের অগ্রভাগে যে ভাজক কলা থাকে, তাহাকে অগ্রস্থ ভাজক কলা বলা হয়। ইহাকে **আদি ভাজক কলা**(Promeristem)-ও বলে।

কাণ্ডের আদি ভাজক কলা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত। সবচেয়ে বাহিরের স্তরকে **ডার্‌মাটোজেন** (Dermatogen ; গ্রীক *derma*=ত্বক্ + *genea*= উৎপন্ন করা) বলে। এক সারি কোষ নিয়া এই স্তরটি গঠিত। ডার্‌মাটোজেন হইতে কাণ্ডের, শাখা-প্রশাখার এবং পত্রের ত্বক্ (Epidermis) গঠিত হয়। ডার্‌মাটোজেনের ভিতর দিকের পরবর্তী অঞ্চলকে **পেরিব্লেম** (Periblem ; গ্রীক *peri*=চারদিক+*blema*=ত্বক্) বলা হয়। ইহা অগ্রভাগে একটিমাত্র সারিতে এবং নিচের দিকে কয়েকটি স্তরে বিস্তৃত থাকে এই অঞ্চল হইতে কাণ্ডের অধস্ত্বক্ (Hypodermis), বহিঃস্তর (Cortex) ও অন্তস্ত্বক্ (Endodermis) উৎপন্ন হয়। পেরিব্লেমের পরবর্তী, কাণ্ডের মাঝখানের অঞ্চলটিকে **প্লিরোম** (Plerome ; গ্রীক *pleroma*=পূর্ণ) বলে। অগ্রভাগের

অল্প নীচে লম্বা লম্বা প্লিরোম কোষ উৎপন্ন হয়। এই কোষগুলি হইতে নালিকা বাণ্ডিল (Vascular bundles) ও মজ্জা (Pith) গঠিত হয়।
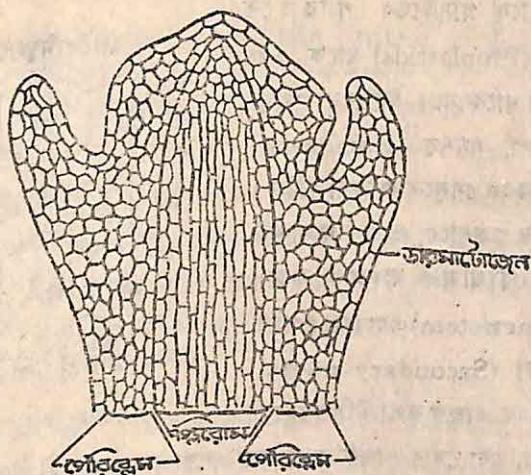
৬২নং চিত্র—কাণ্ডের অগ্রস্থ ভাজক কলা।

কাণ্ডের মতো, মূলের অগ্রস্থ ভাজক কলা-ও ডারমাটোজেন, পেরিব্লেম ও
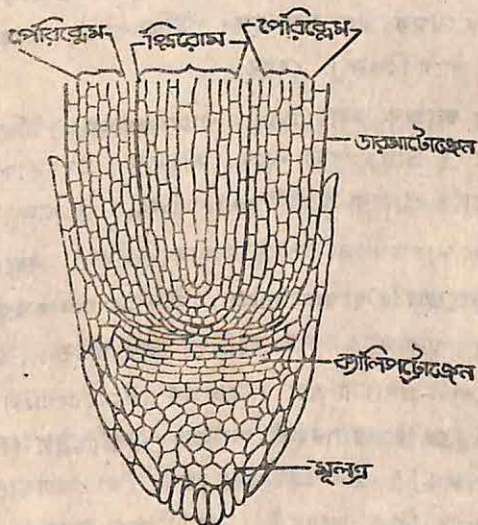
৬৩নং চিত্র—মূলের অগ্রস্থ ভাজক কলা।

প্লিরোম—এই তিন অঞ্চলে বিভক্ত। এক্ষেত্রে অগ্রস্থ ভাজক কলার সামনে একাধিক স্তর-যুক্ত কলা থাকে। ইহাকে মূলত্র (Root-cap) বলে। মূলত্র

অগ্রস্থ ভাজক কলাকে রক্ষা করে। মূলের ডার্‌মাটোজেন-ও এক-স্তর-যুক্ত, কিন্তু মূলের শীর্ষে এবং মূলত্রের নিচে ইহা পেরিব্লেমের সঙ্গে মিশিয়া যায়। মিশ্রিত কোষগুলিকে **ক্যালিপ্‌ট্রোজেন** (**Calyptrogen** ; গ্রীক *kalyptra*=টুপী) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে, ক্যালিপ্‌ট্রোজেন হইতেই মূলত্র উৎপন্ন হয়। পেরিব্লেম ও প্লিরোম যথাক্রমে মূলের বহিঃস্তর ও কেন্দ্রস্তম্ভ (Stele) গঠন করে।

(২) **নিবেশিত ভাজক কলা** (**Intercalary meristem**)—ভাজক কলার দুই পাশে স্থায়ী কলা থাকিলে, ঐরকম ভাজক কলাকে নিবেশিত ভাজক কলা বলা হয়। নিবেশিত ভাজক কলা পরে স্থায়ী কলায় রূপান্তরিত হয়। পাইনের পত্রে, কতকগুলি তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদের পর্বমধ্যে নিবেশিত ভাজক কলা দেখা যায়।

৬৪নং চিত্র—কাণ্ডের প্রাথমিক ভাজক কলার অবস্থান (অর্ধ-চিত্ররূপ)।

(৩) **পার্শ্বস্থ ভাজক কলা** (**Lateral meristem**)—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে এবং মূলের পরিণত অংশে, স্থায়ী কলার পাশে, উপর হইতে নিচ পর্যন্ত যে ভাজক কলা বিস্তৃত থাকে, তাহাকে পার্শ্বস্থ ভাজক কলা বলা হয়। ফ্যাসিকুলার ক্যাম্‌বিয়াম (Fascicular cambium) বা ক্যাম্‌বিয়াম (Cambium ; ৭৮নং চিত্র এবং ১৩১ পৃষ্ঠা ও ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পার্শ্বস্থ ভাজক কলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গৌণ ভাজক কলা (Secondary meristem)

স্থায়ী কলার কোষ সাধারণতঃ বিভাজিত হয় না। কিন্তু সময়-বিশেষে ইহারা ভাজক কলার মতো বিভাজিত হয়। এইরকম ভাজক কলাকে গৌণ ভাজক কলা বলা হয়। গৌণ ভাজক কলা সাধারণতঃ কাণ্ডের অথবা মূলের পাশের দিকে থাকে। অতএব, অবস্থান অনুসারে, ইহাদের **পার্শ্বস্থ গৌণ ভাজক কলা**(**Lateral secondary meristem**)-ও বলা যায়। ইন্‌টার্‌-ফ্যাসিকুলার ক্যাম্‌বিয়াম (Inter-fascicular cambium) এবং ফেলোজেন (Phellogen) গৌণ ভাজক কলার উদাহরণ।

ভাজক কলার কাজ (Functions of meristem)—উদ্ভিদের সামগ্রিক বৃদ্ধির জন্য ভাজক কলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অগ্রস্থ ভাজক কলার সাহায্যে উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে বাড়ে। অগ্রস্থ ভাজক কলা হইতে বিভিন্ন স্থায়ী কলা সৃষ্টি হয়। অন্যান্য ভাজক কলা উদ্ভিদের পরিধি ও আয়তন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

স্থায়ী কলা (Permanent tissue)

যে সমস্ত কলার কোষ ভাজক কলার মতো বিভাজিত হইতে পারে না, তাহাদের স্থায়ী কলা বলা হয়। স্থায়ী কলার কোষ বিশিষ্ট আকার-যুক্ত। কতকগুলি স্থায়ী কলা আবার মৃত কোষ নিয়া গঠিত। অবশ্য, কোষগুলি প্রথমে সজীব থাকে, পরে ইহাদের প্রোটোপ্লাজ্‌ম নষ্ট হইয়া যায়। মৃত কোষ বিশেষ ধরনের শারীরবৃত্তীয় অথবা যান্ত্রিক কাজ করে। স্থায়ী কলাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন—(ক) **সরল স্থায়ী কলা** (Simple permanent tissue), (খ) **জটিল স্থায়ী কলা** (Complex permanent tissue) এবং (গ) **বিশিষ্ট স্থায়ী কলা** (Special permanent tissue)।

সরল স্থায়ী কলা (Simple permanent tissue)

একই আকার ও গঠন-যুক্ত কোষ নিয়া যে স্থায়ী কলা গঠিত, তাহাকে **সরল স্থায়ী কলা** (Simple permanent tissue) বলে। ইহা আবার তিন ধরনের। যেমন—

(১) **প্যারেন্‌কাইমা** (Parenchyma ; গ্রীক *para*=ভিতরে+*engchyma*=অনুপ্রবেশ)—এই কলার কোষগুলি সাধারণতঃ গোল, ডিম্বাকার অথবা বহুভুজাকার। ইহারা সজীব এবং ইহাতে বেশি পরিমাণে সাইটোপ্লাজ্‌ম থাকে। এই কোষগুলির প্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ দিয়া গঠিত।
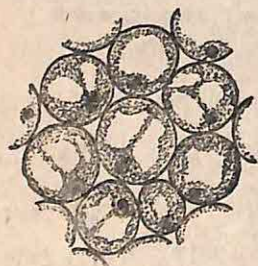
৬৫নং চিত্র—প্যারেন্‌কাইমা কলা।

প্যারেন্‌কাইমা কলায় আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র থাকে। উদ্ভিদের নরম ও রসালো অংশে অর্থাৎ কাণ্ড, মূল ইত্যাদির বহিঃস্তরে এবং মজ্জায় প্যারেন্‌কাইমা কলা দেখা যায়।

সবুজ কাণ্ডের অধস্ত্বকে এবং পত্রে ক্লোরোপ্লাস্ট-যুক্ত প্যারেন্‌কাইমা কলা থাকে। ইহাদের **ক্লোরেন্‌কাইমা** (Chlorenchyma ; গ্রীক *chloros*= ফেকাশে সবুজ+*engchyma*=অনুপ্রবেশ) বলে

কচু, ওল, সর্বজয়া ইত্যাদির পত্রের বৃন্তে এবং অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড ও পত্রের বৃন্তের প্যারেন্‌কাইমা কলায় মাঝে মাঝে বায়ুপূর্ণ কোষ-বিহীন অঞ্চল দেখা যায়। এইরকম কলাকে **এয়ারেন্‌কাইমা** (Aerenchyma ; গ্রীক *aer* = বায়ু + *engchyma* = অনুপ্রবেশ) বলা হয়। এয়ারেন্‌কাইমার কোষগুলি একাধিক বাহু-যুক্ত।

কাজ (Functions)—প্যারেন্‌কাইমার কাজ প্রধানতঃ শারীরবৃত্তীয়। এই কলার কোষগুলি খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। ক্লোরেন্‌কাইমার কোষগুলি সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে। সেই হিসাবে, প্যারেন্‌কাইমাকে **পরিপোষণ-কলা**(Nutritive tissue)-ও বলা হয়। অনেকক্ষেত্রে, প্যারেন্‌কাইমা কলা খাদ্য-সংবহনেও সাহায্য করে। এয়ারেন্‌কাইমা কলা জলজ উদ্ভিদের শ্বসন ও প্লবতায় সাহায্য করে।

(২) **কোলেন্‌কাইমা** (Collenchyma ; গ্রীক *kolla* = আঠা + *engchyma* = অনুপ্রবেশ)—এই কলার কোষগুলি বেলনাকার (Cylindrical) ; কোষ-প্রাচীরে বিচ্ছিন্নভাবে এবং বেশি পরিমাণে সেলুলোজ ও পেক্‌টিন জমা হওয়ায়, প্রস্থচ্ছেদে ইহাদের বহুভুজাকার দেখায়। কোলেন্‌কাইমার কোষগুলি সজীব। ইহাদের সাইটোপ্লাজ্‌মে অনেক ভ্যাকুওল থাকে। এই কলায় আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র থাকে এবং প্রাচীরে সাধারণ কূপ দেখা যায়। কোষগুলিতে সাধারণতঃ ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

সাধারণতঃ কাণ্ড, পত্রের বৃন্ত ও পুষ্পদণ্ড ইত্যাদির অধস্ত্বকে, পত্রের মধ্য-শিরায় এবং নালিকা বাণ্ডিলের দুই পাশে কোলেন্‌কাইমা কলা দেখা যায়।

কাজ (Functions)—কোলেন্‌কাইমার কাজ যান্ত্রিক ও শারীরবৃত্তীয়। কোষগুলির প্রাচীর স্থিতিস্থাপক (Elastic) নয় ; ফলে, ইহারা কাণ্ডকে ঋজু রাখে। বায়ু-প্রবাহ ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থায় কাণ্ডটি যাহাতে খাড়া থাকে, কোলেন্‌কাইমার কোষগুলি সেদিক দিয়া সাহায্য করে। কোষের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায়, ইহারা সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে।

(৩) **স্ক্লেরেন্‌কাইমা** (Sclerenchyma ; গ্রীক *skleros* = শক্ত + *engchyma* = অনুপ্রবেশ)—এই কলার কোষগুলি মৃত। ইহাদের আকার লম্বা ও সরু। কোষের দুই প্রান্ত সূচালো। লিগ্‌নিভবন-প্রক্রিয়ায় কোষগুলির প্রাচীর বেশি পরিমাণে স্থূল হয়। প্রাচীরে উভয় ধরনের (সাধারণ এবং সপাড়) কূপ দেখা যায়। এক-একটি কোষ ২ মিলিমিটার হইতে প্রায় ৫০০ মিলি মিটার

পর্যন্ত লম্বা হইতে পারে। পাট ও শণ গাছের আঁশ প্রকৃতপক্ষে স্ক্লেরেন্‌কাইমা কলা। এই কারণে স্ক্লেরেন্‌কাইমার কোষগুলিকে **তন্তু** বা **ফাইবার (Fibres)**-ও বলা হয়।
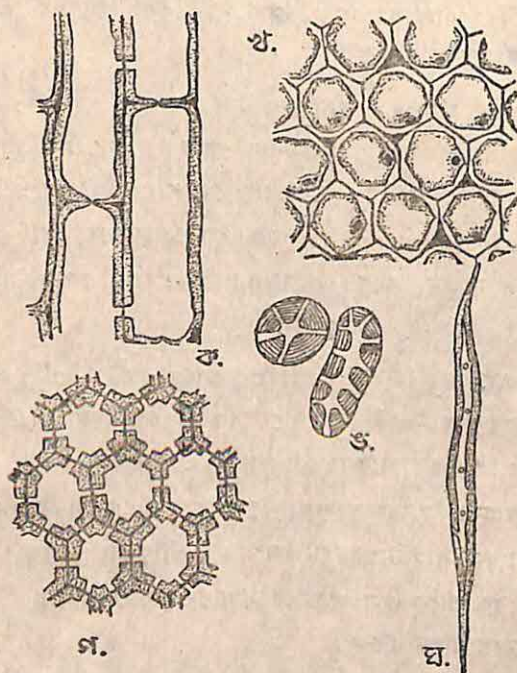
৬৩নং চিত্র—ক. কোলেন্‌কাইমা কলার দীর্ঘচ্ছেদ, খ. কোলেন্‌কাইমা কলার প্রস্থচ্ছেদ, গ. স্ক্লেরেন্‌কাইমা কলার প্রস্থচ্ছেদ, ঘ. স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষের দীর্ঘচ্ছেদ, ঙ. স্ক্লেরাইডের দীর্ঘচ্ছেদ।

উদ্ভিদ-দেহের প্রায় সব জায়গায়, বিশেষতঃ কাষ্ঠল অংশে, স্ক্লেরেন্‌কাইমা কলা দেখা যায়। পেয়ারা, নাশপাতি প্রভৃতির ফলত্বকে গোল গোল স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষ থাকে। ইহাদের **স্ক্লেরাইড (Sclerides)** বা **প্রস্তর-কোষ (Stone cells)** বলে।

কাজ (Functions)—স্ক্লেরেন্‌কাইমার কাজ শুধু যান্ত্রিক। উদ্ভিদ-দেহকে ঋজু রাখা ইহার প্রধান কাজ।

জটিল স্থায়ী কলা (Complex permanent tissue)

যে স্থায়ী কলার কোষগুলির আকার ও গঠন নানা রকমের, তাহাকে **জটিল স্থায়ী কলা (Complex permanent tissue)** বলা হয়। জটিল কলা

দুই রকম—(১) **জাইলেম** (Xylem ; গ্রীক *xylon*=কাষ্ঠল) এবং (২) **ফ্লোয়েম** (Phloem ; গ্রীক *pholoios*=আভ্যন্তরীণ বন্ধল)।

(১) **জাইলেম** (Xylem)—চার রকম কোষ নিয়া জাইলেম কলা গঠিত। ইহারা যথাক্রমে—(অ) **ট্রাকিড** (Tracheids ; ল্যাটিন *trachea*=শ্বাস-নালী), (আ) **বাহিকা, ভেস্‌ল** (Vessels) বা **ট্রাকীয়া** (Tracheae), (ই) **জাইলেম তন্তু** (Xylem fibres) বা **কাষ্ঠল তন্তু** (Wood fibres) এবং (ঈ) **জাইলেম প্যারেন্‌কাইমা** (Xylem parenchyma) বা **কাষ্ঠল প্যারেন্‌কাইমা** (Wood parenchyma)।

(অ) **ট্রাকিড** (Tracheid)—ইহারা মৃত কোষ, সাধারণতঃ লম্বা এবং দুই প্রান্তে সরু। ইহাদের প্রাচীর লিগ্‌নিন দিয়া স্থুল হয় ; কোষ-প্রাচীরে সাধারণ কূপ দেখা যায়। ইহা ছাড়া, বলয়াকার, সর্পিলাকার এবং সোপানাকার প্রাচীর-যুক্ত ট্রাকিড কোষও দেখা যায়। ইহাদের প্রস্থ-প্রাচীর থাকে। প্রধানতঃ টেরিডোফাইটা ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেম কলায় ট্রাকিড দেখা যায়।
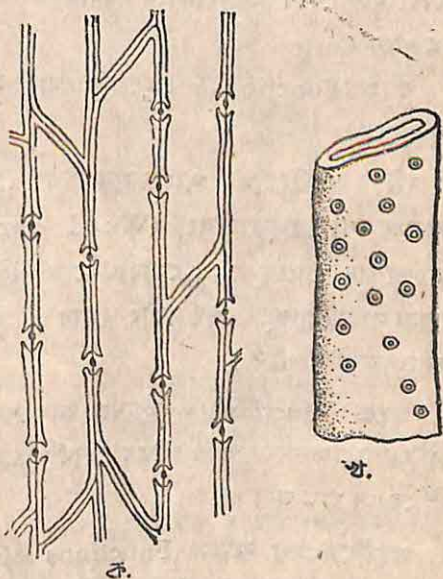
৬৭নং চিত্র—ক. কয়েকটি ট্রাকিডের দীর্ঘচ্ছেদ, খ. ট্রাকীয়ার দীর্ঘদৃশ্য।

কাজ (Functions)—ইহারা শারীরবৃত্তীয় ও যান্ত্রিক—দুই রকম কাজই করে। ট্রাকিড কোষের মধ্য দিয়া মূল হইতে জল ও অজৈব লবণ পত্রে পৌছায়। সুতরাং, জল ও খাদ্যের রসদ-সংবহন এই কোষের প্রধান কাজ। অনেকক্ষেত্রে ইহারা জল সঞ্চয় করিয়া রাখে। ইহা ছাড়া, ট্রাকিড কোষ উদ্ভিদকে ঋজু রাখে।

(আ) **ট্রাকীয়া** (Trachea) বা **বাহিকা** (Vessel)—ইহারাও মৃত কোষ। অপরিণত ট্রাকীয়া কোষগুলি বেলনাকার এবং একটির উপর আর একটি লম্বভাবে থাকে, এবং প্রস্থ-প্রাচীরের সাহায্যে আলাদা থাকে। কিন্তু

পরিণত কোষের প্রস্থ-প্রাচীর দ্রবীভূত হইয়া যায়। ফলে, কোষগুলিকে একটি অবিচ্ছিন্ন নলের মতো দেখায়। ইহাদের পার্শ্ব-প্রাচীর লিগ্‌নিন দিয়া স্থূল হয়। প্রাচীরে বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালকাকার এবং সপাড় ও সাধারণ কূপ-যুক্ত স্থূলীকরণ দেখা যায়। সরু ব্যাসযুক্ত ট্রাকীয়াকে **প্রোটো-জাইলেম** (Protoxylem) এবং অপেক্ষাকৃত চওড়া ব্যাসযুক্ত ট্রাকীয়াকে **মেটাজাইলেম** (Metaxylem) বলা হয়। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেম কলায় ট্রাকীয়া দেখা যায়।

কাজ (Functions)—ট্রাকীয়ার কাজ ট্রাকিডের মতো।

(ই) **জাইলেম তন্তু** (Xylem fibre) বা **কাষ্ঠল তন্তু** (Wood fibre)—জাইলেম কলার স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষগুলিকে কাষ্ঠল তন্তু বলে। ইহারা মৃত কোষ। অধিকাংশ দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে জাইলেম কলায় জাইলেম তন্তু থাকে।

কাজ (Functions)—স্ক্লেরেন্‌কাইমা কলার মতো। ইহারা শুধু যান্ত্রিক কাজ করে।

(ঈ) **জাইলেম প্যারেন্‌কাইমা** (Xylem parenchyma) বা **কাষ্ঠল প্যারেন্‌কাইমা** (Wood parenchyma)—জাইলেম কলার আয়তাকার প্যারেন্‌কাইমা কোষগুলিকে জাইলেম প্যারেন্‌কাইমা বলা হয়। ইহারা সাইটোপ্লাজ্‌মে পূর্ণ সজীব কোষ। ইহাদের কোষ-প্রাচীর পাতলা ও সেলুলোজ দিয়া গঠিত।

কাজ (Functions)—ইহাদের কাজ শারীরবৃত্তীয়। জাইলেম প্যারেন্‌কাইমা পরোক্ষভাবে জল ও অজৈব পদার্থ পরিবহনে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া, এই কোষে খাদ্য জমা থাকে।

জাইলেমের কাজ (Functions of xylem)—জাইলেমের কাজ প্রধানতঃ শারীরবৃত্তীয়—ট্রাকিড এবং ট্রাকীয়ার মধ্য দিয়া মূল দ্বারা শোষিত জল ও অজৈব লবণের দ্রবণ পত্রে পরিবাহিত হয়। জাইলেম প্যারেন্‌কাইমা এই কাজে সাহায্য করে। ট্রাকিড, ট্রাকীয়া এবং কাষ্ঠল তন্তু যান্ত্রিক কাজ করে। ইহারা উদ্ভিদ-দেহকে দৃঢ়তা দান করে।

(২) **ফ্লোয়েম** (Phloem)—জাইলেমের মতো, ফ্লোয়েম কলায়-ও চার রকম কোষ দেখা যায়। ইহারা যথাক্রমে—(অ) **সীভ নল** (Sieve tubes), (আ) **সঙ্গী কোষ** (Companion cells), (ই) **ফ্লোয়েম তন্তু**

(Phloem fibres) বা **বাস্ট তন্তু** (Bast fibres) এবং (ঈ) **ফ্লোয়েম প্যারেন্‌কাইমা** (Phloem parenchyma)।

(অ) **সীভ নল** (Sieve tube)—এই কোষগুলি সজীব এবং বেলনাকার। একটির উপর আর একটি কোষ পর পর সাজানো থাকে। কোষগুলির প্রাচীর সেলুলোজ দিয়া গঠিত এবং কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না। সীভ নলের প্রস্থ-প্রাচীরে অনেক রন্ধ্র থাকায়, প্রস্থ-প্রাচীরটিকে চালনী(Sieve)-র মতো দেখায়। সেইজন্য, প্রস্থ-প্রাচীরকে **চালনীচ্ছদা** বা **সীভ প্লেট** (Sieve plate) বলে। টেরিডোফাইটা ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলার সীভ-নল বিশেষ ধরনের। এ-ক্ষেত্রে, চালনীচ্ছদার ছিদ্রের মধ্য দিয়া সুতার মতো সাইটোপ্লাজ্‌ম পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে।

৬৮নং চিত্র—ক. ফ্লোয়েম কলার দীর্ঘচ্ছেদ, খ. সীভ প্লেটের প্রস্থদৃশ্য।

শীতকালে অধিকাংশ চালনীচ্ছদা **ক্যালোস** (Callose) নামক একধরনের কার্বোহাইড্রেট দিয়া বন্ধ থাকে। ফলে, চালনীচ্ছদায় যে গদির মতো গঠন দেখা যায়, তাহাকে **ক্যালাস প্যাড** (Callus pad) বলে। বসন্তকালে আবার ছিদ্রগুলি খুলিয়া যায়।

কাজ (Functions)—সীভ নলের কাজ শারীরবৃত্তীয়। পত্রে উৎপন্ন খাদ্য সীভ নলের মধ্য দিয়া উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

(আ) **সঙ্গী কোষ** (Companion cell)—কেবলমাত্র গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে, সীভ নলের পাশে, পাতলা প্রাচীর-যুক্ত লম্বা কোষ দেখা যায়। ইহাদের সঙ্গী কোষ বলে। ইহারা সজীব কোষ। কোষের মাঝখানে একটি বড় নিউক্লিয়াস থাকে। ইহাদের সাইটোপ্লাজ্‌মের ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি।

কাজ (**Functions**)—ইহাদের কাজ সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ ইহারা সীভ নলের মতো, খাদ্য-পরিবহনে সাহায্য করে।

(ই) ফ্লোয়েম তন্তু (**Phloem fibre**)—ফ্লোয়েম কলার স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষকে ফ্লোয়েম তন্তু বলে।

কাজ (**Functions**)—ইহাদের কাজ স্ক্লেরেন্‌কাইমার মতো, যান্ত্রিক।

(ঈ) ফ্লোয়েম প্যারেন্‌কাইমা (**Phloem parenchyma**)—ইহারা সজীব এবং আয়তাকার প্যারেন্‌কাইমা কোষ। একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলায় সাধারণতঃ ফ্লোয়েম প্যারেন্‌কাইমা দেখা যায় না।

কাজ (**Functions**)—ইহাদের কাজ শারীরবৃত্তীয়। ইহারা খাদ্য সঞ্চয় ও খাদ্য পরিবহন করে।

ফ্লোয়েমের কাজ (**Functions of phloem**)—সীভ নল পত্রে উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত করে। সঙ্গী কোষ এবং ফ্লোয়েম প্যারেন্‌কাইমা ইহাতে সাহায্য করে। ফ্লোয়েম তন্তু উদ্ভিদকে দৃঢ় রাখে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা যথাক্রমে খাদ্যের রসদ ও খাদ্য পরিবহন করে বলিয়া, ইহাদের **সংবহন-কলা** বা **ভাস্‌কুলার টিস্যু** (**Vascular tissue** ; ল্যাটিন *vasculum*=ছোট আধার)-ও বলা হয়।

বিশিষ্ট স্থায়ী কলা (Special permanent tissue)

সরল ও জটিল কলা ছাড়া, উদ্ভিদ-দেহে কতকগুলি বিশিষ্ট ধরনের স্থায়ী কলা দেখা যায়। **ক্ষীরকলা** বা **ল্যাটিসিফেরাস টিস্যু** (**Laticiferous tissue** ; ল্যাটিন *latex*=তরল পদার্থ-বিশেষ+*ferre*=বহন করা) অন্যতম বিশিষ্ট স্থায়ী কলা। এই কলার কোষগুলি সজীব, পাতলা কোষ-প্রাচীর-যুক্ত, লম্বা এবং শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত নালীর মতো। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি নিউক্লিয়াস থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নালীগুলি দুধের মতো একরকম রস দিয়া ভর্তি থাকে। ইহাকে **তরুক্ষীর** বা **ল্যাটেক্‌স** (**Latex**) বলে। ক্ষীরকলায় দুই রকম কোষ দেখা যায়। কতকগুলি কোষ সরু, পরস্পর-যুক্ত, প্রস্থ-প্রাচীর-বিহীন ও শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত হইয়া, জালিকার মতো কাণ্ডের অথবা পত্রের বৃন্তের বহিঃস্তরে থাকে। ইহাদের **ক্ষীরবাহিকা** (**Latex vessels**) বলে। আফিং, তামাক, কলা প্রভৃতি উদ্ভিদে ক্ষীরবাহিকা দেখা যায়। আবার, ফণিমনসা, করবী, আকন্দ প্রভৃতির কাণ্ডের বহিঃস্তরে শাখা-সমন্বিত কতকগুলি কোষ তরুক্ষীর দিয়া ভর্তি থাকে। ইহাদের **ক্ষীরকোষ** (**Latex cells**) বলা হয়।

কাজ (Functions)—সাধারণতঃ বিপাকের ফলে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ ক্ষীরকলায় জমা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পদার্থগুলি বিষাক্ত হয়। ইহা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।
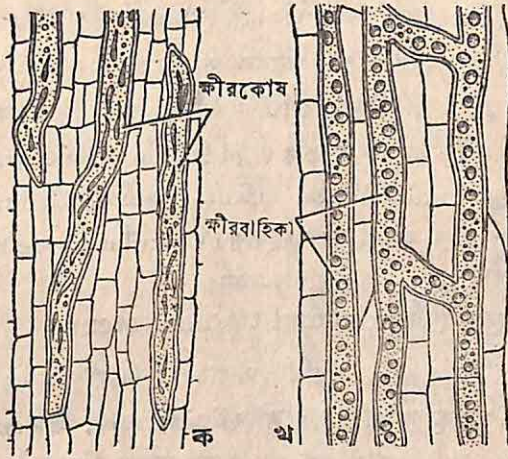
৬৯নং চিত্র—ক্ষীরকলা : ক. ক্ষীরকোষ, খ. ক্ষীরবাহিকা।

নিচে উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন কলার একটি ছক্ দেওয়া হইল।

কলা (Tissue)

- ভাজক (Meristematic)
  - [উৎপত্তির সময় অনুসারে]
    - প্রাথমিক (Primary)
      - [অবস্থান অনুসারে]
        - অগ্রস্থ (Apical)
        - নিবেশিত (Intercalary)
        - পার্শ্বস্থ (Lateral)
    - গৌণ (Secondary)
      - [অবস্থান অনুসারে]
        - পার্শ্বস্থ (Lateral)
- স্থায়ী (Permanent)
  - [আকৃতি ও গঠন অনুসারে]
    - সরল (Simple)
      - প্যারেন্‌কাইমা (Parenchyma)
      - কোলেন্‌কাইমা (Collenchayma)
      - স্ক্লেরেন্‌কাইমা (Sclerenchyma)
    - জটিল (Complex)
      - জাইলেম (Xylem)
      - ফ্লোয়েম (Pholem)
    - বিশিষ্ট (Special)
      - ক্ষীরকলা (Laticiferous tissue)
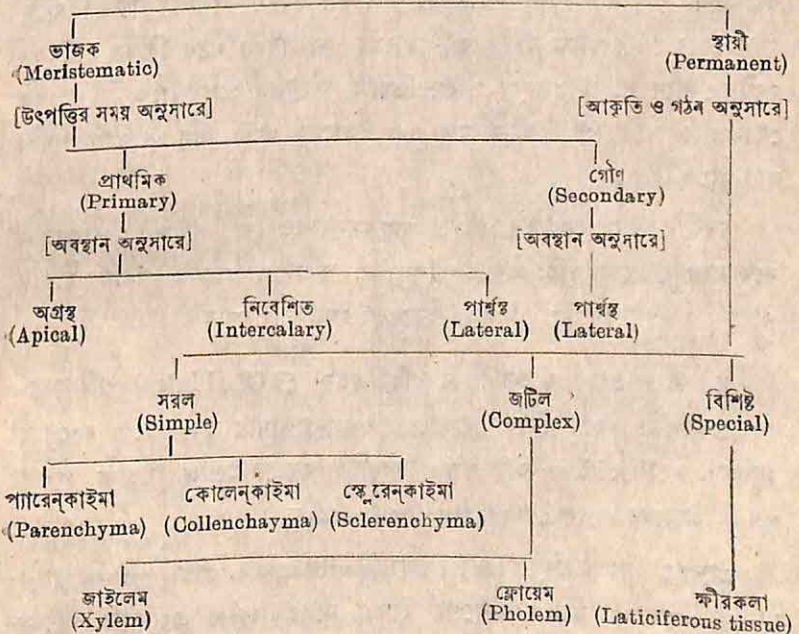
কলাতন্ত্র
(Tissue system)

বিভিন্ন ধরনের কলা ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। কোনও নির্দিষ্ট কাজের জন্য কতকগুলি বিভিন্ন ধরনের কলা একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হইয়া একটি **কলাতন্ত্র** (Tissue system) গঠন করে। অনেক সময়, শুধু একরকম কলা নিয়াও কলাতন্ত্র গঠিত হয়। শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে উদ্ভিদ-দেহে তিনটি কলাতন্ত্র দেখা যায়। যেমন—(ক) **ত্বক্-কলাতন্ত্র** (Epidermal tissue system), (খ) **আদিকলাতন্ত্র** (Fundamental tissue system, Ground tissue systsm) এবং (গ) **সংবহন-কলাতন্ত্র** (Varcular tissue system)।

ত্বক্-কলাতন্ত্র (Epidermal tissue system)

উদ্ভিদে, বাহিরের তলে অবস্থিত, সাধারণতঃ একটিমাত্র কোষ-স্তর দিয়া গঠিত আবরণকে **ত্বক্** বা **এপিডার্মিস** (Epidermis ; গ্রীক *epi*=উপরে+*derma*=ত্বক্) বলে। কাণ্ড, মূল এবং পত্রের ত্বকের গঠনে কম-বেশি পার্থক্য থাকায়, নিচে পৃথকভাবে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

কাণ্ডে ঃ কাণ্ডের অগ্রস্থ ভাজক কলার ডার্মাটোজেন অঞ্চল হইতে ত্বক্ সৃষ্টি হয়। ত্বক্ সাধারণতঃ একটি স্তর প্যারেন্‌কাইমা কোষ দিয়া গঠিত। ত্বকে আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র থাকে না। ত্বক্-কোষের আকার ও গঠন বিভিন্ন ধরনের। সজীব কোষে সাইটোপ্লাজ্‌ম প্রাইমর্ডিয়াল ইউট্রিক্‌ল-রূপে থাকে। পরিণত কোষগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত এবং ইহাদের মধ্যে বায়ু ও বর্জ্য পদার্থ জমা থাকে।

অপরিণত ত্বক্-কোষের প্রাচীর শুধু সেলুলোজ দিয়া গঠিত। পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের বহিঃ-প্রাচীরে কিউটিন, সুবারিন প্রভৃতি পদার্থ জমিতে থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই সময় ত্বক্‌কে তরঙ্গায়িত দেখায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত্বকের কোষ বর্ধিত হইয়া **রোম** (Hairs) সৃষ্টি করে। এই রোমগুলি বহুকোষী। গোলাপের শাখা-প্রশাখার ত্বক্ হইতে বহুকোষী গাত্রকণ্টক (Prickles) সৃষ্টি হয়। বিছুটির ত্বক্-রোমগুলি বিষাক্ত পদার্থে পূর্ণ। ইহাদের দংশক রোম (Stinging hairs) বলে।

মূলে ঃ মূলের ত্বক্‌কে **এপিব্লেমা** (Epiblema ; গ্রীক *epi*=উপরে+*blema*=আবরণ) বলে। কাণ্ডের মতো, মূলের ত্বক্-ও এক সারি প্যারেন্-

কাইমা কোষ দিয়া গঠিত। এপিব্লেমার বহিঃ-প্রাচীরে কোনও স্থূলীকরণ হয় না। মূলের মূলরোম-অঞ্চলের ত্বক্ হইতে এককোষী রোম উৎপন্ন হয়। ইহাদের **মূলরোম** (Root hairs) বলে। জলজ উদ্ভিদের মূলে মূলরোম থাকে না। পরিণত অবস্থাতেও ত্বকের কোষগুলি সজীব থাকে।

পত্রে : পত্রের উপর ও নিচের তলের ত্বক্ দুইটিকে যথাক্রমে **উর্ধ্বত্বক্** (Upper epidermis) এবং **নিম্নত্বক্** (Lower epidermis) বলা হয়। সাধারণতঃ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্রের উর্ধ্বত্বকে কিউটিকল-এর পুরু আবরণ থাকে। বট, রবার, অশ্বত্থ প্রভৃতি উদ্ভিদের পত্রে বহুস্তর-যুক্ত ত্বক্ দেখা যায়। ইহাকে **যৌগিক ত্বক্** (Multiple epidermis; ৪৮নং চিত্র) বলে।

পত্ররন্ধ্র (Stomata)

পত্রের ত্বকে (এবং অপরিণত সবুজ কাণ্ডের ত্বকেও) বিশিষ্ট ধরনের অসংখ্য সূক্ষ্ম রন্ধ্র দেখা যায়। ইহাদের **পত্ররন্ধ্র** বা **স্টোমাটা***(Stomata; গ্রীক *stoma*=মুখ) বলা হয়। একটি ছিদ্র এবং ছিদ্রের দুই পাশে দুইটি অর্ধ-চন্দ্রাকার (Semilunar) কোষ নিয়া পত্ররন্ধ্র গঠিত। কোষ দুইটিকে **রক্ষী কোষ** (Guard cells) বলে।

৭০নং চিত্র—পত্ররন্ধ্রের গঠন : ক. পৃষ্ঠ-দৃশ্য, খ. প্রস্থচ্ছেদ।

রক্ষী কোষ সজীব। ইহাদের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। পত্ররন্ধ্রের ঠিক নিচে একটি গহ্বর থাকে। ইহাকে **অধঃ-পত্ররন্ধ্রীয় গহ্বর** (Substomatal cavity), **শ্বাস-গহ্বর** (Respiratory cavity) বা **বায়ু-গহ্বর** (Air cavity) বলা

* বহুবচন; স্টোমা (Stoma) — একবচন।

হয়। রক্ষী কোষের ভিতরের অর্থাৎ ছিদ্র-সংলগ্ন প্রাচীর, বাহিরের প্রাচীরের চেয়ে পুরু। বিপাকের সময়, জল-শোষণের ফলে রক্ষী কোষে রসস্ফীতি-চাপ (Turgour pressure) বাড়িয়া যায়। তখন (ভিতরের প্রাচীর বেশি স্থূল হওয়ায়) প্রথমে শুধু বাহিরের প্রাচীর প্রসারিত হয়। শেষে ভিতরের প্রাচীরেও টান পড়ে এবং রন্ধ্রের মুখ খুলিয়া যায়। অতিরিক্ত জল বাষ্পের আকারে বাহির হইয়া যাওয়ার পরে, সব প্রাচীর আবার শ্লথ (Flaccid) হইয়া যায় এবং রন্ধ্রের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। সাধারণতঃ রাত্রে রন্ধ্রগুলি বন্ধ থাকে।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্রের নিম্নত্বকে বেশি-সংখ্যক পত্ররন্ধ্র থাকে, ঊর্ধ্বত্বকে পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা খুবই কম। একবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্রের দুই ত্বকে প্রায় সমান-সংখ্যক পত্ররন্ধ্র থাকে। অধিকাংশ জাঙ্গল উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্রগুলি ত্বকে অবস্থিত গহ্বরের মধ্যে থাকে। ইহাদের **নিহিত পত্ররন্ধ্র** (Shunken stomata) বলে। ভাসমান এবং অর্ধ-নিমগ্ন উদ্ভিদের পত্রের ঊর্ধ্বত্বকে পত্ররন্ধ্র থাকে। জল-নিমগ্ন উদ্ভিদে পত্ররন্ধ্র থাকে না।

পত্ররন্ধ্রের কাজ (Functions of stomata)—পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়া গ্যাসের আদান-প্রদান হয়। শ্বসনের সময় বায়ু হইতে অক্সিজেন পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়া উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হইয়া যায়। একইভাবে, সালোকসংশ্লেষের সময় পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশ করে এবং অক্সিজেন বাহির হইয়া যায়। ইহা ছাড়া, বাষ্পমোচনের সময় উদ্ভিদ-দেহের অতিরিক্ত জল পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়া বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়। রক্ষী কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায়, ইহারা খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে।

ত্বক্-কলাতন্ত্রের কাজ (Functions of epidermal tissue system)—ত্বক্-কলাতন্ত্র, শারীরবৃত্তীয় ও যান্ত্রিক, দুই ধরনের কাজই করে।

যান্ত্রিক কাজ (Mechanical functions)—বাহিরের আঘাত, উষ্ণতার তারতম্য, জীবাণু প্রভৃতি হইতে উদ্ভিদ-দেহকে রক্ষা করা ত্বক্-কলাতন্ত্রের প্রধান যান্ত্রিক কাজ। ইহা ছাড়া, ত্বকে উৎপন্ন রোম, দংশক রোম, গাত্রকণ্টক প্রভৃতি উদ্ভিদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

শারীরবৃত্তীয় কাজ (Physiological functions)—ত্বকের উপরের তলে কিউটিন, কিউটিকল, সুবারিন ইত্যাদির আবরণ থাকায়, বাষ্পমোচন-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। অধিকাংশ জাঙ্গল উদ্ভিদের ত্বকে জল জমা থাকে।

ত্বক্‌-কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকিলে, সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে। এপিব্লেমার মূলরোম জল ও অজৈব লবণ শোষণ করে। জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কাণ্ডের ত্বক্‌ দিয়া-ও জল ও লবণ গৃহীত হয়। ত্বক্‌-কলাতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য শারীরবৃত্তীয় কাজ, গ্যাসের আদান-প্রদান। পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়া শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষের সময় যথাক্রমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশ করে এবং বিপাকের শেষে যথাক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন রন্ধ্রের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যায়। পত্ররন্ধ্র বাষ্পমোচনেও সাহায্য করে।

আদিকলাতন্ত্র (Fundamental tissue system)

উদ্ভিদ-দেহের প্রধান অংশ মূলতঃ আদিকলাতন্ত্র দিয়া গঠিত। নিচে পৃথক-ভাবে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

কাণ্ডেঃ ত্বক্‌-কলাতন্ত্রের ঠিক ভিতরের দিক হইতে কাণ্ডের কেন্দ্র পর্যন্ত (সংবহন-কলাতন্ত্র ছাড়া) বিস্তৃত অঞ্চল নিয়া আদিকলাতন্ত্র গঠিত। ইহাদের কিছু অংশ পেরিব্লেম এবং কিছু অংশ প্লিরোম হইতে উৎপন্ন হয়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে আদিকলাতন্ত্র নিম্নলিখিত অঞ্চলে বিভক্ত।

(১) **বহিঃস্তর** বা **কর্টেক্স** (Cortex ; ল্যাটিন *cortex*=বল্কল)—ত্বকের পর হইতে অন্তস্ত্বক্‌ পর্যন্ত কয়েকটি স্তরে বিস্তৃত অঞ্চলকে বহিঃস্তর বলে। বহিঃস্তর সাধারণতঃ প্যারেন্‌কাইমা এবং ক্লোরেন্‌কাইমা দিয়া গঠিত। কখনও কখনও ইহাদের মধ্যে কোলেন্‌কাইমা ও স্ক্লেরেন্‌কাইমা কলা-ও দেখা যায়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কলাগুলি ত্বকের ঠিক নিচে একটি অথবা কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত থাকিয়া, **অধস্ত্বক্‌** বা **হাইপোডার্মিস** (Hypodermis ; গ্রীক *hypo*=নিচে+*derma*=ত্বক) গঠন করে। এস্থলে অধস্ত্বকের পর হইতে এবং অন্তস্ত্বক্‌ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে **সাধারণ বহিঃস্তর** (General cortex) বলা হয়।

(২) **অন্তস্ত্বক্‌** বা **এণ্ডোডার্মিস** (Endodermis ; গ্রীক *endo*=ভিতরে+*derma*=ত্বক)—বহিঃস্তরের পরবর্তী এক সারি সজীব প্যারেন্‌-কাইমা কোষ-যুক্ত অঞ্চলকে অন্তস্ত্বক্‌ বলে। ইহাদের আকার পিপার মতো। অন্তস্ত্বক্‌ সাধারণতঃ তরঙ্গায়িতভাবে কেন্দ্রস্তম্ভকে ঘিরিয়া রাখে। সূর্যমুখী এবং আরও অনেক কাণ্ডে অন্তস্ত্বকের কোষগুলির মধ্যে শ্বেতসার জমা থাকে। তখন ইহাকে **শ্বেতসার-আবরণ** বা **স্টার্চ সীথ** (Starch sheath) বলা হয়।

(৩) **পরিচক্র বা পেরিসাইক্ল** (Pericycle)—ইহা অন্তস্ত্বকের ঠিক ভিতরের দিকে অবস্থিত এবং সাধারণতঃ কয়েকটি স্তর নিয়া গঠিত। এই অঞ্চলে প্যারেন্‌কাইমা ও স্ক্লেরেন্‌কাইমা কলা দেখা যায়। কুমড়া প্রভৃতির কাণ্ডের পরিচক্র শুধু স্ক্লেরেন্‌কাইমা কলা নিয়া গঠিত এবং ইহা নালিকা বাণ্ডিলকে ঘিরিয়া রাখে। সূর্যমুখী ইত্যাদির পরিচক্র প্যারেন্‌কাইমা ও স্ক্লেরেন্‌-কাইমা কোষের সংমিশ্রণে গঠিত। এস্থলে স্ক্লেরেন্‌কাইমা কলা কয়েক ভাগে
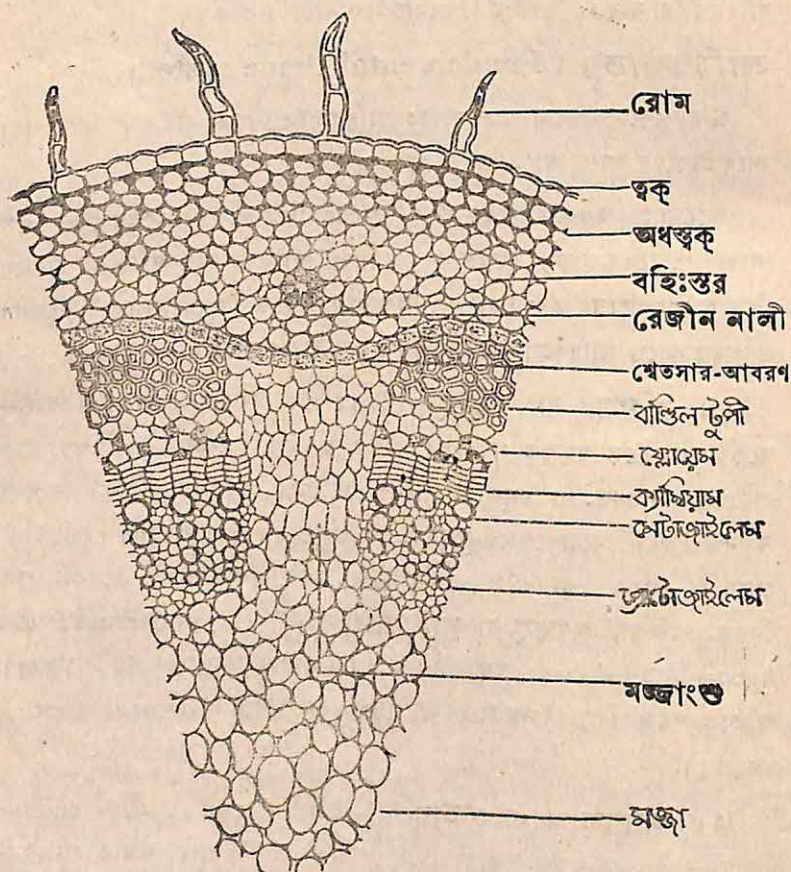
৭১নং চিত্র—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ(সূর্যমুখী)-এর কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)।

বিভাজিত হইয়া যায় এবং এক-এ টি ভাগ এক-একটি নালিকা বাণ্ডিলের শীর্ষে টুপীর মতো থাকে। সেইজন্য, ইহাদের **বাণ্ডিল টুপী** (Bundle cap) বা **ভাস্কুলার টুপী** (Vascular cap) বলা হয়। জলজ উদ্ভিদের কাণ্ডে পরিচক্র থাকে না।

(৪) **মজ্জা, পিথ (Pith) বা মেডুলা (Medulla** ; ল্যাটিন *medulla* = মজ্জা) **এবং মজ্জাংশু (Pith rays, Medullary rays)**—কাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত কলাকে মজ্জা বলে। ইহা অপেক্ষাকৃত বড় আকারের প্যারেন্‌কাইমা অথবা স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষ দিয়া গঠিত। মজ্জায় আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র থাকে। সূর্যমুখী, জবা প্রভৃতি অধিকাংশ উদ্ভিদের কাণ্ডে পরিচক্রের স্ক্লেরেন্‌কাইমা কলা মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন থাকায়, মজ্জার কোষ ঐ অংশের মধ্য দিয়া অন্তস্ত্বক্ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহাদের মজ্জাংশু বলে। মজ্জাংশুর কোষ আকারে ছোট। মজ্জাংশুতে আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র থাকে না।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে বহিঃস্তর, অন্তস্ত্বক্, পরিচক্র এবং মজ্জা—এই চারটি অঞ্চল পৃথক করা যায় না। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ক্লেরেন্‌কাইমা কলা দিয়া গঠিত অধস্ত্বক্ দেখা যায়। অধস্ত্বক্ হইতে কাণ্ডের কেন্দ্র পর্যন্ত সুবিস্তৃত
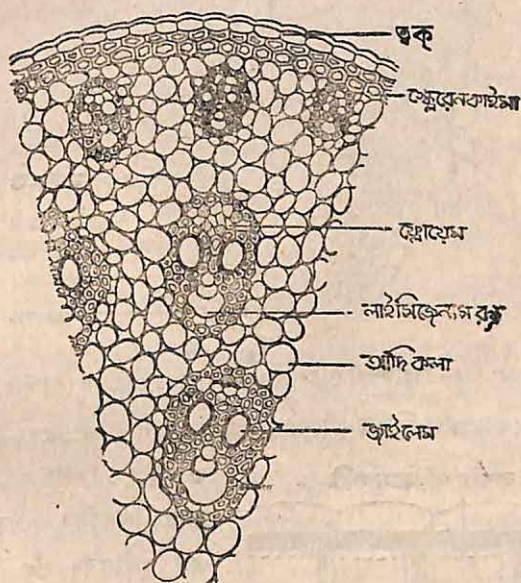
৭২নং চিত্র—একবীজপত্রী উদ্ভিদ(ভুট্টা)-এর কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)।

অঞ্চল শুধু প্যারেন্‌কাইমা কলা দিয়া গঠিত। নালিকা বাণ্ডিলগুলি প্যারেন্‌কাইমা কলার মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকে। এই অঞ্চলকে সাধারণভাবে **আদি-কলা (Ground tissue)** বলা হয়।

বড়পানা, কচুরিপানা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের কাণ্ডে, মজ্জার কোষগুলি

ছিন্ন হইয়া একটি গহ্বর সৃষ্টি করে। ইহাকে **মজ্জা-গহ্বর** (**Pith cavity, Medullary cavity**) বলে।

মূলে : দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের মতো, মূলের আদিকলাতন্ত্র যথারীতি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত। এক্ষেত্রে, অবশ্য, বহিঃস্তরে অধস্ত্বক্ থাকে না। মূলের
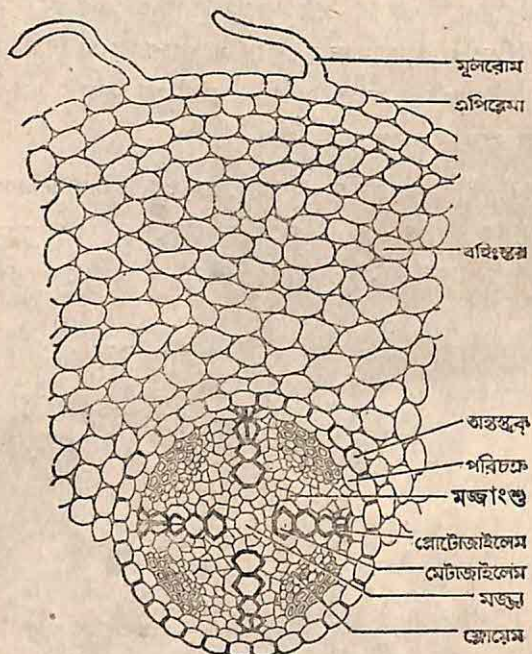
৭৩নং চিত্র—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ(ছোলা)-এর মূলের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)।

অন্তস্ত্বকের কোষগুলি বিশিষ্ট ধরনের। ইহাদের পার্শ্ব-প্রাচীরের ভিতরের গাত্র সুবারিন, কিউটিন এবং সময় সময় লিগ্‌নিন দিয়া স্থূল হয়। এই স্থূলীকরণ শুধু পার্শ্ব-প্রাচীর, অথবা অনেক সময় সমগ্র কোষকে ফিতার মতো ঘিরিয়া রাখে। ফিতার মতো এই স্থূল অংশকে **ক্যাস্‌পেরিয়ান পটি*** (**Casparian strip**) বলা হয়। অন্তস্ত্বকের সমস্ত কোষেই, অবশ্য, ক্যাস্‌পেরিয়ান
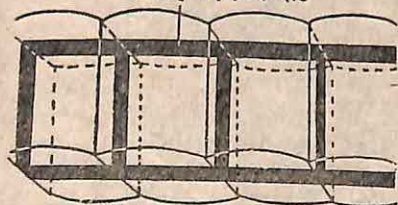
৭৪নং চিত্র—ক্যাস্‌পেরিয়ান পটি (ত্রি-আয়তনিক দৃশ্য)।

* জার্মান বিজ্ঞানী R. Caspary-র নাম অনুসারে।

পটি থাকে না। ইহাদের মাঝে মাঝে সেলুলোজ-নির্মিত, পাতলা প্রাচীর-যুক্ত কতকগুলি কোষ থাকে। ইহাদের **পারণ-কোষ** (**Passage cells**) বলে। মূলের পরিচক্র সাধারণতঃ এক-সারি প্যারেন্‌কাইমা কোষ দিয়া গঠিত। জলজ উদ্ভিদের মূলে পরিচক্র থাকে না। মজ্জা ও মজ্জাংশুর গঠন দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের মতো।

পত্রেঃ দুই ত্বকের মধ্যবর্তী অঞ্চলই পত্রের আদিকলাতন্ত্র। ইহাকে **মেসোফিল স্তর** (**Mesophyll layer**; গ্রীক *mesos*=মধ্যম+*phyllon* =পত্র) বলা হয়। সাধারণতঃ ক্লোরেন্‌কাইমা কলা দিয়া মেসোফিল স্তর গঠিত। দ্বিবীজপত্রী পত্রে দুই ধরনের ক্লোরেন্‌কাইমা কলা দেখা যায়। ঊর্ধ্বত্বকের নিচে ক্লোরেন্‌কাইমা কলার কোষগুলি বেলনাকার। ইহাদের
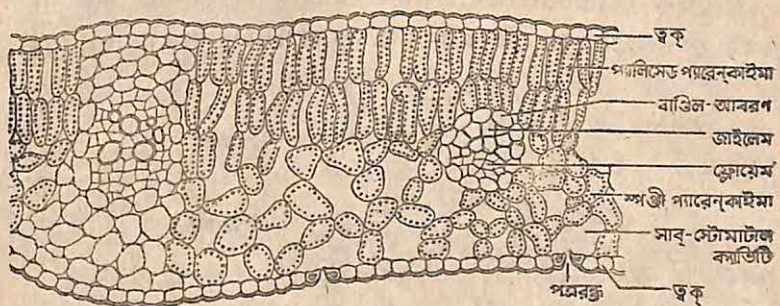
৭৫নং চিত্র—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ (আম)-এর পত্রের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)।

প্যালিসেড প্যারেন্‌কাইমা (**Palisade parenchyma**; ল্যাটিন *palus* =মজ্জা) বলে। কয়েক সারি প্যালিসেড কোষের নিচে অবস্থিত গোল গোল ক্লোরেন্‌কাইমা কোষগুলিকে **স্পঞ্জী প্যারেন্‌কাইমা** (**Spongy parenchyma**) বলে। এই কলায় বড় বড় আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র থাকে। একবীজপত্রী পত্রে এই দুই ধরনের কোষ পৃথক করা যায়।

আদিকলাতন্ত্রের কাজ (**Functions of fundamental tissue system**)—আদিকলাতন্ত্রের কাজ মুখ্যতঃ শারীরবৃত্তীয়। দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে এবং সমস্ত মূলে আদিকলাতন্ত্রের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। নিচে পৃথকভাবে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

বহিঃস্তর (**Cortex**)—ত্বকের মতো বহিঃস্তর-ও উদ্ভিদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। অধস্ত্বক্ সাধারণতঃ কাণ্ডকে ঋজু রাখে। ইহা ছাড়া, খাদ্য-

·সঞ্চয়, সালোকসংশ্লেষ প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজও করে। মূলের বহিঃস্তরে সাধারণতঃ খাদ্য জমা থাকে। মূলের বহিঃস্তর জল-সংবহনেও সাহায্য করে।
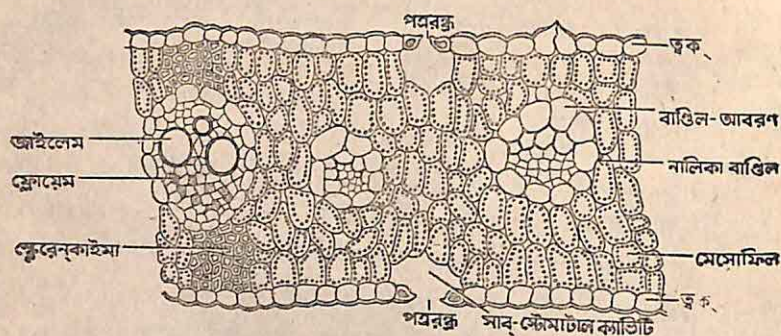
৭৬নং চিত্র—একবীজপত্রী উদ্ভিদ(ভুট্টা)-এর পত্রের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)।

অন্তস্ত্বক্ (Endodermis)—অন্তস্ত্বকের কাজ সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ কেন্দ্রস্তম্ভের কোষগুলিকে জলে সংপৃক্ত রাখা ইহার কাজ। দ্বিবীজপত্রী
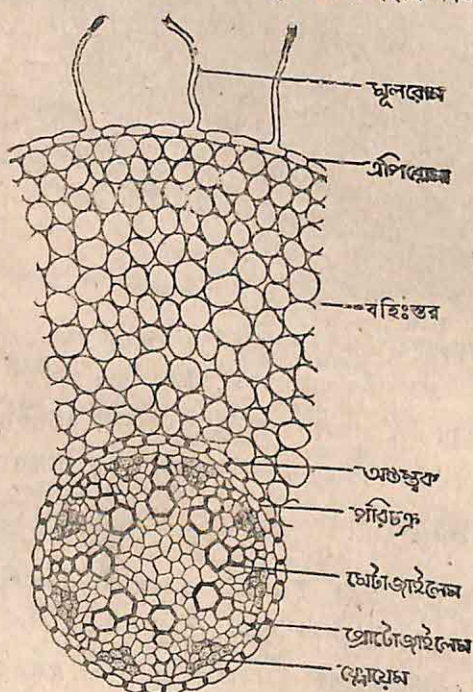
৭৭নং চিত্র—একবীজপত্রী উদ্ভিদ(কচু)-এর মূলের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)।

উদ্ভিদের কাণ্ডে অন্তস্ত্বক অনেক সময় খাদ্য জমা করিয়া রাখে। মূলে, অন্তস্ত্বকের ·পারণ-কোষের মধ্য দিয়া জল বহিঃস্তর হইতে পরের স্তরে প্রবেশ করে।

পরিচক্র (Pericycle)—ইহা খাদ্য সঞ্চয় করে এবং কাণ্ড ও মূলকে সুদৃঢ় রাখে। মূলের পরিচক্র হইতে শাখা-মূল অথবা প্রশাখা-মূল বাহির হয়।

মজ্জা (Pith)—মজ্জার কোষগুলিও খাদ্য সঞ্চয় করে। স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষ দিয়া গঠিত মজ্জা উদ্ভিদ-দেহকে সুদৃঢ় রাখে।

একবীজপত্রী উদ্ভিদে কাণ্ডের আদিকলায় খাদ্য জমা থাকে। ইহার অধস্ত্বক্ কাণ্ডকে ঋজু রাখে।

পত্রের আদিকলাতন্ত্রের কাজ সম্পূর্ণ শারীরবৃত্তীয়। মেসোফিল স্তরে সালোকসংশ্লেষের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত হয়। সালোকসংশ্লেষ ছাড়াও, অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিপাক মেসোফিল কোষগুলিতেই হয়।

সংবহন-কলাতন্ত্র (Vascular tissue system)

আগেই বলা হইয়াছে, জাইলেম ও ফ্লোয়েম উদ্ভিদের সংবহন-কলা (Vascular tissue)। জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যস্ত থাকিয়া, সংবহন-কলাতন্ত্র গঠন করে। ইহাদের একসঙ্গে **নালিকা বাণ্ডিল** (Vascular bundles) বলা হয়। নিচে কাণ্ড, মূল ও পত্রের সংবহন-কলাতন্ত্র বর্ণনা করা হইল।

কাণ্ডে ঃ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে—নালিকা বাণ্ডিল, মজ্জা ও মজ্জাংশু—পরিচক্র দিয়া পরিবেষ্টিত থাকিয়া, **কেন্দ্রস্তম্ভ** বা **স্টিলি** (Stele ; গ্রীক *stele*=স্তম্ভ) গঠন করে। দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে নালিকা বাণ্ডিলগুলির **বলয়-সমাবেশ** (Ringed arrangement) দেখা যায় ; অর্থাৎ, ইহারা বৃত্তের পরিধি-বরাবর বিন্যস্ত থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে, নালিকা বাণ্ডিলগুলির **বিক্ষিপ্ত সমাবেশ** (Scattered arrangement) দেখা যায় ; অর্থাৎ, ইহারা আদিকলায় বিক্ষিপ্তভাবে থাকে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে কেন্দ্রস্তম্ভ থাকে না। দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম ছাড়া, **ক্যাম্‌বিয়াম** (Cambium ; ল্যাটিন *cambium*=পরিবর্তন) নামক পার্শ্বস্থ ভাজক কলা থাকে। একবীজপত্রী কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিলে ক্যাম্‌বিয়াম থাকে না। ক্যাম্‌বিয়াম থাকিলে, নালিকা বাণ্ডিলকে **মুক্ত নালিকা বাণ্ডিল**
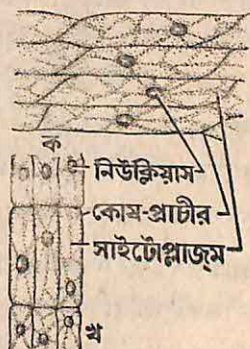
৭৮নং চিত্র—ক্যাম্‌বিয়াম : ক. প্রস্থচ্ছেদ, খ. দীর্ঘচ্ছেদ।

(Open vascular bundle), এবং ক্যাম্‌বিয়াম না থাকিলে, তাহাকে **বদ্ধ নালিকা বাণ্ডিল** (Closed vascular bundle) বলা হয়। ক্যাম্‌বিয়ামের কোষগুলি আয়তাকার এবং পাতলা প্রাচীর-যুক্ত। ক্যাম্‌বিয়ামে আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র থাকে না (৭৮নং চিত্র)।

নালিকা বাণ্ডিলের জাইলেম কলায় দুই ধরনের ট্রাকীয়া থাকে। কতকগুলির ব্যাস কম এবং ইহাদের প্রাচীরে বলয়াকার, সোপানাকার ও সর্পিলাকার—এই তিন রকম স্থূলীকরণ দেখা যায়। ইহাদের **প্রোটোজাইলেম** (Protoxylem) বলে। ইহারা প্রথমে উৎপন্ন হয়। পরে যে সমস্ত ট্রাকীয়া সৃষ্টি হয়, তাহাদের ব্যাস অপেক্ষাকৃত বড় এবং ইহাদের প্রাচীরে জালকাকার ও কূপ-যুক্ত স্থূলীকরণ দেখা যায়। ইহাদের **মেটাজাইলেম** (Metaxylem) বলে। মেটাজাইলেমগুলি পরিধির দিকে এবং প্রোটোজাইলেম কেন্দ্রের দিকে থাকে। মেটাজাইলেম ও প্রোটোজাইলেমের এইরকম বিন্যাস-ব্যবস্থাকে **এণ্ডার্ক** (Endarch) বলা হয়।

প্রধানতঃ জাইলেম, ফ্লোয়েম এবং ক্যাম্‌বিয়ামের অবস্থান ও উপস্থিতির ভিত্তিতে, কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিলকে প্রধান দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **সংযুক্ত বা কন্‌জয়েন্ট** (Conjoint ; ল্যাটিন *com*=একত্রে+*jungere*=যুক্ত)—এক্ষেত্রে নালিকা বাণ্ডিলের জাইলেম ও ফ্লোয়েম কেন্দ্রস্তম্ভের একই ব্যাসার্ধ-বরাবর বিন্যস্ত থাকে। ক্যাম্‌বিয়ামের উপস্থিতি ও অবস্থানের ভিত্তিতে, তিন ধরনের সংযুক্ত নালিকা বাণ্ডিল দেখা যায়।

(ক) **সমপার্শ্বীয় বা কোল্যাটারাল** (Collateral ; ল্যাটিন *cum*=একত্রে+*latus*=পার্শ্বে)—এস্থলে জাইলেম নালিকা বাণ্ডিলের কেন্দ্রের দিকে এবং ফ্লোয়েম পরিধির দিকে থাকে। সমপার্শ্বীয় নালিকা বাণ্ডিলের জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের মাঝখানে ক্যাম্‌বিয়াম থাকিলে, তাহাকে **মুক্ত সমপার্শ্বীয় নালিকা বাণ্ডিল** (Open collateral vascular bundle) বলে। ব্যক্তবীজী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে এইরকম নালিকা বাণ্ডিল দেখা যায়। সমপার্শ্বীয় নালিকা বাণ্ডিলে ক্যাম্‌বিয়াম অনুপস্থিত থাকিলে, তাহাকে **বদ্ধ সমপার্শ্বীয় নালিকা বাণ্ডিল** (Closed collateral vascular bundle) বলা হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে এইরকম নালিকা বাণ্ডিল পাওয়া যায়।

(খ) **সমদ্বিপার্শ্বীয় বা বাইকোল্যাটারাল** (Bicollateral ; ল্যাটিন *bis*=দুই+*cum*=একত্রে+*latus*=পার্শ্বে)—কুমড়া, লাউ ইত্যাদি কতকগুলি

কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিলে জাইলেম কলার দুই পাশেই ক্রমান্বয়ে ক্যাম্বিয়াম ও ফ্লোয়েম কলা থাকে। এই ধরনের বাণ্ডিলকে **সমদ্বিপার্শ্বীয় নালিকা বাণ্ডিল (Bicollateral vascular bundle)** বলা হয়। বলা বাহুল্য, সমদ্বিপার্শ্বীয় বাণ্ডিল-মাত্রেই মুক্ত শ্রেণীর।
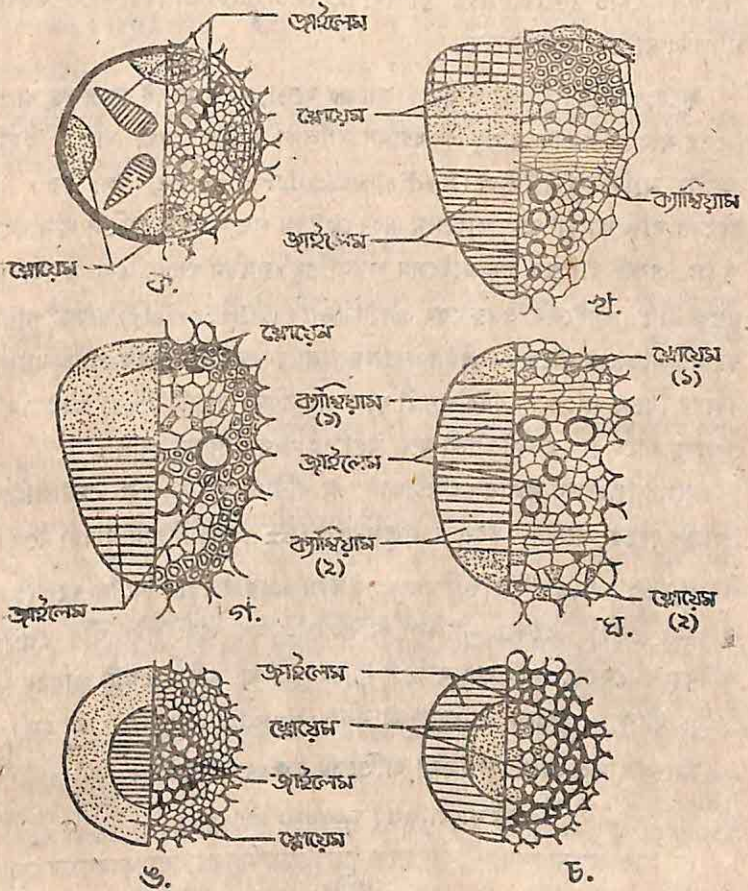
৭৯নং চিত্র—মূল ও কাণ্ডের বিভিন্ন ধরনের নালিকা বাণ্ডিল : ক. অরীয়, খ. মুক্ত সমপার্শ্বীয়, গ. বদ্ধ সমপার্শ্বীয়, ঘ. সমদ্বিপার্শ্বীয়, ঙ. হ্যাড্রো-কেন্দ্রীয়, চ. লেপ্‌টো-কেন্দ্রীয়।

(গ) কেন্দ্রীয় বা কন্‌সেন্‌ট্রিক (Concentric ; গ্রীক *kentron*=বিন্দু) —এইরকম নালিকা বাণ্ডিলে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম একে অন্যকে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া রাখে। এক্ষেত্রে ক্যাম্বিয়াম থাকে না। ইহা আবার দুই রকম—

(অ) হ্যাড্রো-কেন্দ্রীয় বা হ্যাড্রোসেন্‌ট্রিক (Hadrocentric ; গ্রীক

hadros=পুরু+*kentron*=বিন্দু)—এক্ষেত্রে জাইলেম, ফ্লোয়েম দিয়া ঘেরা থাকে। অধিকাংশ টেরিডোফাইটার কাণ্ডে এইরকম নালিকা বাণ্ডিল দেখা যায়।

(আ) **লেপ্‌টো-কেন্দ্রীয় বা লেপ্‌টোসেন্‌ট্রিক (Leptocentric**; গ্রীক *leptos*=পাতলা+*kentron*=বিন্দু)—এস্থলে ফ্লোয়েম, জাইলেম দিয়া ঘেরা থাকে। বোচ (*Acrorus*), ড্রাসিনা (*Dracaena*) ইত্যাদির কাণ্ডে এইরকম নালিকা বাণ্ডিল পাওয়া যায়।

মূলে ঃ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের মতো, সমস্ত মূলেই কেন্দ্রস্তম্ভ থাকে। মূলের সংবহন-কলাতন্ত্রে শুধু একধরনের নালিকা বাণ্ডিল দেখা যায়। ইহাকে **অরীয় নালিকা বাণ্ডিল (Radial vascular bundle)** বলা হয়। এই ধরনের নালিকা বাণ্ডিলে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম পৃথক পৃথক বাণ্ডিল গঠন করে; অর্থাৎ, একটি বাণ্ডিলে শুধু জাইলেম অথবা শুধু ফ্লোয়েম থাকে, এবং ক্যাম্‌বিয়াম থাকে না। জাইলেম ও ফ্লোয়েম একান্তরভাবে (Alternately) বৃত্তের পরিধি-বরাবর সাজানো থাকে। এই দুই রকম কলা কেন্দ্রস্তম্ভের পৃথক পৃথক ব্যাসার্ধ-বরাবর বিন্যস্ত থাকে। দ্বিবীজপত্রী মূলে সাধারণতঃ পাঁচটি করিয়া জাইলেম ও ফ্লোয়েম থাকে। একবীজপত্রী মূলে ইহাদের সংখ্যা পাঁচের বেশি।

মূলের জাইলেম কলায় প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে এবং মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে থাকে। ইহাকে **এক্‌সার্ক (Exarch)** বিন্যাস-ব্যবস্থা বলে।

পত্রে ঃ পত্রের শিরাগুলি সংবহন-কলাতন্ত্রের অবস্থান নির্দেশ করে (৭৫নং ও ৭৬নং চিত্র)। এক্ষেত্রে নালিকা বাণ্ডিলগুলি বদ্ধ এবং সমপার্শ্বীয় শ্রেণীর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, নালিকা বাণ্ডিল প্যারেন্‌কাইমা-নির্মিত একটি আবরণ দিয়া বেষ্টিত থাকে। ইহাকে **বাণ্ডিল-আবরণ (Bundle sheath)** বলা হয়।

নিচে বিভিন্ন ধরনের নালিকা বাণ্ডিলের ছক্‌ দেওয়া হইল।
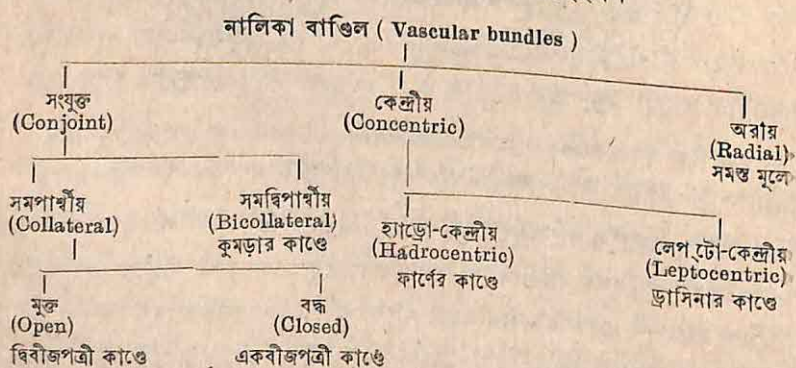
সংবহন-কলাতন্ত্রের কাজ (Functions of vascular tissue system)—সংবহন-কলাতন্ত্রের কাজ প্রধানতঃ শারীরবৃত্তীয়। জাইলেম কলার মধ্য দিয়া জল ও অজৈব লবণের দ্রবণ উদ্ভিদের পত্রে এবং অন্যান্য সবুজ অংশে সংবাহিত হয়। পত্রে উৎপন্ন খাদ্য ফ্লোয়েম কলার মধ্য দিয়া উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হয়। ইহা ছাড়া, সংবহন-কলায় ক্যাম্‌বিয়াম থাকায়, উদ্ভিদ পরিধিতে বাড়ে।

শারীরবৃত্তীয় কাজ ছাড়াও, জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা উদ্ভিদ-দেহকে ঋজু রাখিতে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

১। কলার সংজ্ঞা লেখ। তোমার পঠিত বিভিন্ন ধরনের কলা উল্লেখ করিয়া, উহাদের কাজ বর্ণনা কর। [H. S. 1962]

Define tissue. Mention the different forms of tissue you have studied and state their functions.

২। সরল কলা কাহাকে বলে? বিভিন্ন রকম সরল কলা বর্ণনা কর। উদ্ভিদের কোন কোন অংশে ভাজক কলা থাকে? [H. S. 1970 (Comp.)]

What is simple tissue? Describe different kinds of simple tissue. In which parts of a plant are meristematic tissues located?

৩। চিত্রসহ ভাজক কলার বর্ণনা দাও এবং উহার কাজ উল্লেখ কর। (ক) অবস্থান এবং (খ) উৎপত্তির সময় অনুযায়ী, ভাজক কলার শ্রেণী-বিভাগ কর। [H. S. 1964 (Comp.)]

With figure, describe a meristematic tissue and mention its functions. Classify meristematic tissue according to (*a*) position and (*b*) time of origin.

৪। তিনটি স্থায়ী কলা এবং একটি ভাজক কলার নাম উল্লেখ কর এবং বর্ণনা দাও। [H. S. 1966 (Comp.)]

Name and describe three permanent tissues and one meristematic tissue.

৫। কোন কলা কাণ্ডের জল-সংবহনের জন্য দায়ী? ঐ কলার বিভিন্ন উপাদান অঙ্কন কর এবং বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [H. S. 1961 (Comp.)]

What tissue is responsible for conduction of water in stem? Draw and mention the features of the different elements composing this tissue.

৬। "উদ্ভিদে এককদের মধ্যে সুস্পষ্ট শ্রম-বিভাগ বর্তমান"—উক্তিটির যাথার্থ্য নিরূপণ কর।

"In plant, there is a marked division of labour among the units"—justify.

৭। পত্ররন্ধ্র কাহাকে বলে? পত্ররন্ধ্রের গঠন, প্রাপ্তিস্থান এবং কাজ বর্ণনা কর।

What are stomata? Describe the structure, occurrence and functions of stomata.

৮। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের আদিকলাতন্ত্র বিশদভাবে বর্ণনা কর। একবীজপত্রী কাণ্ডের আদিকলাতন্ত্রের সঙ্গে ইহার পার্থক্য কি?

Describe the fundamental tissue system in a dicotyledonous stem, in details. How it differs from that of a monocotyledonous stem?

৯। কাণ্ডের সংবহন-কলাতন্ত্র বর্ণনা কর। উদ্ভিদের সংবহন-কলাতন্ত্র কি কি প্রধান কাজ করে ?

Describe the vascular tissue system in stems. What are the main functions of the vascular tissue system in plants ?

১০। চিত্র এবং উদাহরণ-সহ উদ্ভিদের বিভিন্ন রকম নালিকা বাণ্ডিল বর্ণনা কর।

With the help of diagrams and examples, describe the different types of vascular bundle found in plants.

১১। চিহ্নিত চিত্রসহ আদর্শ দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিলের সঙ্গে একবীজপত্রী কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিলের তুলনা কর। চিত্রে বিভিন্ন ধরনের কলা নির্দেশ কর এবং উহাদের প্রত্যেকের কাজ উল্লেখ কর। [H. S. 1968 (Comp.)]

Compare the structure of the vascular bundle of a typical dicotyledonous stem with that of a monocotyledonous stem. Illustrate them with labelled sketches. Indicate in the drawings the different kinds of tissue present and mention their respective functions.

১২। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে উদ্ভিদের কোনও একটি অঙ্গের প্রস্থচ্ছেদ দেওয়া আছে। কি করিয়া বলিবে—প্রস্থচ্ছেদটি কাণ্ডের, মূলের অথবা পত্রের ? তোমার উক্তির যাথার্থ্য নিরূপণ কর।

You are supplied with a transverse section of a plant-organ under the microscope. How can you say whether the section is of a stem, root or of a leaf ? Justify your statement.

১৩। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কচি মূলের প্রস্থচ্ছেদ যেমন দেখা যায়, তাহা অঙ্কন কর এবং বিভিন্ন কলা চিহ্নিত করিয়া উহাদের প্রত্যেকের কাজ বর্ণনা কর। [H. S. 1968]

Draw the microscopical features of a young root as seen from a transverse section. Label the different tissues and state their functions.

১৪। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) ভাজক কলা [H. S. 1969 (Comp.) ; *cp.* 1972, 1968, 1960] ; (খ) স্থায়ী কলা ; (গ) প্যারেন্‌কাইমা ; (ঘ) আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র [H. S. 1969 (Comp.) ; (ঙ) কোলেন্‌কাইমা [H. S. 1971 (Comp.), 1965, 1964 (Comp.), 1963 (Comp.) ; *cp.* 1960] ; (চ) স্ক্লেরেন্‌কাইমা [H. S. 1971, 1965 (Comp.), 1963] ; (ছ) জাইলেম [H. S. 1972, 1963 Comp.)] ; (জ) ট্রাকীয়া [*cp.* 1969 (Comp.)] ; (ঝ) ফ্লোয়েম [H. S. 1969, 1961] ; (ঞ) সীভ নল [H. S. 1972, 1970 (Comp.) ; (ট) সঙ্গী কোষ ; (ঠ) ক্ষীরকলা [*cp.* H. S. 1967] ; (ড) এপিব্লেমা ; (ঢ) মূলরোম [H. S. 1969 (Comp.), 1968 ; *cp.* 1960] ; (ণ) ত্বক [H. S. 1963] ; (ত) পত্ররন্ধ্র [H. S. 1972, 1970 (Comp.), 1969, 1967 (Comp.), 1962 ; *cp.* 1961 (Comp.)] ; (থ) রক্ষী কোষ [H. S. 1968 (Comp.)] ; (দ) অধস্ত্বক [H. S. 1961 (Comp.)] ; (ধ) অন্তস্ত্বক [H. S. 1963 (Comp.), 1962, (Comp.), 1961] ; (ন) পরিচক্র ; (প) প্যালিসেড প্যারেন্‌কাইমা [*cp.* H. S. 1970 (Comp.), 1968] ; (ফ) নালিকা বাণ্ডিল ; (ব) ক্যাম্বিয়াম [H. S. 1969. 1968, 1966, 1965, 1961]।

Write short notes on :—

(*a*) Meristem ; (*b*) Permanent tissue ; (*c*) Parenchyma ; (*d*) Intercellular spaces ; (*e*) Collenchyma ; (*f*) Sclerenchyma ; (*g*) Xylem ; (*h*) Trachea ; (*i*) Phloem ; (*j*) Sieve tube ; (*k*) Companion cell ; (*l*) Laticiferous tissue ; (*m*) Epiblema ; (*n*) Root hair ; (*o*) Epidermis ; (*p*) Stomata ; (*q*) Guard cells ; (*r*) Hypodermis ; (*s*) Endodermis ; (*t*) Pericycle ; (*u*) Palisade parenchyma ; (*v*) Vascular bundles ; (*w*) Cambium.

প্রদর্শন ও পরীক্ষা
(Demonstration and Experiment)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। পাঠ্য-বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া, এই পরিচ্ছেদে আরও কয়েকটি প্রদর্শন ও পরীক্ষা বর্ণনা করা হইল।

প্রোটোপ্লাজ্‌মের চলন (Movements of protoplasm)

(১) **একমুখী আবর্তন** (Rotation)—পাতাশেওলার একটি জীবিত পত্রের উপর হইতে সাবধানে কিছুটা চাঁচিয়া নেওয়া হইল। একটি পরিষ্কার স্লাইডে এক ফোঁটা জল নিয়া, উহাতে চাঁচা অংশটি রাখিয়া, একটি আবরণী কাচ দিয়া উহাকে ঢাকিয়া, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হইল। দেখা গেল, নিউক্লিয়াসটি কোষ-প্রাচীরের ধার ঘেঁষিয়া ঘুরিতেছে। উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন অভিলক্ষ্যে ইহা আরও ভালো করিয়া দেখা গেল।

(২) **বহুমুখী আবর্তন** (Circulation)—জটাকান্‌শিরার কুঁড়ি হইতে একটি পুংকেশর সাবধানে বাহির করা হইল। চিম্‌টা দিয়া পুংকেশরের পরাগধানীটি কাটিয়া ফেলিয়া, শুধু পুংদণ্ডটি স্লাইডের উপর রাখিয়া, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে, পুংকেশরীয় রোমের কোষে বহুমুখী আবর্তন দেখা গেল।

প্রোটোপ্লাজ্‌মের পরীক্ষা (Tests for protoplasm)

(১) পিঁয়াজের রসালো শল্কপত্র হইতে ত্বকটি বাহির করিয়া নেওয়া হইল। একটি পরিষ্কার স্লাইডে এক টুক্‌রা ত্বক্ রাখিয়া, উহাতে এক ফোঁটা আয়োডিনের লঘু জলীয় দ্রবণ দিয়া, কিছুক্ষণ রাখিয়া দেওয়া হইল। পরে, কয়েক ফোঁটা পাতিত জল দিয়া আয়োডিন দ্রবণের অতিরিক্ত অংশ ধুইয়া, ত্বকটিকে আবরণী কাচ দিয়া ঢাকিয়া, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হইল। দেখা গেল, প্রোটোপ্লাজ্‌ম বাদামী হইয়া গিয়াছে।

(২) একইরকম একটি পরীক্ষায়, আয়োডিন দ্রবণের পরিবর্তে মার্‌কিউরিক নাইট্রেট দ্রবণ (Mercuric nitrate solution) দিয়া, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে

পরীক্ষা করা হইল। দেখা গেল, প্রোটোপ্লাজ্‌মের রঙ ইটের মতো লাল হইয়া গিয়াছে।

কার্বোহাইড্রেটের পরীক্ষা (Tests for carbohydrates)

(১) **দ্রাক্ষাশর্করা** (Glucose)—একটি পরীক্ষণ-নলে অল্প আঙুরের রস নিয়া, উহাতে সম-পরিমাণ ক্ষারীয় কপার সাল্‌ফেট দ্রবণ (Alkaline copper sulphate solution), অর্থাৎ কপার সাল্‌ফেট দ্রবণ ও কষ্টিক পটাশ দ্রবণের মিশ্রণ ঢালা হইল। ইহার পর বার্নারের উপর পরীক্ষণ-নলটিকে উত্তপ্ত করা হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, পরীক্ষণ-নলের তলায় লাল রঙের অধঃক্ষেপ জমিয়াছে।

(২) **ইক্ষুশর্করা** (Sucrose)—একটি পরীক্ষণ-নলে অল্প ইক্ষুশর্করার দ্রবণ নিয়া, দ্রাক্ষাশর্করার উপরোক্ত পরীক্ষাটি করা হইল। কোনও অধঃক্ষেপ দেখা গেল না। আর একটি পরীক্ষণ-নলে অল্প ইক্ষুশর্করা দ্রবণ নিয়া, উহাতে কয়েক ফোঁটা সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড(Sulphuric acid)-এর লঘু দ্রবণ দিয়া কিছুক্ষণ উত্তপ্ত করা হইল। পরে ঠাণ্ডা করিয়া, দ্রাক্ষাশর্করার পরীক্ষাটি করা হইল। তখন পরীক্ষণ-নলের তলায় লাল রঙের অধঃক্ষেপ দেখা গেল।

(৩) **শ্বেতসার** (Starch)—একটি গোল-আলুর খোসা ছাড়াইয়া, ছুরির সাহায্যে উহার অল্প কিছু অংশ চাঁচিয়া নেওয়া হইল এবং চাঁচা অংশটি স্লাইডের উপরে রাখা হইল। উহাতে এক ফোঁটা আয়োডিনের লঘু জলীয় দ্রবণ দিয়া, আবরণী কাচ চাঁপা দেওয়া হইল এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হইল। দেখা গেল, শ্বেতসার-কণাগুলি গাঢ় নীল হইয়া গিয়াছে। উচ্চ-শক্তি-সম্পন্ন অভিলক্ষ্যে শ্বেতসার-কণার স্তরগুলি পরিষ্কারভাবে দেখা গেল।

(৪) **সেলুলোজ** (Cellulose)—১৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরীক্ষার মতো, এক টুক্‌রা পিঁয়াজের ত্বক্ একটি পরিষ্কার স্লাইডের উপর রাখা হইল। উহাতে কয়েক ফোঁটা ক্লোরো-জিঙ্ক্‌-আয়োডিন(Chloro-zinc-iodine)-এর জলীয় দ্রবণ দেওয়া হইল। পরে পাতিত জলে অতিরিক্ত ক্লোরো-জিঙ্ক্‌-আয়োডিন দ্রবণ ধুইয়া, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হইল। দেখা গেল, সেলুলোজ-নির্মিত কোষ-প্রাচীর নীল রঙ ধারণ করিয়াছে।

প্রোটীনের পরীক্ষা (Test for protein)

অ্যালিউরোন কণা (Aleurone grain)—রেড়ি-বীজের সস্যের কয়েকটি প্রস্থচ্ছেদ কাটিয়া, একটি সূক্ষ্ম ছেদ কিছুক্ষণ ৯০% কোহলে ভিজাইয়া,

পরে গাঢ় আয়োডিন দ্রবণে ভিজানো হইল। একটি পরিষ্কার স্লাইডে এক ফোঁটা ৫% গ্লিসারিন দ্রবণ দিয়া, উহার মধ্যে ছেদটি রাখিয়া, আবরণী কাচ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা গেল, অ্যালিউরোন কণার ক্রিস্টালয়েড দানাগুলি গাঢ় বাদামী রঙ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু গ্লোবয়েড দানাগুলিতে কোনও রঙ ধরে নাই।

স্নেহদ্রব্য ও তৈলের পরীক্ষা (Tests for fats and oils)

(১) রেড়ি-বীজের সস্যের কয়েকটি প্রস্থচ্ছেদ কাটা হইল। একটি সূক্ষ্ম ছেদ ১% অস্মিক অ্যাসিড (Osmic acid) দ্রবণে কয়েক সেকেণ্ড ডুবাইয়া, পরে স্লাইডে এক ফোঁটা জল নিয়া, ছেদটিকে উহার মধ্যে রাখা হইল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা গেল, ছেদটি কালো হইয়া গিয়াছে।

(২) একটি রেড়ি-বীজের সস্যকে চিম্‌টার সাহায্যে বার্নারের শিখার উপর ধরিলে, সস্যটি জ্বলিয়া যাইতে দেখা গেল।

(৩) উপরে বর্ণিত উপায়ে একটি রেড়ি-বীজের সস্যকে সামান্য উত্তপ্ত করিয়া, ঐ উত্তপ্ত সস্যটি কাগজের উপর জোরে ঘষিয়া দিলে, কাগজে ঈষদচ্ছ দাগ হইয়া গেল।

লিগ্‌নিনের পরীক্ষা (Test for lignin)

ধান গাছের তৃণকাণ্ডের কয়েকটি প্রস্থচ্ছেদ করা হইল। একটিকে স্লাইডের উপর রাখিয়া, উহাতে কয়েক ফোঁটা অম্ল-যুক্ত অ্যানিলিন সাল্‌ফেট (Acid aniline sulphate) দ্রবণ দেওয়া হইল এবং আবরণী কাচ দিয়া ঢাকিয়া, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হইল। দেখা গেল, অধস্ত্বকের স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষগুলির লিগ্‌নিন-যুক্ত প্রাচীর হলুদ হইয়া গিয়াছে।

সিস্টোলিথের পরীক্ষা (Test for cystolith)

বটপাতার একটি সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ যথারীতি স্লাইডের উপর রাখিয়া, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হইল। ঊর্ধ্বত্বকের কয়েকটি বড় বড় কোষের মধ্যে সবৃন্তক আঙুরের গুচ্ছের মতো সিস্টোলিথ দেখা গেল।

আবরণী কাচটি ধীরে ধীরে তুলিয়া, প্রস্থচ্ছেদের উপর কয়েক ফোঁটা লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric acid) দেওয়া হইল। প্রস্থচ্ছেদের উপর বুদ্‌বুদ দেখা গেল। প্রস্থচ্ছেদটি পাতিত জলে ধুইয়া, আবার অণুবীক্ষণ

যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হইল। আঙুরের গুচ্ছের মতো সিস্টোলিথ দেখা গেল না, কিন্তু উহার শুধু বোঁটাটি দেখা গেল।

র‍্যাফাইডের পরীক্ষা (Test for raphide)

কচুপাতার বৃন্তের একটি সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হইল। এয়ারেন্‌কাইমা কোষের মধ্যে সুচের মতো এবং তারকাকার র‍্যাফাইড দেখা গেল।

সিস্টোলিথের পরীক্ষার মতো, আবরণী কাচটি সরাইয়া ছেদের উপর কয়েক ফোঁটা লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়া হইল। পরে, পাতিত জলে ছেদটি ভালো করিয়া ধুইয়া, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আবার পরীক্ষা করা হইল। র‍্যাফাইড কেলাস আর দেখা গেল না।

প্রাণি-বিজ্ঞান
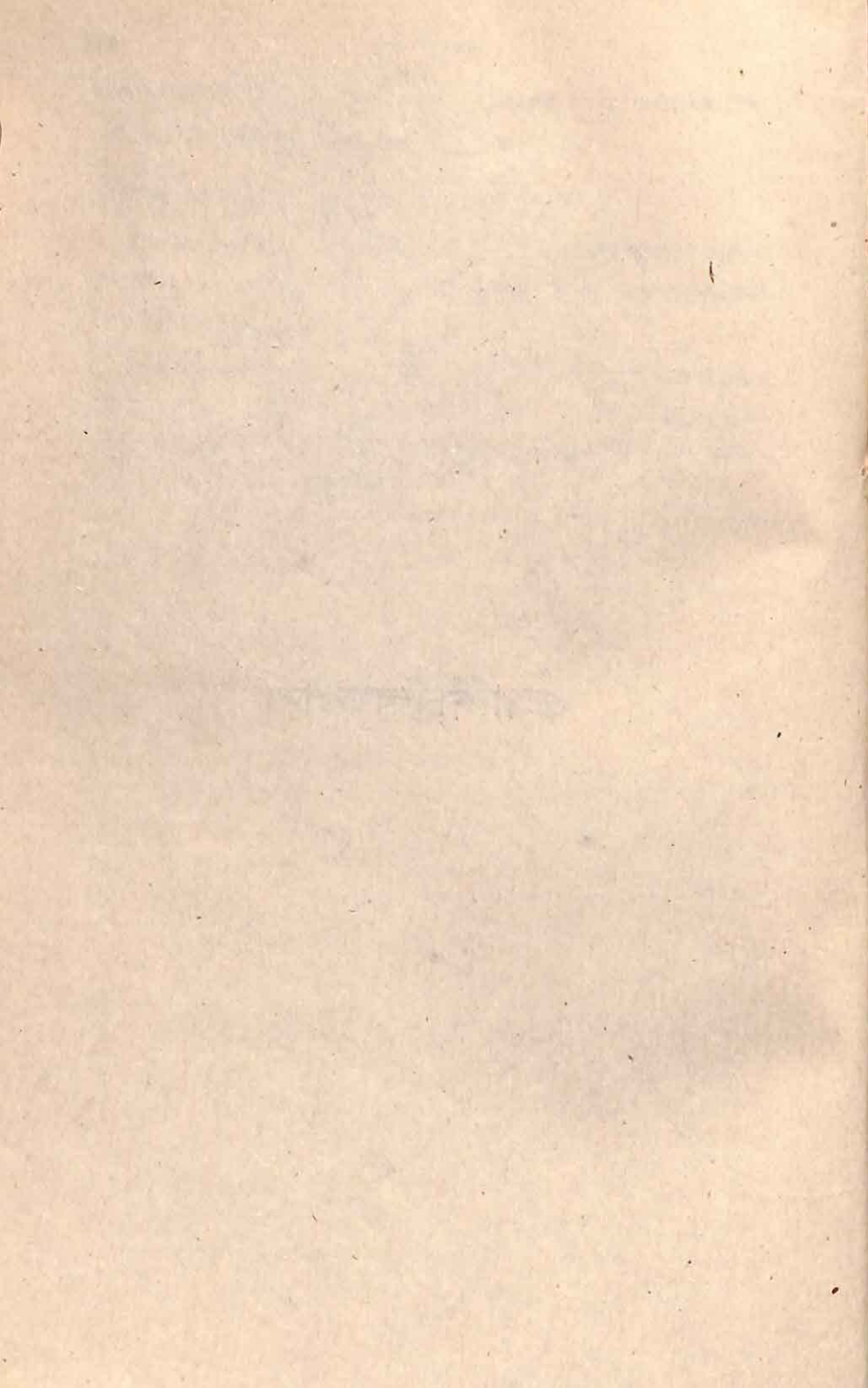
প্রাণি-রাজ্যের সাধারণ পরিচিতি
(A general survey of Animal Kingdom)

উদ্ভিদের মতো প্রাণীও নানা ধরনের। বর্তমানে প্রায় দশ লক্ষ রকমের প্রাণী জানা আছে। প্রতি বছর নূতন নূতন প্রাণী আবিষ্কৃত হওয়ায়, এই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। যে সমস্ত প্রাণী অতীত যুগে পৃথিবীতে বসবাস করিত—জীবাশ্ম হইতে যাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়।

বিশাল এই প্রাণি-রাজ্য যেমন চমকপ্রদ, তেমনি বৈচিত্র্যময়! বৈচিত্র্য ইহাদের গঠনে বসতি-নির্বাচনে, চলাফেরায়, খাদ্য-গ্রহণে, জনন-প্রক্রিয়ায়। প্রতিটি প্রাণীই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অন্য প্রাণী হইতে ভিন্ন। কেহ বা আকারে বৃহৎ; আবার কেহ বা এত ছোট যে, খালি চোখে দেখা যায় না। জলের গভীরে, স্থলের প্রায় সর্বত্র, এমন কি বায়ুতেও, প্রাণীদের দেখা মেলে। কেহ বা দেহকে গড়াইয়া অতি ধীর গতিতে চলাফেরা করে, আবার কাহারও গতি অতি দ্রুত। বায়ুতে ডানা মেলিয়া পাখি স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়ায়, আবার অতল জলে যাহাদের বাস, তাহারা সাঁতার কাটিয়া সহজে জলের ভিতর চলাফেরা করিয়া থাকে। স্পঞ্জ্-জাতীয় প্রাণীরা, অবশ্য, জীবনের অধিকাংশ সময়ই উদ্ভিদের মতো এক জায়গায় থাকে। ইউগ্লিনা (*Euglena*) প্রভৃতি প্রাণী ক্লোরোফিলের সাহায্যে উদ্ভিদের মতো খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে; কৃমি-জাতীয় প্রাণীরা অন্য প্রাণীদের দেহের মধ্যে থাকিয়া খাদ্যরস শোষণ করে। গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীরা শাকাশী; ঘাস, লতাপাতা প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। আবার বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণীরা মাংসভোজী। ইহারা অন্য প্রাণী শিকার করিয়া তাহাদের মাংস খায়। কতকগুলি প্রাণী দিনে কয়েক হাজার পর্যন্ত ডিম পাড়ে; অপরপক্ষে, হাতি বেশ কয়েক বছর অন্তর একটি বাচ্চা প্রসব করে। কোনও কোনও প্রাণীর জীবনকাল মাত্র কয়েক ঘণ্টা। আবার বছরের পর বছর বাঁচিয়া থাকে এমন প্রাণীও অনেক আছে।

প্রায় অগণিত প্রাণীদের প্রত্যেকের বিষয়ে পৃথকভাবে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। প্রাণি-বিজ্ঞানীরা প্রাণি-রাজ্য সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞানলাভের জন্য প্রাণীদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই বিভাগ করা হয়। প্রাণি-দেহের প্রতিসাম্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পরের অনুচ্ছেদে প্রাণি-দেহের প্রতিসাম্য এবং আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করা হইল।

প্রাণি-দেহের প্রতিসাম্য
(Symmetry of animal body)

কোনও সাধারণ মাছের, যেমন রুই মাছের, দেহের মধ্য দিয়া লেজ হইতে মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত কাল্পনিক সরলরেখা-বরাবর অবস্থিত অক্ষকে **অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ** বা **লন্‌জিট্যুডিন্যাল অ্যাক্সিস** (Longitudinal axis) বলে। অনুদৈর্ঘ্য অক্ষের মধ্য দিয়া পিঠ হইতে পেটের দিকে (অর্থাৎ উল্লম্বভাবে) কাটিলে, মাছটির দেহ দুইটি সমান অর্ধাংশে বিভক্ত হয়। এইরকম প্রাণীকে **দ্বিপার্শ্বীয়-ভাবে প্রতিসম** বা **বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল** (Bilaterally symmetrical) প্রাণী বলা হয়। প্রাণি-দেহের এই প্রতিসাম্যকে **দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য** বা **বাইল্যাটারাল সিমেট্রি** (Bilateral symmetry) বলে। অধিকাংশ প্রাণি-দেহের প্রতিসাম্য এই ধরনের। গমনের সময় দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম প্রাণীদের দেহের যে দিক গতিপথের দিকে অগ্রসর হয়, তাহাকে **অগ্র-প্রান্ত** বা **অ্যান্‌টিরিঅর এন্‌ড** (Anterior end) এবং উহার বিপরীত দিককে **পশ্চাৎ-প্রান্ত** বা **পোস্‌টিরিঅর এন্‌ড** (Posterior end) বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ধরনের প্রাণীদের দেহের যে দিক উপরের দিকে থাকে, তাহাকে **পৃষ্ঠতল** বা **ডর্‌সাল সার্‌ফেস** (Dorsal surface) এবং উহার বিপরীত দিককে **অঙ্কতল** বা **ভেন্‌ট্রাল সার্‌ফেস** (Ventral surface) বলে। অনুদৈর্ঘ্য অক্ষের মধ্য দিয়া কোনও উল্লম্ব তল (Vertical plane) কল্পনা করা হইলে, ঐ তলকে **মধ্যতল**, **মিডিয়ান প্লেন** (Median plane) বা **স্যাজিট্যাল প্লেন** (Sagittal plane) বলে। অনুদৈর্ঘ্য অক্ষের মধ্য দিয়া কোনও অনুভূমিক তল (Horizontal plane) কল্পনা করিলে, ঐ তলকে **ফ্রন্‌টাল প্লেন** (Frontal plane) বলে। আবার, অনুদৈর্ঘ্য অক্ষের সমকোণে অবস্থিত উল্লম্ব তলকে **অনুপ্রস্থ তল** বা **ট্রান্‌স্‌ভার্‌স প্লেন** (Transverse plane) বলা হয়।

কোনও কোনও প্রাণীকে অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ-বরাবর যে-কোনও তলে কাটিলে, কর্তিত অংশ দুইটি পরস্পরের সমান হয়। এই ধরনের প্রাণীকে **অরীয়ভাবে প্রতিসম** বা **রেডিঅ্যালি সিমেট্রিক্যাল (Radially symmetrical)** প্রাণী এবং এইরকম প্রতিসাম্যকে **অরীয় প্রতিসাম্য** বা **রেডিঅ্যাল সিমেট্রি (Radial symmetry)** বলা হয়। অরীয়ভাবে প্রতিসম প্রাণীদের অগ্রপ্রান্ত ও পশ্চাৎ-প্রান্ত বলিয়া কিছু নাই। ইহাদের যে প্রান্তে মুখ থাকে, তাহাকে **মুখপ্রান্ত** বা **ওর‍্যাল এন্ড (Oral end)** এবং তাহার বিপরীত প্রান্তকে **পরাঙ্মুখপ্রান্ত** বা **অ্যাব্‌ওর‍্যাল এন্ড (Aboral end)** বলা হয়। একনালীদেহী ও কণ্টকত্বক্ প্রাণীরা (পরে দ্রষ্টব্য) অরীয়ভাবে প্রতিসম।

কোনও প্রাণীকে অনুপ্রস্থ তলে ছেদ (Section) করিলে, এই ছেদকে প্রাণীর **প্রস্থচ্ছেদ, ট্রান্স্‌ভার্স সেক্‌শান (Transverse section)** বা **ক্রস সেক্‌শান (Cross section)** বলা হয়।
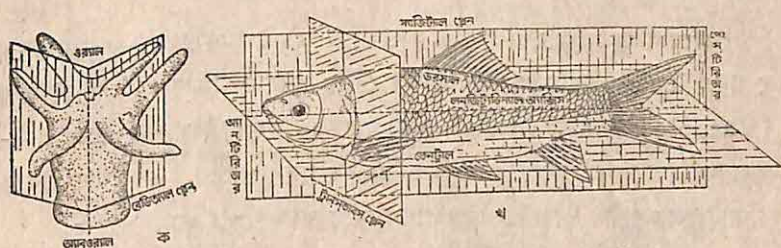
৮০নং চিত্র—প্রাণি-দেহের প্রতিসাম্য : ক. অরীয় প্রতিসাম্য (হাইড্রা), খ. দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য (রুই)।

আবার, প্রাণীকে অনুদৈর্ঘ্য অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল করিয়া কাটিলে, প্রাণীর **দীর্ঘচ্ছেদ** বা **লন্‌জিটিউডিন্যাল সেক্‌শান (Longitudinal section)** পাওয়া যায়। দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম প্রাণীর দীর্ঘচ্ছেদ দুই রকমের। যেমন —**স্যাজিট্যাল সেক্‌শান (Sagittal section)** বা **মিডিয়ান সেক্‌শান (Median section)**; অর্থাৎ, মধ্যতলের সঙ্গে সমান্তরাল দীর্ঘচ্ছেদ এবং **ফ্রন্টাল সেক্‌শান (Frontal section)**; অর্থাৎ, ফ্রন্টাল তলের সঙ্গে সমান্তরাল দীর্ঘচ্ছেদ।

প্রাণি-রাজ্যের পূর্বোক্ত এক-একটি ভাগকে **পর্ব** বা **ফাইলাম (Phylum**; গ্রীক *phylon*=বংশ) বলে। কোনও পর্বের বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য থাকিলেও, উহাদের মধ্যে সাদৃশ্যও প্রচুর। প্রাণি-বিজ্ঞানীরা এই

পর্বগুলিকে অভিব্যক্তি(Evolution)-র ক্রমানুসারে সাজাইয়াছেন। নিচে বিভিন্ন পর্বের প্রাণীদের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া হইল।

পর্ব আদ্যপ্রাণী বা ফাইলাম প্রোটোজোয়া
(Phylum Protozoa ;
গ্রীক *protos* = প্রথম + *zoon* = প্রাণী)

গঠন ও অভিব্যক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে, আদ্যপ্রাণী পর্বের প্রাণীদের আদিমতম বলা যায়। ইহারা এত ছোট যে, খালি চোখে প্রায় দেখা যায় না। আদ্যপ্রাণীর দেহ একটিমাত্র কোষ দিয়া গঠিত। সেইজন্য, ইহাদের **এককোষী** বা **ইউনিসেলুলার (Unicellular** ; গ্রীক *unus* = এক) প্রাণী বলা হয়।

কোষে কিছু সাইটোপ্লাজ্‌ম ও সাধারণতঃ একটি নিউক্লিয়াস এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি অথবা একটির বেশি **কোষ-গহ্বর** বা **ভ্যাকুওল (Vacuole** ; ল্যাটিন *vacuus* = শূন্য) থাকে। ইহারা দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতি-সম, অরীয়ভাবে প্রতিসম, কিংবা অপ্রতিসম হইতে পারে। একটিমাত্র কোষ দিয়াই আদ্যপ্রাণীর জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

অনেক আদ্যপ্রাণী দেহ হইতে সৃষ্ট, প্রোটোপ্লাজ্‌ম-নির্মিত লম্বা অভিক্ষেপ (Projection)-এর সাহায্যে গমন (Locomotion) করে। এই অভিক্ষেপ-গুলিকে **ক্ষণপাদ** বা **সুডোপোডিয়া (Pseudopodia)** বলা হয়। অ্যামিবা (*Amoeba*) এই ধরনের প্রাণী। কেহ কেহ আবার সূক্ষ্ম চুলের মতো অসংখ্য **সিলিয়া (Cilia)** দিয়া গমন করে; যেমন—প্যারামিসিয়াম (*Paramecium*)। গমনের জন্য কোনও কোনও আদ্যপ্রাণী সিলিয়ার চেয়ে মোটা একটি অথবা অল্প কয়েকটি **ফ্লাজেলা (Flagella*** ; ল্যাটিন *flagellum* = ছোট চাবুক) ব্যবহার করে; যেমন—ইউগ্লিনা।

প্রায় ত্রিশ হাজার বিভিন্ন প্রজাতি(Species)-র আদ্যপ্রাণীর কথা জানা যায়। সমুদ্রের লাবণ জল (Saline water), পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদির

---

* বহুবচন; ফ্লাজেলাম (Flagellum) — একবচন।

মিঠা জল (Fresh water), ময়লা জল, ভিজা মাটি, গলিত জৈব পদার্থ ইত্যাদি ইহাদের স্বাভাবিক বসতি (Habitat)। এই সমস্ত পরিবেশে যে সব আগুপ্রাণী পাওয়া যায়, তাহারা স্বাধীনজীবী (Free living)। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ উদ্ভিদের মতো সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে। ইহাদের পুষ্টি(Nutrition)-পদ্ধতিকে **হোলোফাইটিক** (Holophytic ; গ্রীক *holos* = সমগ্র + *phyton* = উদ্ভিদ) বলা হয়। ইউগ্লিনা, ভল্‌ভক্‌স (*Volvox*) ইত্যাদি এইরকমের আগুপ্রাণী। স্বাধীনজীবী অন্যান্য আগুপ্রাণী **হোলোজোইক** (Holozoic ; গ্রীক *holos* = সমগ্র + *zoon* = প্রাণী) পদ্ধতিতে পুষ্টিসাধন করে। ইহারা ছোট ছোট জীবকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। প্যারামিসিয়াম, অ্যামিবা ইত্যাদি এই পদ্ধতিতে পুষ্টিসাধন করে। অনেক আগুপ্রাণী, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর দেহের মধ্যে পরজীবী(Parasite)-রূপে বাস করে।
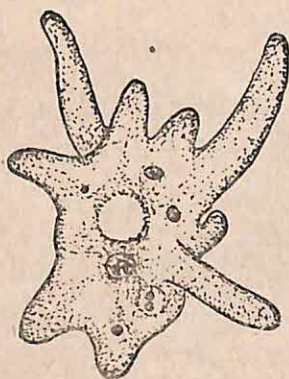
৮১নং চিত্র—অ্যামিবা।

৮২নং চিত্র—এণ্টামিবা।
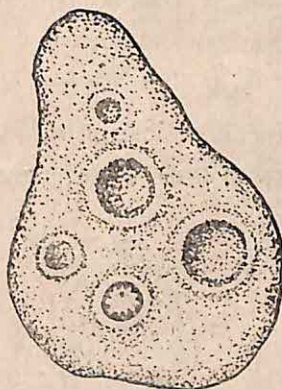
অধিকাংশ পরজীবী আগুপ্রাণী কোনও-না-কোনও রোগ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকা (*Entamoeba histolytica*), প্লাস্‌মোডিয়াম (*Plasmodium*), লিশ্‌ম্যানিয়া ডোনোভ্যানি (*Leishmania donovani*), ট্রাইপ্যানোসোমা (*Trypanosoma*) ইত্যাদি রোগজনক (Pathogenic) পরজীবীর উদাহরণ। প্রথমোক্ত প্রাণী মানুষের অন্ত্রে থাকিয়া, একধরনের আমাশয় রোগ (Amoebic dysentery) সৃষ্টি করে। আবার, কয়েকটি প্রজাতির প্লাস্‌মোডিয়াম ম্যালেরিয়া রোগের কারণ। ইহারা লোহিত রক্তকণিকা

(Red Blood Corpuscle)-এর মধ্যে থাকে। তৃতীয় প্রাণী কালাজ্বরের জীবাণু। কয়েকটি প্রজাতির ট্রাইপ্যানোসোমা আফ্রিকার মারাত্মক ঘুম-রোগ
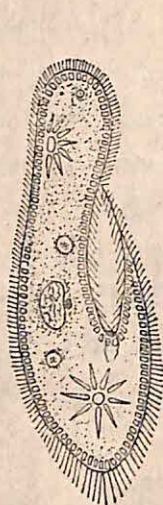
৮৩নং চিত্র—প্যারামিসিয়াম। ৮৪নং চিত্র—লিশ্‌ম্যানিয়া। ৮৫নং চিত্র—ইউগ্লিনা।

(Sleeping sickness)-এর জন্য দায়ী। মনোসিষ্টিস (*Monocystis*) নামক পরজীবী আদ্যপ্রাণী কেঁচোর শুক্রথলী(Seminal vesicle)-তে থাকে।
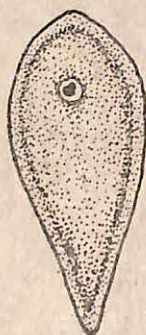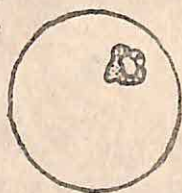
৮৬নং চিত্র—মনোসিষ্টিস। ৮৭নং চিত্র—লোহিত রক্তকণিকায় প্লাস্‌মোডিয়াম

কোনও কোনও সামুদ্রিক আদ্যপ্রাণীর জীবাশ্ম (Fossil) হইতে ট্রিপোলি পাথর (Tripoli stone) পাওয়া যায়। সমুদ্রের জলে নক্‌টিল্যুকা (*Noctiluca*) নামক আদ্যপ্রাণী থাকে বলিয়া, রাত্রে ঢেউয়ের মাথায় আলো জ্বলার মতো মনে হয়।

পর্ব ছিদ্রাল প্রাণী বা ফাইলাম পরিফেরা
(Phylum Porifera ;
গ্রীক *porus* = ছিদ্র + *ferre* = ধারণ করা)

এককোষী আদ্যপ্রাণীদের পরে ছিদ্রাল প্রাণীদের স্থান। ইহারা সাধারণ-ভাবে **স্পঞ্জ** (Sponges) নামে পরিচিত। ইহাদের দেহ অরীয়ভাবে প্রতিসম অথবা অপ্রতিসম এবং অনেকগুলি কোষ দিয়া গঠিত। সেইজন্য, ইহারা **বহুকোষী** বা **মাল্‌টিসেলুলার** (Multicellular ; ল্যাটিন *multus* = অনেক) প্রাণী। কোষগুলি দুইটি প্রাথমিক স্তরে সাজানো থাকে। সেই হিসাবে ছিদ্রাল প্রাণীদের **দ্বিত্বক্** বা **ডিপ্‌লোব্লাস্‌টিক** (Diploblastic ; গ্রীক *diplous* = দ্বি + *blastos* = উৎস) প্রাণী বলা হয়।
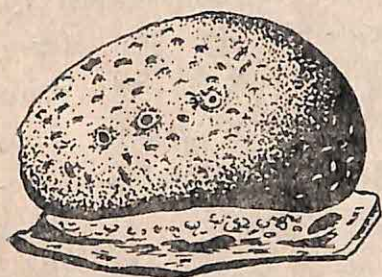
৮৮নং চিত্র—বাথ্-স্পঞ্জ্।
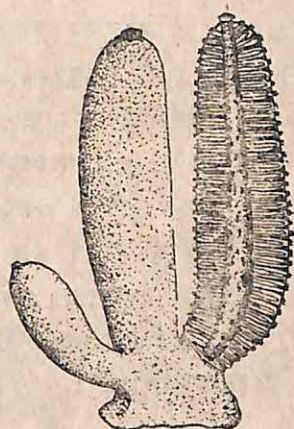
৮৯নং চিত্র—স্কাইফা।

তবে কোষ-স্তর দুইটির মধ্যে স্পষ্ট শ্রম-বিভাগ দেখা যায় না ; অর্থাৎ, কাজের দিক দিয়া স্তর দুইটির মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকায়, ইহাদের ছিদ্রাল প্রাণী বলা হয়। ঐ ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া, এবং দেহের ভিতরে অবস্থিত অনেক **নালী**(Canal)-র মধ্য দিয়া অনবরত জল যাতায়াত করে। চূর্ণকময় (Calcareous) অথবা বালুকাময় (Siliceous) পদার্থ দিয়া তৈয়ারী কাঁটা বা **স্পিকিউল** (Spicules), **স্পঞ্জীন** (Spongin) নামক জৈব-সূত্র (Organic fibres) ইত্যাদি দিয়া ইহাদের দেহের কাঠামো নির্মিত।

প্রায় সাড়ে চার হাজার প্রজাতির স্পঞ্জ্দের সকলেই জলে বাস করে। ইহাদের অধিকাংশই সামুদ্রিক (Marine)। কেবল স্পঞ্জীলা (*Spongilla*) নামক একধরনের স্পঞ্জ্ মিঠা জলে পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ স্পঞ্জ্ অগভীর ও (প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত) গভীর সমুদ্রের তলায়, পাথর অথবা অন্য কোনও কঠিন বস্তুর সঙ্গে আট্‌কাইয়া থাকে। অনেক স্পঞ্জে উদ্ভিদের মতো শাখা-প্রশাখা থাকে। সেইজন্য, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত ইহাদের উদ্ভিদ মনে করা হইত। গালিচার মতো, গোলাকার (এক মিলি-মিটার হইতে দুই মিটার পর্যন্ত ব্যাস-যুক্ত) ইত্যাদি নানা আকারের এবং ধূসর, কালো, লাল, নীল, বেগুনী, কমলা ইত্যাদি নানা রঙের স্পঞ্জ্ দেখা যায়। ইহাদের জীবন-চক্রে লার্ভা (Larva) দশা পাওয়া যায়। লার্ভা, অবশ্য, স্বাধীনভাবে সাঁতার দিতে পারে। কয়েক জাতের স্পঞ্জের দেহকে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিলেও, প্রত্যেকটি টুক্‌রা হইতে আবার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণী সৃষ্টি হয়। স্পঞ্জিয়া (*Spongia*) নামক স্পঞ্জের দেহ হইতে স্নান ও অস্ত্রোপচারের সময় ব্যবহৃত বাথ্-স্পঞ্জ্ (Bath sponge) পাওয়া যায়। স্কাইফা (*Scypha*)* জটিলতা-বর্জিত স্পঞ্জের উদাহরণ।
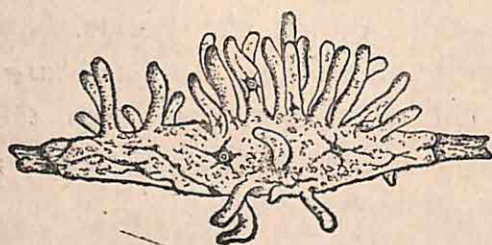
৯০নং চিত্র—স্পঞ্জীলা।

পর্ব একনালীদেহী বা ফাইলাম সিলেন্‌টেরেটা
(Phylum Coelenterata ;
গ্রীক *koilos* = ফাঁপা + *enteron* = অন্ত্র)

ছিদ্রাল প্রাণীদের মতো, একনালীদেহী প্রাণীরাও (এবং পরে বর্ণিত সমস্ত পর্বের প্রাণীরাও) বহুকোষী। ইহারাও দ্বিস্তর প্রাণী। তবে ইহাদের কোষ-স্তর দুইটির মধ্যে স্পষ্ট শ্রম-বিভাগ দেখা যায়। সেইজন্য, ইহাদের **কলা**(Tissue)-যুক্ত প্রাণী বলে। একনালীদেহী প্রাণীরা অরীয়ভাবে প্রতিসম। ইহাদের দেহ নলাকার (Tubular), কিংবা কতকটা ছাতার মতো এবং দেহের

* পূর্বনাম—সাইকন (*Sycon*)।

মধ্যে একটিমাত্র প্রাথমিক নালী থাকে। ইহাকে **সিলেন্‌টেরন** (**Coelenteron**) বলা হয়। সেই হিসাবে ইহাদের এইরকম নামকরণ করা হইয়াছে। দেহের এক প্রান্তে একটি ছিদ্র থাকে। ইহাকে মুখ (Mouth) বলে। মুখের চারপাশ হইতে সূক্ষ্ম আঙুলের মতো অনেকগুলি **কর্ষিকা** বা **টেন্‌টাক্‌ল** (**Tentacles**) ঝুলিতে থাকে। নলাকার প্রাণীর মুখের বিপরীত প্রান্ত সাধারণতঃ কোনও বস্তুর সঙ্গে আট্‌কানো থাকে। ছাতার মতো প্রাণীরা জলে ভাসে। অধিকাংশ একনালীদেহী প্রাণীর জীবন-চক্রে এই দুই ধরনের দশা দেখা যায়। অনেক একনালীদেহী প্রাণী সংঘবদ্ধভাবে উপনিবেশ (Colony)-এ বাস করে। এই পর্বের প্রাণীদের দেহে **নিমাটোসিস্‌ট** (**Nematocyst**; গ্রীক *nematos*=সুতা+*kystis*=স্থলী) নামক বিশিষ্ট ধরনের দংশক কোষ (Stinging cell) থাকে।

নয় হাজারেরও বেশি প্রজাতির একনালীদেহী প্রাণীর বিবরণ জানা আছে। ইহাদের সকলেই জলে বাস করে—অধিকাংশই সামুদ্রিক। অবশ্য, হাইড্রা (*Hydra*)-জাতীয় একনালীদেহী প্রাণীরা মিঠা জলে বাস করে। প্রবাল
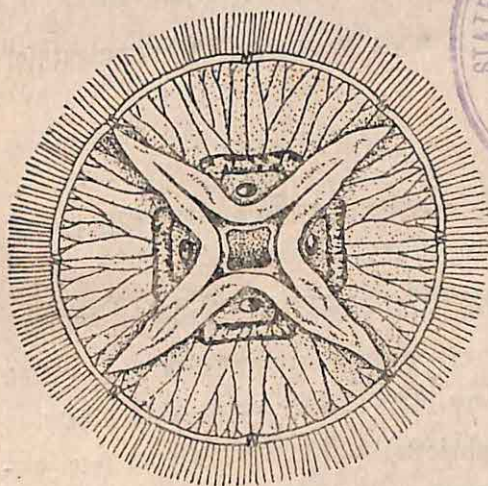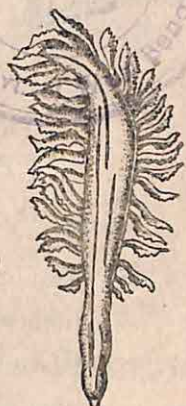
৯১নং চিত্র—জেলি-ফিশ। ৯২নং চিত্র—সাগর-কলম।

(Corals), জেলি-ফিশ (Jelly-fish), সাগর-কুসুম (Sea anemone), সাগর-পাখা (Sea fan), সাগর-কলম (Sea pen) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের একনালীদেহী প্রাণীর উদাহরণ। বড় জেলি-ফিশগুলির ব্যাস দুই

মিটারেরও বেশি। সবচেয়ে বড় জেলি-ফিশের কর্ষিকা ১০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।

প্রবাল-জাতীয় প্রাণীদের দেহ-নিঃসৃত চুর্ণকময় পদার্থ জমিয়া প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি হয়। অলঙ্কার-শিল্পে ব্যবহৃত প্রবাল এই ধরনের প্রাণীদের দেহ-নিঃসৃত
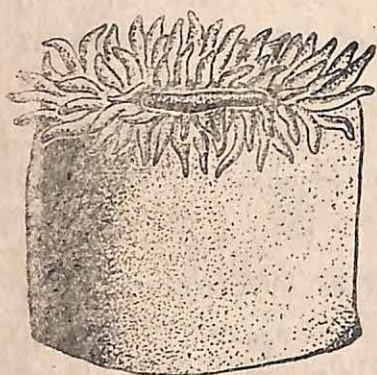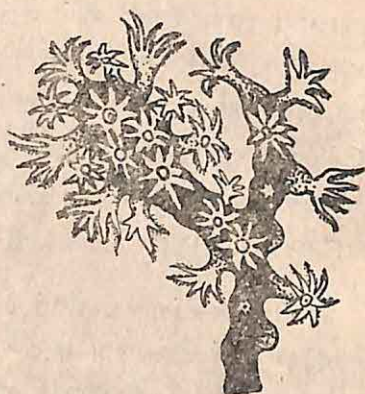
৯৩নং চিত্র—সাগর-কুসুম। ৯৪নং চিত্র—প্রবাল।

পদার্থ হইতে পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপের আদিবাসীরা জেলি-ফিশ খায়।

পর্ব চ্যাপ্টা কৃমি বা ফাইলাম প্লাটিহেলমিন্‌থিস

(Phylum Platyhelminthes ;
গ্রীক *platy* = চ্যাপ্টা + *helmins* = কৃমি)

চ্যাপ্টা কৃমিরা একনালীদেহী প্রাণীদের চেয়ে উন্নত-ধরনের। ইহাদের দেহ তিনটি প্রাথমিক কোষ-স্তর দিয়া গঠিত। কাজেই, ইহারা **ত্রিস্তরক্‌** বা **ট্রিপ্‌লোব্লাস্‌টিক (Triploblastic)** প্রাণী। চ্যাপ্টা কৃমিদের দেহে অগ্র-প্রান্ত, পশ্চাৎ-প্রান্ত, পৃষ্ঠতল, অঙ্কতল স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ইহারা দ্বিপার্শ্বীয়-ভাবে প্রতিসম। অবশ্য, চ্যাপ্টা কৃমিদের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরে বর্ণিত অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

চ্যাপ্টা কৃমিরা পাতার মতো উপর-নিচে চাপা কিংবা ফিতার মতো লম্বা। সেইজন্য, ইহাদের **চ্যাপ্টা কৃমি (Flat worms)** বলা হয়। ইহাদের

পৌষ্টিক নালী (Digestive canal) অসম্পূর্ণ (পায়ু নাই) এবং শাখা-যুক্ত। অনেকের পৌষ্টিক নালী আদৌ থাকে না। পেশী কলা (Muscle tissue) চ্যাপ্টা কৃমিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহারা সাধারণতঃ **উভয়লিঙ্গ** (Bisexual)।

প্রায় পনেরো হাজার প্রজাতির চ্যাপ্টা কৃমিদের অধিকাংশই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহের মধ্যে অন্তঃপরজীবী (Endoparasite)-রূপে বাস করে। কয়েক ধরনের চ্যাপ্টা কৃমি অন্যান্য প্রাণীর দেহের বাহিরের তলে বাহ্যপরজীবী (Ectoparasite) হিসাবে বাস করে। অবশ্য, কিছু কিছু চ্যাপ্টা কৃমি জলে অথবা ভিজা মাটিতে স্বাধীনভাবে বাস করে। পোষক প্রাণীর দেহে আট্‌কাইয়া থাকার জন্য অন্তঃপরজীবী চ্যাপ্টা কৃমিদের দেহে **অঙ্কুশ** (Hooks) ও **চোষক** (Suckers) থাকে।

অনেক চ্যাপ্টা কৃমি আণুবীক্ষণিক। কিন্তু ৩০ মিটার পর্যন্ত লম্বা চ্যাপ্টা কৃমির কথাও জানা আছে।
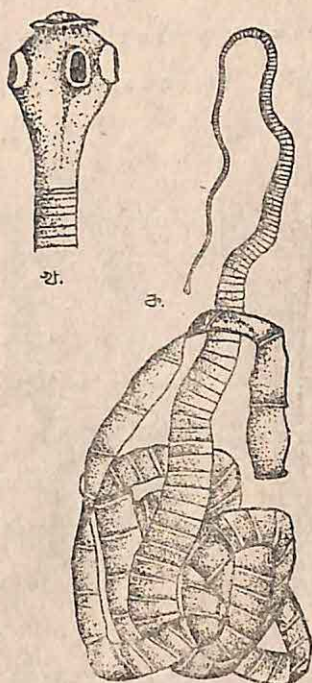
৯৫নং চিত্র—ফিতা কৃমি : ক. সমগ্র প্রাণী, খ. অগ্র-প্রান্ত (বর্ধিত)।

প্লানেরিয়া (*Planaria*) স্বাধীনজীবী চ্যাপ্টা কৃমি। যকৃৎ কৃমি (Liver fluke), ফিতা কৃমি (Tape worm), শোণিত কৃমি (Blood fluke) ইত্যাদি অন্তঃপরজীবী চ্যাপ্টা কৃমির উদাহরণ। ফ্যাসিয়োলা হেপাটিকা (*Fasciola hepatica*) নামক যকৃৎ কৃমি ভেড়ার পিত্তনালীতে পাওয়া যায়।

টিনিয়া সোলিয়াম (*Taenia solium*) নামক ফিতা কৃমি মানুষের অন্ত্রে বাস করে। শূয়ারের মাংসে ইহার সিস্ট (Cyst) থাকে। কাঁচা কিংবা অর্ধ-সিদ্ধ শূয়ারের মাংস খাইলে, মানুষের দেহে টিনিয়া সোলিয়াম সংক্রমিত হইতে পারে।

৯৬নং চিত্র—যকৃৎ কৃমি।

পর্ব গোল কৃমি বা ফাইলাম নিমাটহেল্‌মিন্‌থিস
(**Phylum Nemathelminthes** ;
গ্রীক *nema* = সুতা + *helmins* = কৃমি)

চ্যাপ্টা কৃমিদের মতো, গোল কৃমিরাও ত্রিত্বক এবং দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম প্রাণী। ইহাদের দেহ বেলনাকার (Cylindrical), দেখিতে কতকটা সুতার
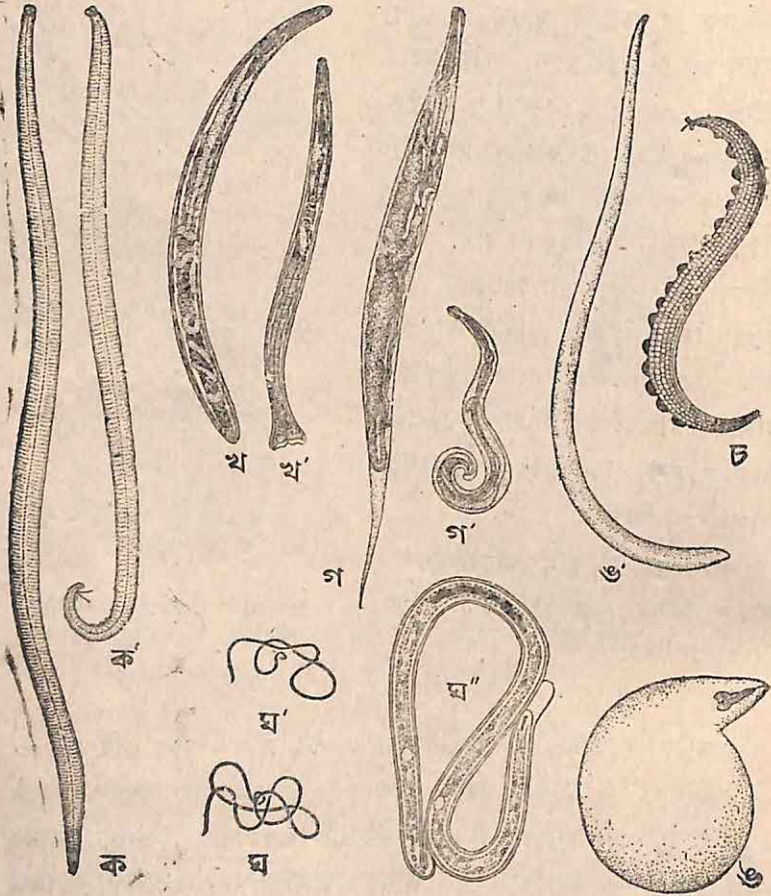
৯৭নং চিত্র—কয়েক রকম গোল কৃমি :

ক. কেঁচো কৃমি (স্ত্রী), ক´. ঐ (পুরুষ), খ. হুক কৃমি (স্ত্রী), খ´. ঐ (পুরুষ), গ. কুচো কৃমি (স্ত্রী), গ´. ঐ (পুরুষ), ঘ. ফাইলেরিয়া কৃমি (স্ত্রী), ঘ´. ঐ (পুরুষ), ঘ″. ঐ (মাইক্রোফাইলেরিয়া), ঙ. উদ্ভিদের পরজীবী গোল কৃমি (স্ত্রী), ঙ´. ঐ (পুরুষ), চ. স্বাধীনজীবী (সামুদ্রিক) গোল কৃমি।

মতো। সেইজন্য, ইহাদের **গোল কৃমি (Round worms)** বলা হয়। গোল কৃমির দেহ কৃত্তিক বা কিউটিক্‌ল(Cuticle)-এর পুরু আবরণ দিয়া

আবৃত। ইহাদের স্থায়ী এবং সম্পূর্ণ পৌষ্টিক নালী থাকে। ইহাদের দেহের মধ্যে **সুডোসিল** (Pseudocoel) নামক দেহ-গহ্বর দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ **একলিঙ্গ** (Unisexual) ; স্ত্রী-প্রাণী পুরুষ-প্রাণীর চেয়ে বড়।

প্রায় দশ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির গোল কৃমির অধিকাংশই মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর দেহে অন্তঃপরজীবী-রূপে বাস করে। কেহ কেহ উদ্ভিদেরও দেহে অন্তঃপরজীবী। অনেক গোল কৃমি, অবশ্য, জলে কিংবা ভিজা মাটিতে স্বাধীনভাবে বাস করে। কেঁচো কৃমি বা অ্যাস্‌কারিস লুম্ব্রিকয়ডিস (*Ascaris lumbricoides*), হুক কৃমি (Hook worm) বা অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডিওডেনাল (*Anchylostoma duodenale*), কুচো কৃমি (Pin worm) বা এণ্টারোবিয়াস ভার্মিকুলারিস (*Enterobius vermicularis*), ফাইলেরিয়া কৃমি (Filaria worm) বা ভুকেরেরিয়া ব্যাঙ্‌ক্রফ্‌টি (*Wuchereria bancrofti*) ইত্যাদি গোল কৃমি মানুষের অন্তঃপরজীবী। প্রথমোক্ত প্রাণী লম্বায় ৪০ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত হয়। ইহারা মানুষের অন্ত্রে থাকে এবং রোগ সৃষ্টি করে। শেষোক্ত কৃমি একধরনের গোদ (Elephantitis) সৃষ্টি করে।

ইহার লার্ভাকে মাইক্রোফাইলেরিয়া (Microfilaria) বলে। এই লার্ভা রক্তে পাওয়া যায়।

পর্ব অঙ্গুরীমাল বা ফাইলাম অ্যানিলিডা

(Phylum Annelida ; ল্যাটিন *annelus* = ছোট আংটি)

গোল কৃমিদের মতো, অঙ্গুরীমাল পর্বের প্রাণীরাও ত্রিত্বক্‌ এবং দ্বিপার্শ্বীয়-ভাবে প্রতিসম। ইহাদের দেহের ভিতরে নির্দিষ্ট আবরণ-বেষ্টিত **সিলোম** (Coelom) নামক দেহ-গহ্বর থাকে। অধিকাংশ অঙ্গুরীমাল প্রাণীর দেহ লম্বাটে এবং আংটির মতো অনেকগুলি **দেহ-খণ্ডক** (Body segment), **সোমাইট** (Somite) বা **মেটামিয়ার** (Metamere) নিয়া গঠিত। প্রতিটি দেহ-খণ্ডকে সূক্ষ্ম সূচের মতো অসংখ্য **সিটি** (Setea)* থাকে। অনেকের দেহ-খণ্ডকের পাশ হইতে ছোট ছোট মাংসল **প্যারাপোডিয়া** (Parapodia† ; গ্রীক *para* = পাশে + *podos* = পদ) বাহির হয়। সিটি এবং প্যারাপোডিয়া অঙ্গুরীমাল প্রাণীদের গমন-অঙ্গ (Organ of locomotion)।

---

* বহুবচন ; সিটা (Seta) — একবচন।

† বহুবচন ; প্যারাপোডিয়াম (Parapodium) — একবচন।

কিছু কিছু অঙ্গুরীমাল প্রাণীর দেহের অগ্র-প্রান্তের কাছে অনেকগুলি কর্ষিকা (Tentacles) থাকে। ইহাদের দেহ কৃত্তিক(Cuticle)-এর পাতলা আবরণ দিয়া আবৃত। একলিঙ্গ এবং উভয়লিঙ্গ—দুই ধরনেরই অঙ্গুরীমাল প্রাণী পাওয়া যায়। অনেকের জীবন-চক্রে লার্ভা দশা দেখা যায়।

প্রায় সাত হাজার বিভিন্ন প্রজাতির অঙ্গুরীমাল প্রাণীর কথা জানা যায়। ইহাদের অধিকাংশই মিঠা জলে, সমুদ্রের জলে অথবা ভিজা মাটিতে বাস করে। কেহ কেহ অন্যান্য প্রাণীর দেহে পরজীবী। কেঁচো, জোঁক ইত্যাদি এই পর্বের প্রাণীর সহজ-প্রাপ্য উদাহরণ। কেঁচো ভিজা মাটির মধ্যে, গর্তে বাস

৯৮নং চিত্র—নিয়ান্‌থিস।
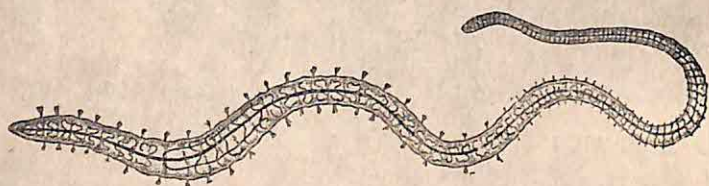
৯৯নং চিত্র—টিউবিফেকস।
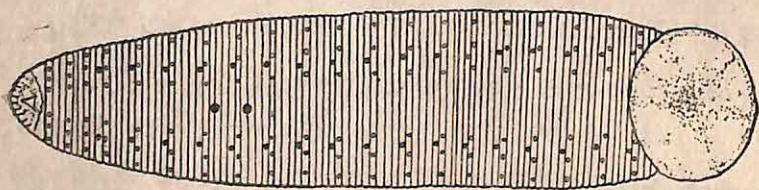
১০০নং চিত্র—জোঁক।

করে। নানা ধরনের পরজীবী জোঁক মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত চোষণ করিয়া জীবনধারণ করে। নিয়ান্‌থিস (*Neanthes*)* সমুদ্রের বেলাভূমিতে ভিজা বালির মধ্যে পাওয়া যায়। টিউবিফেক্স (*Tubifex*) নামক কেঁচো-জাতীয় প্রাণী শৌখিন পোষা মাছের প্রিয় খাদ্য। এক মিলিমিটারেরও কম লম্বা অঙ্গুরীমাল প্রাণী যেমন জানা আছে, তেমনি ইউনিস জাইগ্যান্‌টিয়া (*Eunice*

* পূর্বনাম—নেরিস (*Nereis*)।

gigantea) নামক অঙ্গুরীমাল প্রাণী প্রায় তিন মিটার লম্বা হয়। অস্ট্রেলিয়ার মেগাস্কোলিডিস অস্ট্রেলিস (*Megascolides australis*) নামক কেঁচো লম্বায় দুই মিটারেরও বেশি। ইহাদের দেহের ব্যাস প্রায় ২·৫ সেন্টিমিটার।

পর্ব সন্ধিপদ বা ফাইলাম আর্থ্রোপোডা
(Phylum Arthropoda ;
গ্রীক *arthors* = সন্ধি + *podos* = পদ)

সন্ধিপদ পর্বের প্রাণীরাও দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। ইহাদেরও দেহ অনেক-গুলি দেহ-খণ্ডক দিয়া গঠিত। তবে দেহ-খণ্ডকগুলি নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া, বিভিন্ন কাজ করে। ইহাদের দেহ **কাইটিন** (Chitin) নামক পদার্থের পুরু আবরণ দিয়া আবৃত। **উপাঙ্গ**(Appendage)-গুলি বাহির হইতে সন্ধিল (Jointed) বলিয়া, ইহারা সন্ধিপদ নামে পরিচিত। সন্ধিপদ প্রাণীর দেহ **মস্তক** (Head), **বক্ষ** (Thorax) এবং **উদর** (Abdomen)—এই তিন অংশে বিভক্ত। অনেকের মস্তক ও বক্ষ একসঙ্গে মিশিয়া গিয়া **শিরোবক্ষ** বা **সেফালোথোরাক্স** (Cephalothorax ; গ্রীক *kephale* = মস্তক) সৃষ্টি হয়। **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eye) সন্ধিপদ প্রাণীর আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অনেকগুলি ছোট ছোট একক অক্ষি বা **অসিলি** (Ocelli)* মিলিয়া পুঞ্জাক্ষি তৈয়ারি হয়। অনেক সন্ধিপদ প্রাণীর দেহে **সরলাক্ষি**(Simple eye)-ও দেখা যায়। অধিকাংশ সন্ধিপদ প্রাণী একলিঙ্গ। অনেকের জীবন-চক্রে লার্ভা দশা দেখা যায়।

নয় লক্ষেরও বেশি বিভিন্ন প্রজাতির সন্ধিপদ প্রাণী ভিজা মাটি, মিঠা জল, লবণ জল ইত্যাদি নানা পরিবেশে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে ইহারাই প্রথমে স্থলের শুষ্ক পরিবেশে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে এবং বায়ুতে উড়িতে পারিল। ৬,১০০ মিটার উঁচু পর্বতের শিখর হইতে ৯,৮০০ মিটার গভীর সমুদ্রের তলায় সন্ধিপদ প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়। অনেকে আবার উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের অন্তঃপরজীবী ও বাহ্যপরজীবী। উই, মৌমাছি, পিঁপড়া ইত্যাদি পতঙ্গ-শ্রেণীর সন্ধিপদ প্রাণী উন্নত-ধরনের সামাজিক জীবন যাপন করে। সন্ধিপদ প্রাণীদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অবহেলার নয়। নানা জাতের কাঁকড়া ও চিংড়ি মানুষের অন্যতম প্রিয় খাদ্য। রেশম মথের গুটি

* বহুবচন ; অসিলাস (Ocellus) — একবচন
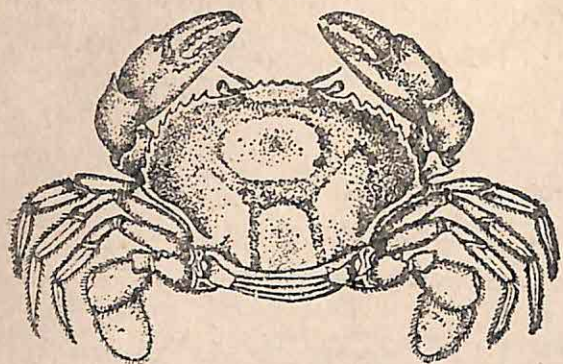
১০১নং চিত্র—কাঁকড়া।
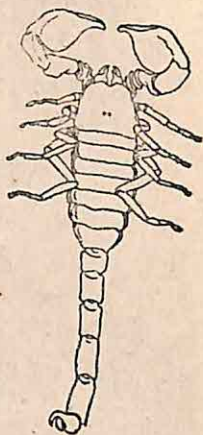
১০২নং চিত্র—কাঁকড়া বিছা।
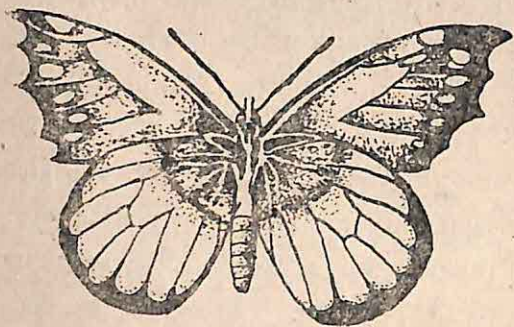
১০৩নং চিত্র—প্রজাপতি।

১০৪নং চিত্র—পিঁপড়া।
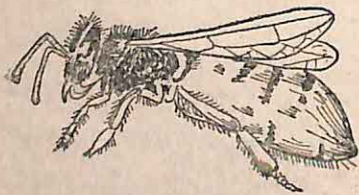
১০৫নং চিত্র—মৌমাছি।

১০৬নং চিত্র—মাছি।
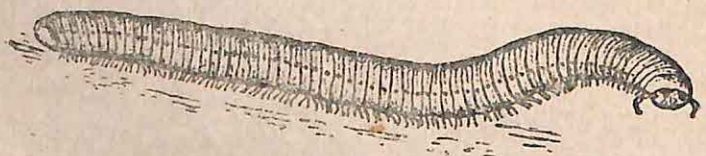
১০৭নং চিত্র—কেন্নো।

হইতে রেশম (Silk) এবং মৌমাছির মৌচাক হইতে মধু পাওয়া যায়। উই এবং অন্যান্য কয়েক ধরনের পতঙ্গ মানুষের আসবাব, পোশাক, খাদ্য ইত্যাদি নষ্ট করে। মশা, মাছি, আরসোলা এঁটেল-পোকা (Tick) ইত্যাদি মানুষ ও গৃহপালিত পশু-পাখির রোগ-জীবাণু বহন করে। পঙ্গপাল, ফড়িং ইত্যাদি পতঙ্গ শস্যের বহু ক্ষতি করে। তেঁতুলে বিছা, কাঁকড়া বিছা, কয়েক ধরনের মাকড়সা—এই সমস্ত সন্ধিপদ প্রাণী বিষধর (Poisonous)। ইহাদের বিষ অনেক সময় মানুষের পক্ষেও মারাত্মক হয়। প্রজাপতি, কেন্নো প্রভৃতি পরিচিত সন্ধিপদ প্রাণী। এই পর্বের প্রাণীরা সাধারণতঃ খুব বড় হয় না। এক মিলিমিটারেরও কম লম্বা সন্ধিপদ প্রাণী অনেক পাওয়া যায়। পতঙ্গেরা ২৮ সেন্টিমিটারের বেশি লম্বা হয় না। জাপানে একধরনের খুব বড় কাঁকড়া পাওয়া যায়। পা-সমেত ইহার দেহের বিস্তার প্রায় ৩৬৫ সেন্টিমিটার।

পর্ব কম্বোজ বা ফাইলাম মোলাস্কা
(**Phylum Mollusca** ; ল্যাটিন *mollis* = নরম)

আগের দুইটি পর্বের প্রাণীদের মতো, কম্বোজ বা শম্বুক-জাতীয় প্রাণীরাও ত্রিস্তক্ এবং দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। কিন্তু ইহাদের দেহ খণ্ডকে বিভক্ত নয়। শম্বুক-শ্রেণীর কম্বোজ প্রাণীরা অপ্রতিসম। অধিকাংশ কম্বোজ প্রাণীর দেহ চূর্ণকময় **খোলক(Shell)**-এর মধ্যে থাকে। তবে অক্টোপাস (*Octopus*) এবং আরও কয়েকটি কম্বোজ প্রাণীর খোলক দেহের ভিতরে থাকে।

আবার, কাহারও কাহারও আদৌ খোলক থাকে না। এই পর্বের প্রাণীর দেহের অঙ্কতলে একটি মাংসল পদ (Foot) থাকে। বিভিন্ন ধরনের প্রাণীতে এই পদ, অবশ্য, নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। অধিকাংশ কম্বোজ প্রাণী একলিঙ্গ। ইহাদের অনেকের জীবন-চক্রে লার্ভা দশা দেখা যায়।

প্রায় ৪৫ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির কম্বোজ প্রাণীদের অধিকাংশই সামুদ্রিক। কেহ কেহ মিঠা জলেও বাস করে। গেঁড়ি ইত্যাদি কয়েক জাতের কম্বোজ প্রাণী আবার স্থলবাসী। সামুদ্রিক কম্বোজ প্রাণীদের সমুদ্রের বেলাভূমিতে, অগভীর সমুদ্রে, এমনকি সাড়ে দশ হাজার মিটার গভীর সমুদ্রের তলায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ কম্বোজ প্রাণী ধীরে ধীরে গড়াইয়া চলে। অনেকে আবার পাথর ইত্যাদির গায়ে আটকাইয়া থাকে। অক্টোপাস, কাট্‌ল-ফিশ (Cuttle-fish) বা সিপিয়া (*Sepia*), স্কুইড (Squid) বা ললিগো (*Loligo*) ইত্যাদি প্রাণী, অবশ্য, দ্রুতগতিতে সাঁতার দিতে পারে।

নানা ধরনের শামুক, ঝিনুক, গুগ্‌লি, গেঁড়ি, স্কুইড, অক্টোপাস বিভিন্ন দেশে খাদ্য হিসাবে পরিচিত। সামুদ্রিক ঝিনুক শুক্তির মধ্যে মুক্তা সৃষ্টি হয়। ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূলে, জাপানে এবং পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশে
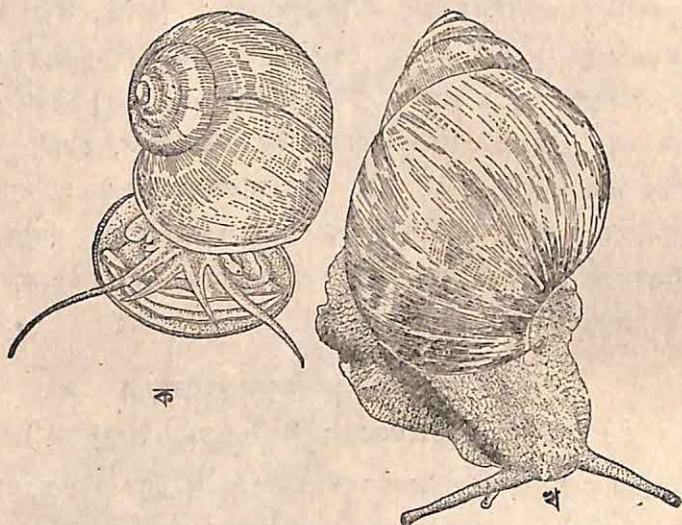
১০৮নং চিত্র—ক. আপেল শামুক, খ. গেঁড়ি।
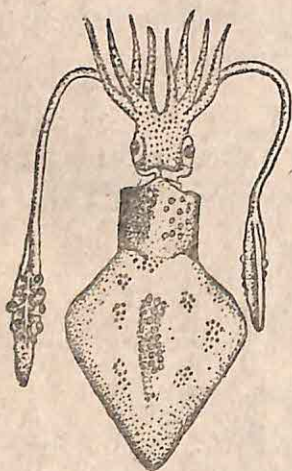
১০৯নং চিত্র—ললিগো।
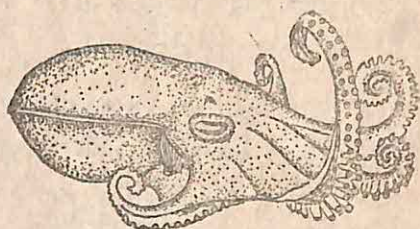
১১০নং চিত্র—অক্টোপাস।

মুক্তার চাষ হয়। কড়ি ও শঙ্খ শামুক-জাতীয় প্রাণীর খোলক-মাত্র। শঙ্খ হইতে শাঁখা এবং কয়েক জাতের ঝিনুকের খোলক হইতে বোতাম তৈয়ারি হয়।

শামুক, ঝিনুক ইত্যাদির খোলক পোড়াইয়া চুন প্রস্তুত করা যায়। টেরেডো (*Teredo*) প্রভৃতি ঝিনুক-জাতীয় কম্বোজ প্রাণী সমুদ্র-তীরের বৃক্ষের দেহে ছিদ্র করিয়া, কাঠের ক্ষতি করে।

ছোট, বড়, মাঝারি—নানা আকারের কম্বোজ প্রাণী দেখা যায়। একধরনের স্কুইড প্রায় ১৫ মিটার লম্বা হয়। ইহারাই সবচেয়ে বড় অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

পর্ব কণ্টকত্বক্ বা ফাইলাম একাইনোডার্মাটা
(Phylum Echinodermata ;
গ্রীক *echinos*=কাঁটাচুয়া+*derma*=ত্বক্)

কম্বোজ পর্বের প্রাণীদের মতো, কণ্টকত্বক্ প্রাণীদের দেহ ত্রিত্বক্ এবং অখণ্ড। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কণ্টকত্বক্ প্রাণীরা অরীয়ভাবে প্রতিসম। ইহাদের মস্তক বলিয়া কিছু নাই। ত্বক্ কর্কশ, চূর্ণকময় কণ্টকযুক্ত এবং কঠিন বলিয়া, ইহারা কণ্টকত্বক্ নামে পরিচিত। ইহাদের ছোট ছোট **নলাকার পদ (Tube feet)** থাকে। নলাকার পদের সাহায্যে ইহারা ধীরে ধীরে গড়াইয়া চলিতে পারে। কণ্টক-ত্বক্ প্রাণীরা একলিঙ্গ। ইহাদের জীবন-চক্রে লার্ভা দশা দেখা যায়। লার্ভা দ্বি-পার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম।
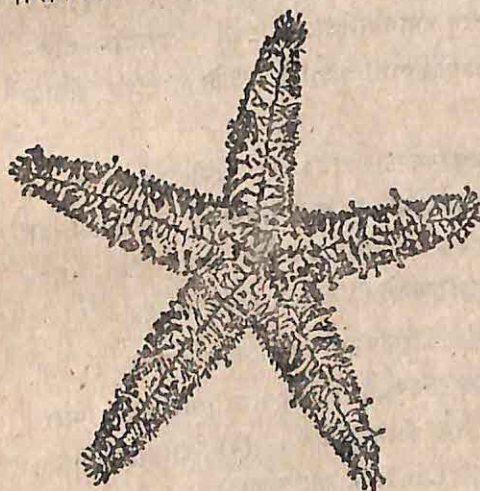
১১১নং চিত্র—তারা-মাছ।

১১২নং চিত্র—সমুদ্র-শসা।

প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার জীবিত প্রজাতির কণ্টকত্বক্ প্রাণীর সকলেই সামুদ্রিক এবং স্বাধীনজীবী। অনেকে পূর্ণাঙ্গ দশায় কোনও কঠিন বস্তুর সঙ্গে

নিজেকে আট্‌কাইয়া রাখে ; যেমন—সমুদ্র-লিলি (Sea lily)। আবার, সমুদ্র-শসা (Sea cucumber) সমুদ্রের তলায় পড়িয়া থাকে। তারা-মাছ (Star-fish), সী-আর্‌চিন (Sea urchin), পালক-তারকা (Feather star) ইত্যাদি অন্যান্য কণ্টকত্বক্‌ প্রাণী সমুদ্রের বেলাভূমি হইতে ১০,৭০০ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায়। সমুদ্র-শসা এবং আরও কয়েকটি কণ্টকত্বক্‌ প্রাণী অনেক দেশে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তারা-মাছ শুক্তি খাইয়া মুক্তা-চাষের ক্ষতি করে। এই পর্বের অধিকাংশ প্রাণী মাঝারি আকারের ; একধরনের সমুদ্র-শসা ১৮০ সেন্টিমিটারেরও বেশি লম্বা হয়।

পর্ব কর্ডাটা বা ফাইলাম কর্ডাটা

(**Phylum Chordata** ; গ্রীক *chorda* = দড়ি)

নোটোকর্‌ড (Notochord), **গলবিল-ছিদ্র** (Pharyngeal slits) এবং **ফাঁপা পৃষ্ঠ্য স্নায়ুরজ্জু** (Dorsal hollow nerve cord)—এই তিনটিকে কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা হয়। নোটোকর্‌ড একটি দণ্ডের মতো। ইহা দেহের পিঠের দিকে লম্বালম্বিভাবে থাকে। স্নায়ুরজ্জুটি নোটোকর্‌ডের পৃষ্ঠভাগে, উহার সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকে। দ্বিপার্শ্বীয় প্রতি-সাম্য, পায়ু-পরবর্তী লেজ (Post-anal tail) ইত্যাদি কর্ডাটা প্রাণীদের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

জীবন-চক্রের প্রথমদিকে সমস্ত কর্ডাটা প্রাণীর দেহে নোটোকর্‌ড় থাকে। কিন্তু পরের অবস্থায় অধিকাংশ কর্ডাটা প্রাণীর ক্ষেত্রে **মেরুদণ্ড** (Vertebral column) নামক একটি অস্থিময় দণ্ড নোটোকর্‌ডের স্থান দখল করে। সেই-জন্য, এই সমস্ত কর্ডাটা প্রাণীদের **মেরুদণ্ডী** (Vertebrata) বলা হয়।

কিন্তু যে সব কর্ডাটা প্রাণীর নোটোকর্‌ড এইভাবে পরিবর্তিত হয় না, তাহাদের **আদ্যকর্ডাটা** বা **প্রোটোকর্ডাটা** (Protochordata) বলে। আদ্যকর্ডাটা প্রাণীরা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। (১) ব্যালানোগ্লোসাস (*Balanoglossus*), (২) ল্যান্‌সেট (Lancet), অ্যাম্ফিয়ক্‌সাস (Amphioxus) বা ব্র্যাঙ্কিওস্টোমা (*Branchiostoma*) এবং (৩) অ্যাসিডিয়া (*Ascidia*)—এই তিনটি প্রাণী তিন ধরনের আদ্যকর্ডাটার পরিচিত উদাহরণ। প্রথমোক্ত প্রাণী দেখিতে কতকটা কেঁচোর মতো, এবং সমুদ্র-তীরের ভিজা বালিতে, গর্তের

মধ্যে থাকে। অ্যাম্ফিয়ক্সাস যেন ছোট একটি মাছ। শেষোক্ত প্রাণী দুই-ছিদ্র-যুক্ত বাদামী রঙের ছোট থলির মতো।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে অনেকের চোয়াল (Jaw) থাকে না। এই ধরনের প্রাণীরা **চোয়াল-বিহীন** বা **আগ্‌নাথা** (Agnatha) নামে পরিচিত। অতীত যুগে, অনেক রকমের চোয়াল-বিহীন মেরুদণ্ডী প্রাণী ছিল। কিন্তু বর্তমানে, কেবল **বৃত্তমুখী** বা **সাইক্লোস্টোমাটা** (Cyclostomata) নামক, দেখিতে কতকটা বা'ন মাছের মতো এক শ্রেণীর প্রাণী চোয়াল-বিহীন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ সমুদ্রে

১১৩নং চিত্র—ল্যাম্প্রে।

অথবা হ্রদে বাস করে। ল্যাম্প্রে (Lamprey), হ্যাগ্‌-মাছ (Hag-fish) এই-শ্রেণীর প্রাণীর উদাহরণ। দাঁতযুক্ত কর্কশ জিভের সাহায্যে, ল্যাম্প্রে মাছের মাংস কুরিয়া খায়।

অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সবারই মুখের উপরে ও নিচে চোয়াল আছে। সেইজন্য, ইহাদের **চোয়াল-যুক্ত** বা **ন্যাথোস্টোমাটা** (Gnathostomata) বলা হয়।

মৎস্য বা **পিসেস** (Pisces) অর্থাৎ মাছ-জাতীয় প্রাণীরা চোয়াল-যুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অগ্রগণ্য। দেহের অঙ্কদেশে অবস্থিত দুই জোড়া **যুগ্ম পাখ্‌না** (Paired fins) এই-জাতীয় প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহা ছাড়া, প্রায় সবারই দেহ **আঁইশ** (Scale) দিয়া ঢাকা থাকে। ইহাদের আঁইশ
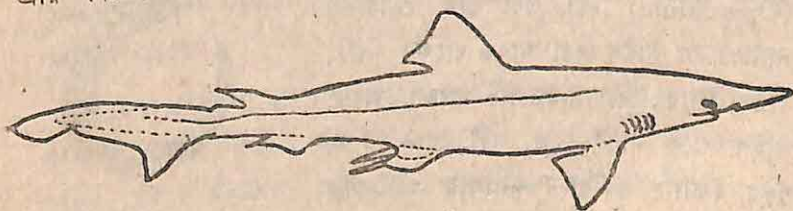
১১৪নং চিত্র—হাঙর।

ত্বকের গভীর স্তর হইতে উৎপন্ন হয়। মাছেরা **ফুলকা**(Gill)-র সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়া শ্বসন সম্পন্ন করে।

সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর মৎস্য দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর মৎস্যদের কঙ্কাল (Skeleton) **কোমলাস্থি, তরুণাস্থি** বা **কার্টিলেজ** (Cartilage) দিয়া গঠিত। তরুণাস্থি অস্থি(Bone)-র মতো শক্ত নয়, বরং নরম। কিন্তু কখনও কখনও উহাতে চূর্ণকময় পদার্থ জমা হইয়া, খুব শক্ত হয়। ইহাদের আঁইশ বালিদানার মতো। এই-শ্রেণীর মাছেরা সমুদ্রে বাস করে। বিভিন্ন রকম
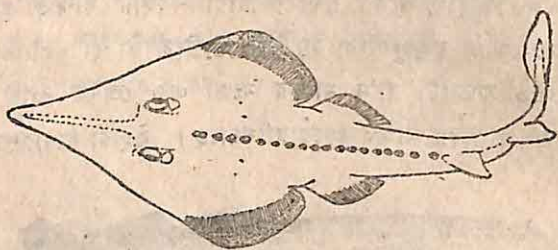
১১৫নং চিত্র—গিটার মাছ।

হাঙর (Sharks), যেমন—ডগ্-ফিশ (Dog fish), টাইগার শার্ক (Tiger shark), শঙ্কর মাছ ও অন্যান্য স্কেট (Skates), ইলেক্ট্রিক রে' (Electric ray), গিটার মাছ (Guitar fish) এই-শ্রেণীর মাছের উদাহরণ। এই-শ্রেণীর মাছ **তরুণাস্থিময় মৎস্য** (Cartilagenous fish) নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাছেদের কঙ্কাল **অস্থি** (Bone) দিয়া গঠিত বলিয়া, ইহাদের **অস্থিময় মৎস্য** (Bony fish) বলা হয়। সচরাচর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত মাছগুলি এই-শ্রেণীর। ইহাদের ফুলকাগুলি **কান্‌কুয়া** বা **অপার্‌কুলাম** (Operculum) দিয়া, এবং দেহ ছোট-বড় নানাধরনের আঁইশ দিয়া আবৃত থাকে। শিঙি, মাগুর, ট্যাংরা, বোয়াল ইত্যাদি মাছের, অবশ্য, আঁইশ থাকে না। সমুদ্র, নদী, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি সব রকম জলাশয়ে এই-শ্রেণীর মাছ পাওয়া যায়। উড়ুক্কু মাছ (Flying fish), সমুদ্র-অশ্ব (Sea-horse), কড (Cod) ইত্যাদি মাছ সমুদ্রে থাকে। উড়ুক্কু মাছের কান্‌কুয়ার পিছনে অবস্থিত পাখ্‌না দুইটি খুব বড়। ইহারা

১১৬নং চিত্র—সমুদ্র-অশ্ব।

লাফাইয়া জলের উপরে উঠিয়া, বেশ কিছুদূর পর্যন্ত বায়ুতে ভাসিয়া যাইতে পারে। সমুদ্র-অশ্ব দেখিতে অদ্ভুত। হঠাৎ মাছ বলিয়া মনে হয় না। মুখটি অনেকটা ঘোড়ার মুখের মতো। পুরুষ সমুদ্র-অশ্ব পেটের কাছে অবস্থিত থলি(Brood pouch)-র মধ্যে ডিম বহিয়া বেড়ায়। ইলিশ, ভেট্‌কি, তপ্‌সে, পারশে, ভাঙন ইত্যাদি সুস্বাদু মাছ নদীর মোহানা-অঞ্চলে পাওয়া যায়। রুই,
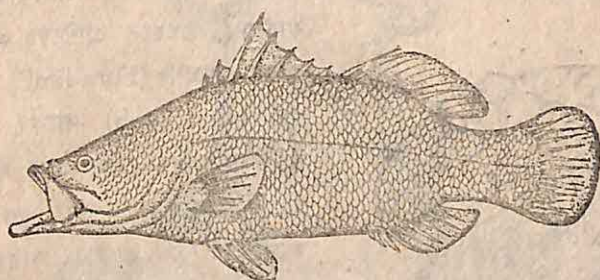
১১৭নং চিত্র—ভেট্‌কি।

কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি পোনা মাছ(Carp)-এর বসতি নদীর মিঠা জলে। তবে পুকুরে ইহাদের চাষ খুব প্রচলিত। কৈ, শিঙি, মাগুর, ল্যাঠা, শাল, শোল ইত্যাদি মাছ ময়লা জলে স্বচ্ছন্দে বাস করে।

অস্থিময় মৎস্যদের কয়েকটি আবার অদ্ভুত প্রকৃতির। শ্বসনের জন্য ইহাদের যেমন ফুলকা আছে, তেমনি **ফুস্‌ফুস্**(Lungs)-ও আছে। পট্‌কা (Air bladder, Swim bladder) রূপান্তরিত হইয়া ইহাদের ফুস্‌ফুস্ তৈয়ারি হয়। সেইজন্য, এই ধরনের মাছকে **ফুস্‌ফুস্-মৎস্য** (**Lung fish**) বলে। ইহারা বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার নিওসেরাটো-ডাস (*Neoceratodus*), দক্ষিণ আমেরিকার লেপিডোসাইরেন (*Lepidosiren*) এবং আফ্রিকার প্রোটোপ্‌টেরাস (*Protopterus*)—তিন ধরনের ফুস্‌ফুস্-মৎস্যের উদাহরণ।

মাছেরা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সংখ্যায় সব থেকে বেশি। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির মাছ জানা আছে। প্রায় সব দেশেই মাছ প্রিয় খাদ্য। কড ও হাঙরের যকৃৎ হইতে প্রাপ্ত তৈল মূল্যবান ঔষধ। অখাদ্য মাছের দেহাবশেষ হইতে সার প্রস্তুত করা হয়। রুই ইত্যাদি মাছের আঁইশের সাদা পদার্থ দিয়া কাচ-নির্মিত কৃত্রিম মুক্তা তৈয়ারি করা হয়। কৈ, খলিসা, তে-চোখো ইত্যাদি মাছ মশার শূককীট খাইয়া, ম্যালেরিয়া দমনে সাহায্য

করে। কয়েক ধরনের সামুদ্রিক মাছ খাইলে, বিষক্রিয়া দেখা দেয়। বোয়াল, চিতল, শাল, শোল ইত্যাদি মৎস্যভুক্ মাছ পোনা মাছের বাচ্চা খাইয়া, মাছ-চাষের প্রচুর ক্ষতি করে।

এক শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী জীবন-চক্রের প্রথমদিকে জলে বাস করে, কিন্তু শেষের দিকে সাধারণতঃ স্থলে কাটায়। ইহাদের **উভয়চর** বা **অ্যাম্ফিবিয়া** (Amphibia) বলা হয়। অবশ্য, ইহাদের কেহ কেহ সারাজীবনই জলে কাটায়। উভয়চর প্রাণীদের এক জোড়া করিয়া অগ্রপদ (Fore limb) ও পশ্চাৎ-পদ (Hind limb) থাকে। ইহাদের ত্বক্ আঁইশ দিয়া ঢাকা থাকে না। বায়ু হইতে অক্সিজেন নেওয়ার জন্ম ইহাদের অনেকেরই এক জোড়া করিয়া ফুসফুস থাকে। কোলা ব্যাঙ (Frog), কুনো ব্যাঙ (Toad), স্যালাম্যাণ্ডার (Salamander), ইক্থিওফিস (*Ichthyophis*) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উভয়চর এই-শ্রেণীর প্রাণীর উদাহরণ। উভয়চর প্রাণীদের জনিতৃ-যত্ন (Parental care) অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি পালনের পদ্ধতি বিস্ময়কর। ইক্থিওফিস কতকটা কেঁচোর মতো। স্ত্রী-ইক্থিওফিস ডিম পাড়িয়া, তাহার চারদিকে দেহকে প্যাঁচাইয়া রাখে। পুরুষ-ধাত্রী ব্যাঙ (Midwife toad) বা অ্যালাইটিস (*Alytes*) পিছনের দুই পায়ের উপরে ডিম ধারণ করিয়া রাখে। স্ত্রী-সুরিনাম ব্যাঙ (Surinam toad) বা পাইপা (*Pipa*) পিঠের গর্তের মধ্যে ডিম রাখিয়া
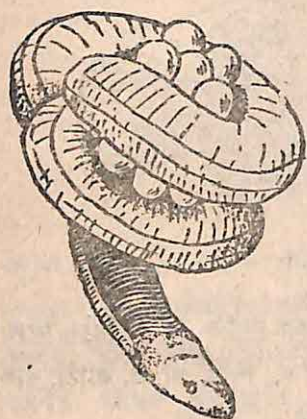
১১৮নং চিত্র—ইক্থিওফিস।

১১৯নং চিত্র—অ্যালাইটিস।

দেয়। স্যালাম্যাণ্ডার দেখিতে কতকটা টিকটিকির মতো। সাইরেন (*Siren*) নামক উভয়চর বা'ন মাছের মতো লম্বা। ইহা জলে থাকে। উভয়চর প্রাণীরা নানা ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় খাইয়া পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার করে।
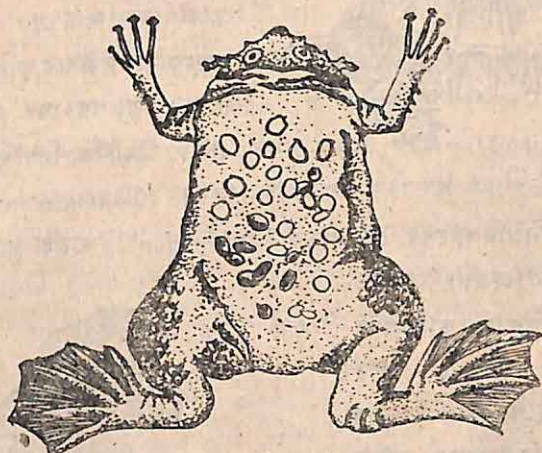
১২০নং চিত্র—পাইপা।

কোলা ব্যাঙ অনেক দেশে সুখাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রায় দুই হাজার প্রজাতির উভয়চর প্রাণীর বিবরণ জানা যায়।

১২১নং চিত্র—স্যালাম্যাণ্ডার।

যে সব মেরুদণ্ডী প্রাণী স্থলের শুষ্ক পরিবেশে স্থায়িভাবে বাস করার উপযুক্ত হইল, **সরীসৃপ** বা **রেপ্‌টিলিয়া** (Reptilia) শ্রেণীর প্রাণীরা তাহাদের অগ্রগণ্য। অবশ্য, কুমির এবং কয়েক জাতের কচ্ছপ জলে বাস করে। কিন্তু ইহারাও বায়ু হইতে অক্সিজেন নেয়। সরীসৃপদের দেহ একধরনের আঁইশ দিয়া আবৃত। এই আঁইশ ত্বকের বাহিরের দিকের স্তরে সৃষ্টি হয়। কুমির ও কচ্ছপের দেহ শক্ত **বর্ম** (Scutes) দিয়া সুরক্ষিত। দাঁত থাকিলেও, সরীসৃপেরা চিবাইয়া খাইতে পারে না, গিলিয়া খায়। ইহারা ডিম পাড়ে।

ডিম হইতে বাচ্চা সরীসৃপ বাহির হয়। দুই জোড়া পদ থাকিলেও, ইহারা সাধারণতঃ মাটির সঙ্গে দেহকে লাগাইয়া চলাফেরা করে। অবশ্য, প্রয়োজনের সময়ে কেহ কেহ দেহকে মাটির উপরে তুলিয়া চলিতে পারে। সাপের পদ অর্থাৎ পা নাই। টিক্‌টিকি, গিরগিটি, ক্যামেলিয়ন (*Chamaeleon*), তক্ষক, গো-সাপ, নিউজিল্যাণ্ডের স্ফেনোডন (*Sphenodon*) ইত্যাদি নানা ধরনের সরীসৃপের উদাহরণ। অতীত যুগের অতিকায় ডাইনোসর (Dinosaur)-ও এই-শ্রেণীর প্রাণী। কচ্ছপের মাংস উপাদেয় খাদ্য। ইহার খোলক হইতে খেলনা তৈয়ারি হয়। কুমির, গো-সাপ ও অজগরের চামড়া হইতে শৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। কয়েক ধরনের সাপ অন্যান্য বিষধর সাপ খাইয়া, পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার করে। সাপের বিষ হইতে ঔষধ তৈয়ারি হয়। কেউটে, শঙ্খ-চূড়, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খিনী ইত্যাদি সাপ বিষধর। ইহাদের বিষ মানুষের পক্ষে মারাত্মক। অবশ্য, সামুদ্রিক সাপ,
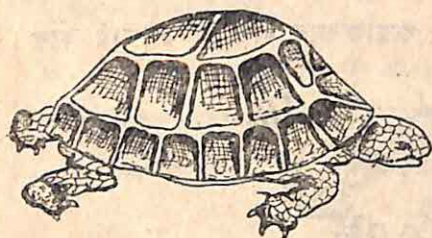
১২২নং চিত্র—কচ্ছপ।

১২৩নং চিত্র—ক্যামেলিয়ন।

১২৪নং চিত্র—অজগর।

উপরোক্ত সাপগুলির তুলনায় অনেক বেশি বিষধর। তক্ষক, গো-সাপ—

ইহারা সাপ নয়, টিকৃটিকি-জাতীয় প্রাণী। ইহাদের বিষ নাই। কুমির মানুষ ও গৃহপালিত জন্তুর প্রাণহানির অন্যতম কারণ। প্রায় পাঁচ হাজার প্রজাতির সরীসৃপের কথা জানা যায়।

পাখিরা স্থলে বসবাসের উপযোগী আর এক শ্রেণীর প্রাণী। ইহারা যে শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহাকে **পক্ষী** বা **আভিস (Aves)** বলা হয়। পাখিদের চোয়াল শক্ত আবরণ-যুক্ত **চঞ্চু**(Beak)-তে পরিবর্তিত হইয়াছে। চঞ্চু এবং পায়ের কিছু অংশ ছাড়া, দেহের অন্যান্য অংশ **পালক** (Feather) দিয়া ঢাকা থাকে। ইহাদের দাঁত নাই। পায়ের পালক-বিহীন অংশে, সরীসৃপদের মতো, আঁইশ থাকে। পাখিরা ডিম পাড়ে এবং ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। ইহাদের অগ্রপদ দুইটি খুব বেশি পরিবর্তিত হইয়া **ডানা** (Wing) সৃষ্টি করিয়াছে। ডানার সাহায্যে ইহারা স্বচ্ছন্দে বায়ুতে উড়িতে পারে। কিন্তু

১২৫নং চিত্র—কিউই।

১২৬নং চিত্র—পেঙ্গুইন।

উটপাখি (Ostrich), এমু (Emu), কিউই (Kiwi) ইত্যাদি পাখির ডানা খুব ছোট বলিয়া, ইহারা উড়িতে পারে না। পেঙ্গুইন পাখি ডানার সাহায্যে জলে ভালো সাঁতার দিতে পারে। অবশ্য, ইহারা উড়িতে পারে না।

আবার, **পরিযায়ী** (Migratory) পাখিরা হাজার হাজার মাইল অবিরাম-ভাবে উড়িয়া, এক দেশ হইতে অন্য দেশে নিয়মিত গমনাগমন করে। প্রায় সব জায়গায়, সকল পরিবেশেই, পাখিদের দেখা মেলে। বক, কাক, চড়ুই, শালিক, বুলবুল, বেনে-বৌ, হলদে পাখি, পেঁচা, খঞ্জন ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের পরিচিত পাখি। ঈগল, বাজ ইত্যাদি পাখি শিকার ধরিতে পটু। ময়ূর,

স্বর্গের পাখি (Bird of paradise), বীণা পাখি (Lyre bird) ইত্যাদির সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর। ময়না, হরবোলা, কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখি শিক্ষা পাইলে, মানুষের কথা অনুকরণ করিতে পারে। দোয়েল ও শ্যামা খুব ভালো শিষ দিতে জানে। পাখিদের সঙ্গে মানুষের দীর্ঘদিনের পরিচয়ে, একদিকে মানুষ যেমন বিভিন্ন পাখিকে আপনার ভোগে লাগাইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে
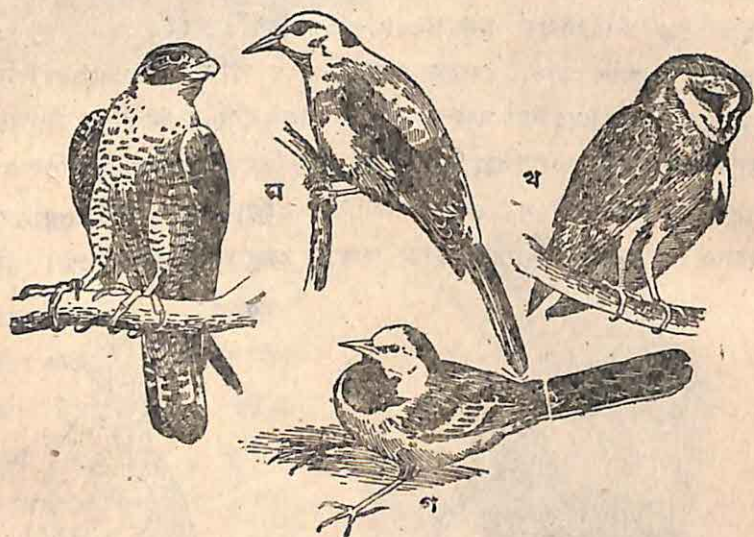
১২৭নং চিত্র—ক. বাজ, খ. লক্ষ্মী পেঁচা, গ. খঞ্জন, ঘ. হলদে পাখি।

নানা পাখির সঙ্গে মানব-মনের নানা সংস্কার যুক্ত হইয়াছে। ডিম এবং মাংসের জন্য মানুষ হাঁস, রাজহাঁস ও মুরগীকে গৃহপালিত করিয়াছে। নানা জাতের কাদা-খোঁচা, বুনো মুরগী, বুনো হাঁস প্রভৃতি পাখির মাংস উপাদেয় খাদ্য। একধরনের সামুদ্রিক পাখির সঞ্চিত বিষ্ঠা হইতে গুয়ানো নামক উৎকৃষ্ট সার পাওয়া যায়। পাখির পালক হইতে গদি ও বালিশ প্রস্তুত করা যায়। কাক, হাড়গিলা, শকুন পচা জিনিস খাইয়া শহর ও গ্রামের স্বাস্থ্য-রক্ষায় সাহায্য করে। পাখিরা ক্ষতিকারক পতঙ্গ খাইয়া পরোক্ষভাবে কৃষির উপকার করে। কিন্তু টিয়া ও অন্যান্য কয়েক ধরনের পাখি শস্যের ক্ষতি করে। টিয়া-জাতীয় পাখিরা মারাত্মক রোগের জীবাণু বহন করে। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৮,৬০০ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়।

পালক-যুক্ত প্রাণী দেখিয়া যেমন পাখি বলিয়া চেনা যায়, তেমনি দেহে **লোম** (Hair) থাকিলে, ঐ প্রাণীকে **স্তন্যপায়ী** বা **ম্যামালিয়া**

(Mammalia) শ্রেণীর প্রাণী বলিয়া ধরা হয়। এই-শ্রেণীর প্রাণীকে মেরুদণ্ডী, তথা সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে উন্নত বলা হয়। ইহারা মায়ের দেহের ভিতর হইতে বাচ্চা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়; বাচ্চা মায়ের **স্তন্য-গ্রন্থি** (Mammary gland) হইতে ক্ষরিত দুগ্ধ পান করিয়া পুষ্ট হয়। সেইজন্য, ইহাদের স্তন্যপায়ী বলে। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর **কর্ণছত্র** বা **পিনা** (Pinna) থাকে।

মানুষ ও গৃহপালিত জন্তুসহ প্রায় ৪,৪০০ বিভিন্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর কথা জানা যায়। হংসচঞ্চু প্লাটিপাস (Duck-billed Platypus) একধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী। কিন্তু ইহারা বাচ্চা প্রসব করে না, সরীসৃপের মতো ডিম
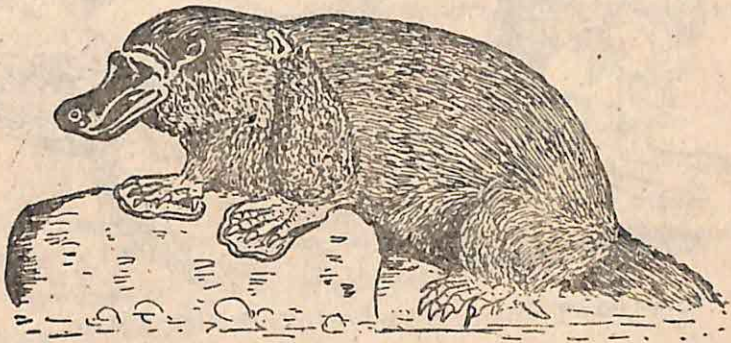
১২৮নং চিত্র—হংসচঞ্চু।

পাড়ে। হাঁসের মতো চঞ্চু বা ঠোঁট থাকায়, ইহাকে হংসচঞ্চু বলে। ক্যাঙারু নামের স্তন্যপায়ী প্রাণীরা অপুষ্ট বাচ্চা প্রসব করে। স্ত্রী-ক্যাঙারু অপুষ্ট বাচ্চাকে পেটের অঙ্কদেশে অবস্থিত **মারসুপিয়াম** (Marsupium) নামক থলিতে বহিয়া বেড়ায়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীরা প্রায় সমস্ত পরিবেশেই বাস করিতে পারে। মরুভূমি, মেরু-অঞ্চল, সমুদ্র, গভীর অরণ্য, তৃণভূমি ইত্যাদিতে কোনও-না-কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেখা মেলে। বাদুড় ও চামচিকা স্তন্যপায়ী প্রাণী হইলেও, পাখিদের মতো উড়িতে পারে। তিমিও স্তন্যপায়ী প্রাণী। ইহারা সমুদ্রে বাস করে এবং দেখিতে কতকটা মাছের মতো। ইহাদের গায়ে মাত্র অল্প কয়েকটি লোম থাকে। নীল তিমি (Blue Whale) নামক তিমি বৃহত্তম জীবিত প্রাণী। হাতি স্থলচর স্তন্যপায়ী, তথা সমস্ত স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। শজারু, বনরুই বা বজ্রকীট, ছুঁচা, বানর, হনুমান, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বাঘ,

সিংহ, ইঁদুর, খরগোস, গিনিপিগ ইত্যাদি আরও কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। শজারু ও বনরুইয়ের লোম যথাক্রমে শক্ত কাঁটায় ও আঁইশে রূপান্তরিত হইয়াছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আগে অবতরণিকায় আলোচনা করা হইয়াছে।
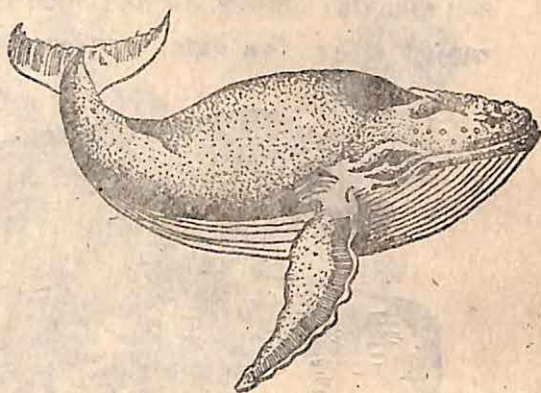
১২৯নং চিত্র—ক্যাঙারু। ১৩০নং চিত্র—তিমি।
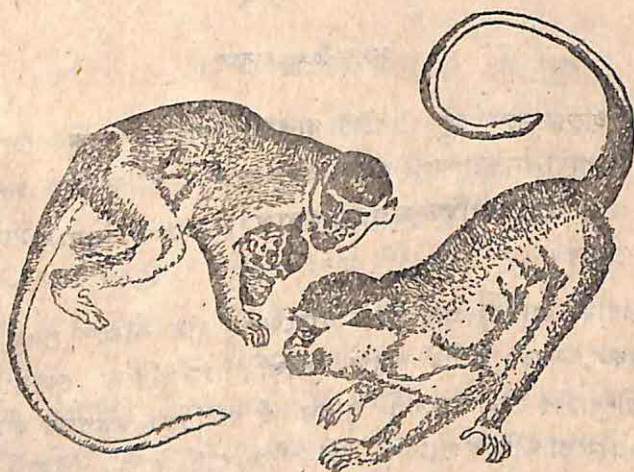
১৩১নং চিত্র—হনুমান।

প্রাণি-রাজ্য বা প্রাণি-সর্গ (Animal Kingdom) জীব-জগৎ(Living world)-এর দুইটি ধারার একটি। সমস্ত প্রাণীই এই প্রাণি-সর্গের অন্তর্গত। উপরে প্রাণি-সর্গের প্রধান পর্বগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা

করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা-বহির্ভূত এমন অনেক প্রাণী আছে, যাহাদের উক্ত পর্বগুলির কোনটিতেই স্থান দেওয়া যায় না। তাহাদের অন্য কতকগুলি পর্বভুক্ত করা হয়।

বৈচিত্র্যময় প্রাণি-সর্গ সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য প্রাণি-বিজ্ঞানীরা প্রাণি-সর্গকে নানাভাবে ভাগ করিয়াছেন। প্রাণি-সর্গকে সরাসরি কয়েকটি পর্বে ভাগ করা একটি অতি প্রচলিত সহজ রীতি। বিভিন্ন প্রাণীদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা মনে রাখিয়া, প্রাণি-সর্গকে আরও নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) দেহের গঠন এবং অভিব্যক্তির ক্রম অনুসারে, প্রাণি-সর্গকে নিচের ছক অনুযায়ী, তিনটি প্রধান উপসর্গে ভাগ করা হয়।

প্রাণি-সর্গ (**Animal Kingdom**)

উপসর্গ আদ্যপ্রাণী (Subkingdom Protozoa)	উপসর্গ প্যারাজোয়া (Subkingdom Parazoa)	উপসর্গ মেটাজোয়া (Subkingdom Metazoa)
পর্ব আদ্যপ্রাণী (Phylum Protozoa)	পর্ব ছিদ্রাল প্রাণী (Phylum Porifera)	অন্যান্য পর্ব (Other phyla)
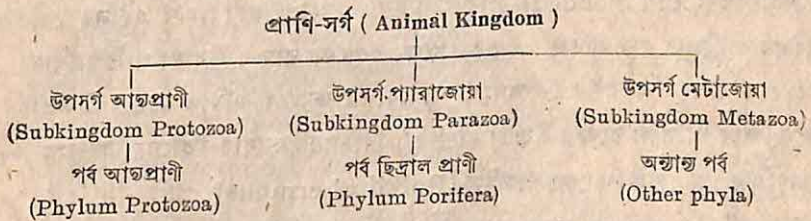
প্রথম উপসর্গের প্রাণীরা সবাই এককোষী। আদ্যপ্রাণী পর্বের প্রাণীরা এই উপসর্গের অন্তর্গত। দ্বিতীয় উপসর্গের প্রাণীরা বহুকোষী। কিন্তু ইহাদের কোষগুলি কলা গঠন করে না। ছিদ্রাল প্রাণী পর্বের প্রাণীরা দ্বিতীয় উপসর্গের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় উপসর্গের প্রাণীরাও বহুকোষী। ইহাদের দেহে কলা, কলাতন্ত্র ইত্যাদি থাকে। আদ্যপ্রাণী ও ছিদ্রাল প্রাণী ছাড়া, অন্য সমস্ত প্রাণীই তৃতীয় উপসর্গের অন্তর্গত। অবশ্য, বহুকোষী প্রাণী বলিতে আদ্যপ্রাণী ছাড়া অন্য সব প্রাণীকেই বোঝায়।

(২) নোটোকর্ডের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি অনুযায়ী, প্রাণি-সর্গকে নিচে লিখিত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

প্রাণি-সর্গ (**Animal Kingdom**)

আকর্ডাটা (Achordata) বা ননকর্ডাটা (Nonchordata)	কর্ডাটা (Chordata)
নোটোকর্ড থাকে না। যেমন—কর্ডাটা ছাড়া অন্য সব পর্বের প্রাণী।	নোটোকর্ড থাকে। যেমন—কর্ডাটা পর্বের প্রাণী।
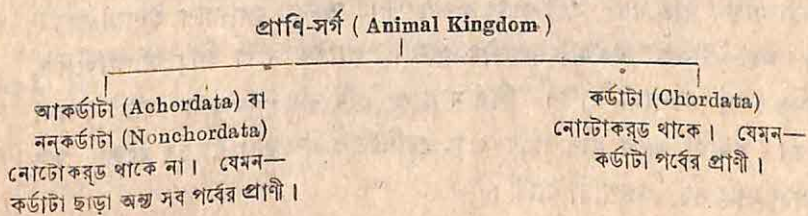
(৩) মেরুদণ্ডের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি অনুযায়ী, প্রাণি-সর্গকে নিচে লিখিতভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রাণি-সর্গ (**Animal Kingdom**)

অমেরুদণ্ডী (Invertebrata)	মেরুদণ্ডী (Vertebrata)
মেরুদণ্ড থাকে না। যেমন—কর্ডাটা ছাড়া, অন্য সব পর্বের প্রাণী এবং কর্ডাটা পর্বের আদ্যকর্ডাটা দলের প্রাণী।	মেরুদণ্ড থাকে। যেমন—আদ্যকর্ডাটা ছাড়া, কর্ডাটা পর্বের অন্য সব প্রাণী।

মৎস্য, উভয়চর ও সরীসৃপ—এই তিন শ্রেণীর প্রাণীদের সাধারণভাবে শীতল-রক্তবিশিষ্ট (Cold blooded) প্রাণী বলা হয়। অবশ্য, ইহার অর্থ এই নয় যে, এইসব প্রাণীদের রক্ত শীতল। প্রকৃতপক্ষে, ইহাদের রক্তের উষ্ণতা পারিপার্শ্বিক উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল; অর্থাৎ, পরিবেশের উষ্ণতা কমিলে রক্তের উষ্ণতা কমে, আর বাড়িলে রক্তের উষ্ণতা বাড়ে। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাদের **অনুষ্ণশোণিত** বা **পইকিলোথার্মাস** (Poikilothermous) প্রাণী বলা হয়। এই অসুবিধার জন্য যে সমস্ত স্থানে খুব বেশি ঠাণ্ডা অথবা বেশি গরম, সেই সমস্ত এলাকায় ইহাদের স্বাভাবিকভাবে বাস করা খুবই কষ্টকর। পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তেমনি সাধারণভাবে উষ্ণ-রক্তবিশিষ্ট (Warm blooded) প্রাণী বলা হয়। সব সময় এবং সমস্ত পরিবেশে ইহাদের রক্তের উষ্ণতা মোটামুটি একই থাকে; বাহিরের উষ্ণতা কমা-বাড়ার উপর ইহাদের রক্তের উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে না। সেইজন্য, ইহাদের **সমোষ্ণশোণিত** বা **হোমোআইয়োথার্মাস** (Homoiothermous) প্রাণী বলে। গ্রীষ্মমণ্ডল এবং মেরু-অঞ্চলে ইহারা সমান স্বচ্ছন্দে বাস করে।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, জেলি-ফিশ মাছ নয়, একনালীদেহী প্রাণী। সাধারণের কাছে চিংড়ি মাছ বলিয়া পরিচিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা সন্ধিপদ প্রাণী। তারা-মাছও মাছ নয়; ইহা কণ্টকত্বক প্রাণী। তক্ষক, গো-সাপ, ইহারা কেহই সাপ নয়, উভয়েই টিকটিকি-জাতীয় প্রাণী। পাখির মতো উড়িতে পারিলেও, বাদুড় কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণী। সিল মাছ ও তিমি মাছ—এ-কথা প্রায়ই শোনা যায়। ইহারা জলে বাস করে এবং দেখিতেও কতকটা মাছের মতো; তবু ইহারা মাছ নয়, স্তন্যপায়ী প্রাণী।

প্রাণি-সৃষ্টির আদিপর্বে মাত্র কয়েক রকম জটিলতা-বর্জিত প্রাণী ছিল। তাহার পর লক্ষ লক্ষ বছর কাটিয়া গিয়াছে। অভিব্যক্তির বিচিত্র গতিপথে পৃথিবী বিচিত্রতর প্রাণীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। মানুষ এই প্রাণি-রাজ্যের অন্যতম সদস্য-মাত্র। বিভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে এক আপাতঃ-অনির্দেশ্য যোগসূত্র প্রাণি-রাজ্যের অস্তিত্বকে ছন্দোময় করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের বিজীগিষা ও জিঘাংসা বার বার এই ছন্দের পতন ঘটাইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক প্রাণীই স্বকীয় অস্তিত্বে সার্থক। বোধ হয়, কোনও প্রাণীই মানুষের পুরাপুরি শত্রু নয়।

অনুশীলনী

১। উদাহরণসহ প্রাণি-সর্গের প্রধান পর্বগুলি সম্বন্ধে একটি সাধারণ বর্ণনা দাও।
Give an outline description of the main phyla of the animal kingdom, citing examples in each case.

২। কেঁচো যে পর্বের অন্তর্ভুক্ত সেই পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ। [*cp*, H. S. 1970 (Comp.)]
Characterise the phylum to which earthworm belongs.

৩। আকর্ডাটা প্রাণীদের পর্বে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি পর্বের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। চিংড়ি যে পর্বের অন্তর্ভুক্ত সেই পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ। [H. S. 1970]
Classify Achordata into its phyla giving one example of each phylum. Write the characteristics of the phylum to which Prawn belongs.

৪। নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির কোনটি মেরুদণ্ডী এবং কোনটি অমেরুদণ্ডী ?
সাপ, হাইড্রা, হাঙর, বাদুড়, আরসোলা এবং গোলকৃমি। [*cp*. H. S. 1970 (Comp.)]
Which of the undermentioned animals are Vertebrates and which are Invertebrates ?
Snake ; *Hydra* ; Shark ; Bat ; Cockroach ; and Round worm.

৫। কয়েকটি রোগ-সৃষ্টিকারী পরজীবী প্রাণীর নাম কর। উহারা কে কি রোগ সৃষ্টি করে, তাহা বল।
Name some parasitic animals causing diseases. Mention in each case the diseases caused by them.

৬। মানুষের উপকারী কয়েকটি প্রাণীর নাম কর। উহারা আমাদের কি উপকারে আসে, তাহা বল।
Name some animals beneficial to human beings. State how they are useful to us.

৭। মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক কয়েকটি প্রাণীর নাম কর। উহারা কিভাবে আমাদের ক্ষতি করে, তাহা বল।
Name some animals harmful to human beings. Mention how they do harm to us.

কয়েকটি প্রাণীর বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি
(Distinctive external features of a few animals)
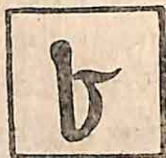
এই পরিচ্ছেদে হাইড্রা, কেঁচো, চিংড়ি, আরসোলা, তেঁতুলে বিছা, মাকড়সা, শামুক, কৈ মাছ, মাগুর মাছ, শিঙি মাছ, রুই মাছ, কোলা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, টিকটিকি, পায়রা ও গিনিপিগ—এই কয়টি প্রাণীর বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি বর্ণনা করা হইল। পরের পরিচ্ছেদে কেঁচো, চিংড়ি, আরসোলা, রুই মাছ, কোলা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, পায়রা এবং গিনিপিগের বসতি, স্বভাব ও বহিরাকৃতির বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। হাইড্রা ও টিকটিকির ঐরকম বর্ণনার জন্য যথাক্রমে জীব-বিজ্ঞান—তৃতীয় খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য। অন্যান্য প্রাণীগুলির বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি বর্ণনা-প্রসঙ্গে উহাদের বসতি ও স্বভাব সম্বন্ধেও এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইল।

হাইড্রা
(Hydra)

হাইড্রা সিলেন্‌টেরেটা পর্ব(Phylum Coelenterata)-এর অন্তর্গত হাইড্রোজোয়া শ্রেণী(Class Hydrozoa)*-র প্রাণী। আগেই বলা হইয়াছে, ইহা মিঠা জলে বাস করে। পশ্চিমবঙ্গে যে হাইড্রা পাওয়া যায়, তাহার বিজ্ঞান-সম্মত নাম এবং বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি নিচে দেওয়া হইল।

বিজ্ঞান-সম্মত নাম— **হাইড্রা ভুলগারিস** (*Hydra vulgaris*)।

(১) হাইড্রার দেহ সরু নলের মতো; স্বাভাবিক অবস্থায় লম্বায় দশ হইতে পনেরো মিলিমিটার। কিন্তু প্রসারিত হইলে ত্রিশ মিলিমিটার পর্যন্ত হইতে পারে। সঙ্কুচিত হইলে, অবশ্য, খুব বেঁটে হইয়া যায়।

(২) ইহার দেহ **অরীয়ভাবে প্রতিসম (Radially symmetrical)**।

(৩) দেহের এক প্রান্ত দিয়া হাইড্রা জলজ উদ্ভিদের সঙ্গে আট্‌কাইয়া

* প্রাণীদের শ্রেণী-বিন্যাস ও নামকরণ-রীতি জীব-বিজ্ঞান—দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচ্য।

থাকে। ঐ প্রান্তকে **পাদচক্র, পেডাল ডিস্ক (Pedal disk)** বা **বেসাল ডিস্ক (Basal disk)** বলা হয়।

(৪) দেহের অন্য প্রান্তের কাছে সাধারণতঃ ছয়টি সুতার মতো সরু **কর্ষিকা** বা **টেন্‌টাক্‌ল (Tentacles)** থাকে।
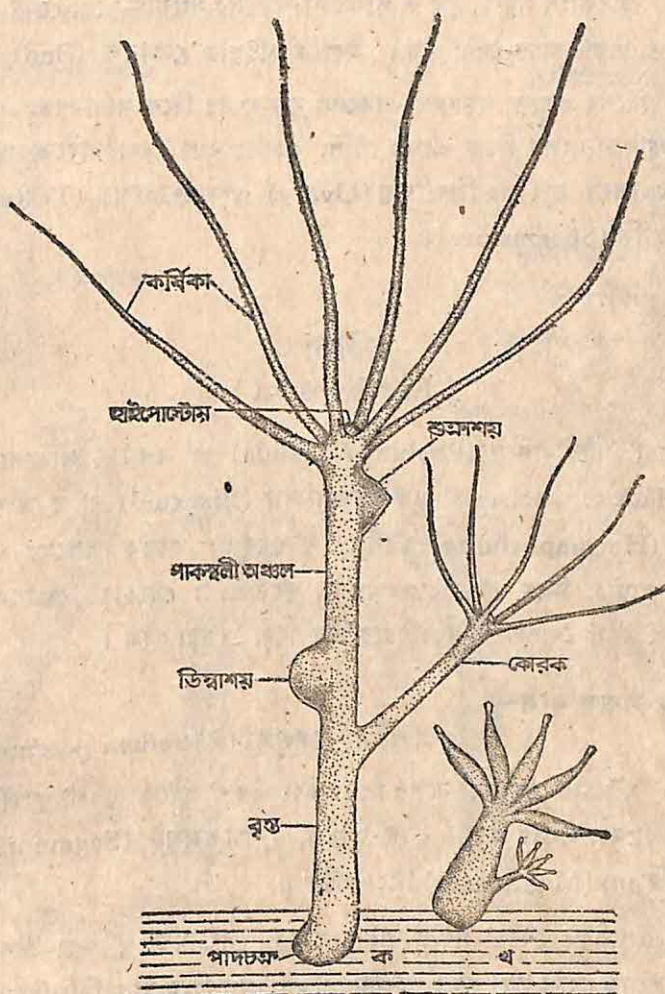
১৩২নং চিত্র—হাইড্রা : ক. স্বাভাবিক অবস্থা, খ. সঙ্কুচিত অবস্থা।

(৫) কর্ষিকা দিয়া বেষ্টিত দেহাংশের পরে অবস্থিত ছোট শাঙ্কব অংশটিকে **হাইপোস্টোম (Hypostome)** বলা হয়।

(৬) হাইপোস্টোমের প্রান্তে ছোট তারকাকার **মুখ (Mouth)** থাকে।

(৭) পাদচক্র ও কর্ষিকার উৎপত্তি-স্থলের মধ্যবর্তী অংশকে আবার দুইটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। যেমন—(ক) **বৃন্ত** (Stalk)—ইহা পাদচক্রের ঠিক পরে অবস্থিত এবং কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত; (খ) **পাকস্থলী-অঞ্চল** (Gastric region)—ইহা বৃন্ত এবং কর্ষিকার উৎপত্তি-স্থলের মধ্যবর্তী অংশ।

(৮) অধিকাংশ সময়ে, বৃন্ত ও পাকস্থলী-অঞ্চলের সংযোগ-স্থলে, ছোট হাইড্রার মতো একটি অংশ দেখা যায়। ইহাকে হাইড্রার **কোরক** (Bud) বলে।

(৯) বিশেষ ঋতুতে, পাকস্থলী-অঞ্চলের বৃন্ত-সংলগ্ন দিকে সাধারণতঃ একটি, অথবা কর্ষিকা-সংলগ্ন দিকে একের বেশি, ফোলা অংশ দেখা যাইতে পারে। ইহারা যথাক্রমে হাইড্রার **ডিম্বাশয়** (Ovary) এবং **শুক্রাশয়** (Testes) বা **স্পারমারি** (Spermaries)।

কেঁচো
(Earthworm)

কেঁচো অঙ্গুরীমাল পর্ব(Phylum Annelida)-এর অন্তর্গত, অলিগোকিটা শ্রেণী(Class Oligochaeta)-ভুক্ত **উভয়লিঙ্গ** (Bisexual) বা **হার্মাফ্রোডাইট** (Hermaphrodite) প্রাণী। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক রকমের কেঁচো পাওয়া যায়। নিচে পশ্চিমবঙ্গে অন্যতম সহজপ্রাপ্য কেঁচোর বিজ্ঞান-সম্মত নাম এবং উহার বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতির বর্ণনা দেওয়া হইল।

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—

ফেরিটিমা পস্‌থুমা (*Pheretima posthuma*)।

(১) কেঁচোর দেহ লম্বা নলের মতো এবং একশ' হইতে একশ' কুড়িটি পর পর সাজানো আংটির মতো **দেহ-খণ্ডক, সেগ্‌মেন্ট** (Segments) বা **মেটামিয়ার** (Metameres) নিয়া গঠিত।

(২) পরিণত কেঁচো লম্বায় প্রায় পনেরো সেন্টিমিটার; তবে প্রসারিত হইলে, অনেক বেশি লম্বা হয়। ইহার দেহের ব্যাস প্রায় পাঁচ মিলিমিটার।

(৩) ইহার পৃষ্ঠদেশের রঙ কাল্‌চে বাদামী; অঙ্কদেশ হাল্‌কা বাদামী রঙের। পৃষ্ঠদেশের মধ্যরেখা-বরাবর একটি কালো দাগ থাকে।

(৪) কেঁচো **দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম** (Bilaterally symmetrical)।

(৫) কেঁচোর দেহ নরম কিউটিকল(Cuticle)-এর পাতলা আবরণ দিয়া ঢাকা।

(৬) প্রথম দেহ-খণ্ডকের অগ্র-প্রান্তের পৃষ্ঠদেশ হইতে একটি ছোট মাংস-পিণ্ড মুখের উপর হইতে ঝুঁকিয়া থাকে। ইহাকে **ওষ্ঠ** বা **প্রস্টোমিয়াম (Prostomium)** বলে।
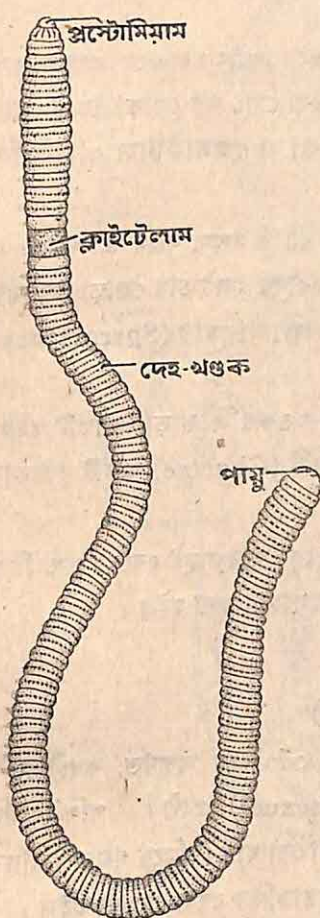
১৩৩নং চিত্র—কেঁচো (পৃষ্ঠদৃশ্য)। ১৩৪নং চিত্র—কেঁচো (অঙ্কদৃশ্য)।
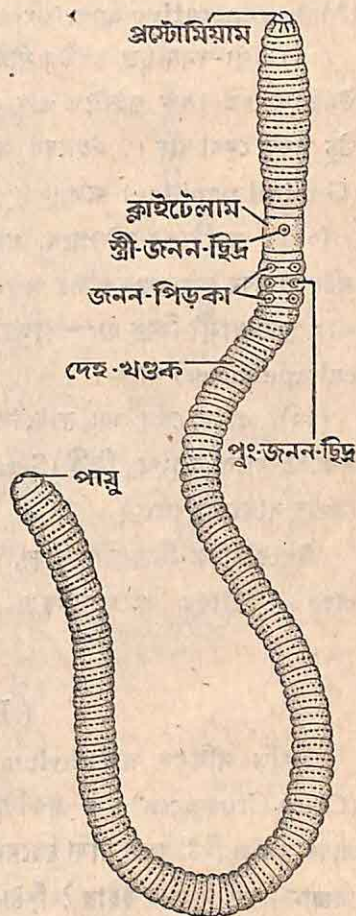
(৭) শেষ দেহ-খণ্ডকের পশ্চাৎ-প্রান্তে একটি ছিদ্র থাকে। ইহা কেঁচোর পায়ু (**Anus**)।

(৮) চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ দেহ-খণ্ডকগুলিকে ঘিরিয়া, উজ্জ্বল বাদামী রঙের ফিতার মতো একটি আবরণ দেখা যায়। ইহাকে **ক্লাইটেলাম**

(Clitellum ; ল্যাটিন *clitelae*=পল্যয়ন) বা **সিঙ্গুলাম** (Cingulum ; ল্যাটিন *cinglum*=বলয়) বলে।

(৯) চতুর্দশ দেহ-খণ্ডকের অঙ্কদেশের মধ্যরেখায় একটি **স্ত্রী-জননছিদ্র** (Female generative aperture) থাকে।

(১০) অষ্টাদশ দেহ-খণ্ডকের অঙ্কদেশে পাশাপাশি দুইটি **পুং-জননছিদ্র** (Male generative apertures) থাকে।

(১১) পুং-জননছিদ্র দুইটির সামনে ও পিছনে অর্থাৎ যথাক্রমে সপ্তদশ এবং উনবিংশ দেহ-খণ্ডক দুইটিতে এক জোড়া করিয়া মোট দুই জোড়া ছোট ছোট উঁচু অঞ্চল দেখা যায়। ইহাদের **জননপিড়কা** বা **জেনাইটাল প্যাপিলি** (Genital papillae) বলে।

(১২) অঙ্কদেশের দুই পাশে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ, ষষ্ঠ ও সপ্তম, সপ্তম ও অষ্টম এবং অষ্টম ও নবম দেহ-খণ্ডকগুলির অন্তর্বর্তী খাঁজ-বরাবর মোট চার জোড়া উপবৃত্তাকার **শুক্রধানী-ছিদ্র** বা **স্পার্মাথিক্যাল অ্যাপার্চার** (Spermathaecal apertures) থাকে।

(১৩) প্রথম, শেষ এবং ক্লাইটেলামের দেহ-খণ্ডকগুলি ছাড়া, প্রতিটি দেহ-খণ্ডকের মাঝে অসংখ্য **সিটি** (Setae) বা **কিটি** (Chaetae) একটি বৃত্তাকার রেখায় সাজানো থাকে।

উপরে বর্ণিত ছিদ্রগুলি ছাড়া, কেঁচোর দেহে আরও দুই ধরনের সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। ইহাদের বিষয়ে পরের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইল।

চিংড়ি
(Prawn)

চিংড়ি সন্ধিপদ পর্ব(Phylum Arthropoda)-এর অন্তর্গত, কবচী শ্রেণী (Class Crustacea)-ভুক্ত **একলিঙ্গ** (Unisexual) প্রাণী। পশ্চিমবঙ্গের লাবণ জল ও মিঠা জলে নানা ধরনের চিংড়ি পাওয়া যায়। নিচে গলদা চিংড়ির বিজ্ঞান-সম্মত নাম ও উহার বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতির বর্ণনা দেওয়া হইল।

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—

প্যালিমন কার্সিনাস (*Palaemon carcinus*)*।

(১) গলদা চিংড়ির দেহ লম্বাটে, সামনের দিক মোটা, পিছনের দিক সরু। ইহা লম্বায় কুড়ি সেন্টিমিটার পর্যন্ত হইতে পারে।

* বর্তমান নাম—ম্যাক্রোব্রেকিয়াম রোজেন্‌বার্জী (*Macrobrachium rosenbergii*)।

১৩৫নং চিত্র—চিংড়ি।

7903
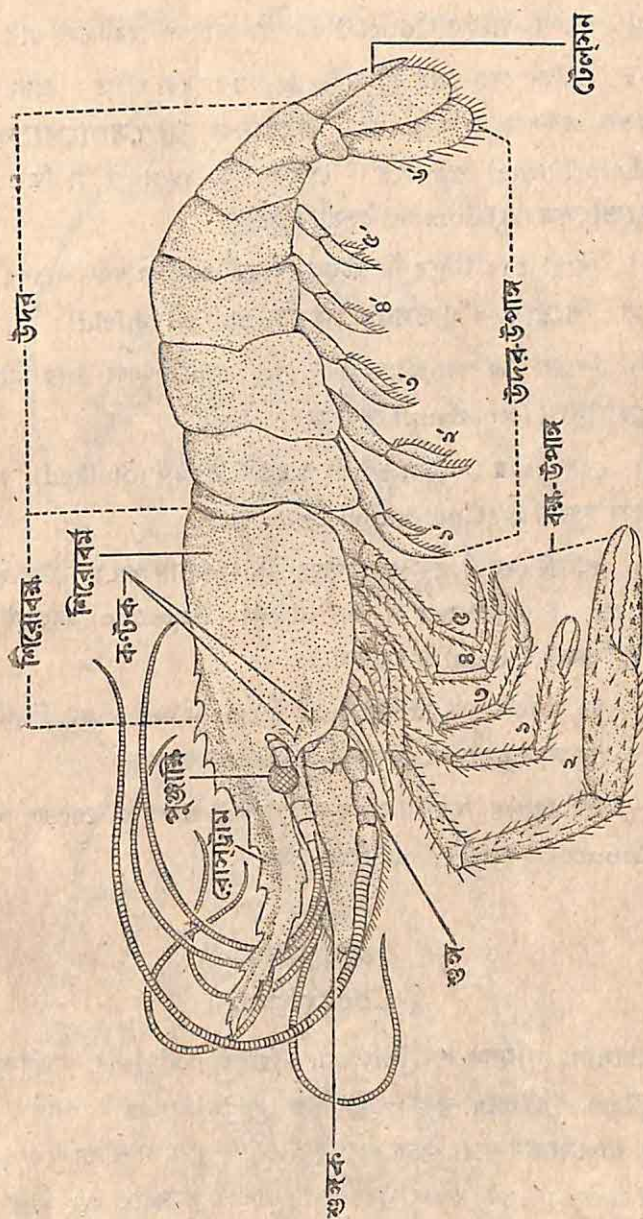
(২) ইহা দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম।

(৩) শক্ত কিউটিকূল(Cuticle)-এর পুরু আবরণ দিয়া দেহ ঢাকা থাকে।

(৪) চিংড়ির দেহ মোট উনিশটি দেহ-খণ্ডক দিয়া গঠিত। প্রথম তেরোটি দেহ-খণ্ডক একসঙ্গে জুড়িয়া গিয়া **শিরোবক্ষ** বা **সেফালোথোরাক্স** (Cephalothorax) সৃষ্টি করে। শেষ ছয়টি দেহ-খণ্ডক চিংড়ির উদর বা **অ্যাব্ডোমেন** (Abdomen) তৈয়ারি করে।

(৫) শিরোবক্ষের উপরে কিউটিকূল-নির্মিত এক খণ্ড শক্ত আবরণ থাকে; ইহার নাম **শিরোবর্ম*** বা **ডর্সাল শিল্ড** (Dorsal shield)।

(৬) শিরোবর্মের অগ্র-প্রান্তে একটি সরু, সূচালো এবং উপর-নিচে খাঁজ-কাটা **রোস্ট্রাম** (Rostrum) দেখা যায়।

(৭) রোস্ট্রামের গোড়ায়, দুই পাশে দুইটি সবৃন্তক (Stalked), কালো ও গোলাকার **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eyes) থাকে।

(৮) প্রতিটি দেহ-খণ্ডকে এক জোড়া করিয়া উপাঙ্গ থাকে। ইহাদের মধ্যে শিরোবক্ষের দুই জোড়া **শুঙ্গ** বা **অ্যান্টেনা** (Antenna) এবং দুই জোড়া **দাঁড়া** বা **কিলা** (Chela) উল্লেখযোগ্য।

(৯) ষষ্ঠ উদর-খণ্ডক(Abdominal segment)-এর পিছন দিকে একটি শাঙ্কব ও সূচালো **পুচ্ছক** বা **টেল্সন** (Telson) থাকে।

(১০) শিরোবক্ষের অগ্রভাগের অঙ্কদেশে এবং পুচ্ছকের গোড়ায় যথাক্রমে **মুখ** (Mouth) ও **পায়ু** (Anus) অবস্থিত।

আরসোলা
(Cockroach)

আরসোলা সন্ধিপদ পর্ব(Phylum Arthropoda)-এর অন্তর্গত, পতঙ্গ শ্রেণী(Class Insecta)-ভুক্ত **একলিঙ্গ** (Unisexual) প্রাণী। কয়েক ধরনের আরসোলার মধ্যে, সচরাচর দুই রকম আরসোলা পশ্চিমবঙ্গে গৃহস্থালির অন্যতম উপদ্রব। দুই রকম আরসোলার প্রথমটি আকারে বড়, অন্যটি ছোট। পরের পৃষ্ঠায় বড় আরসোলার বিজ্ঞান-সম্মত নাম ও উহার বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতির বর্ণনা দেওয়া হইল।

* অনেকে ইহাকে কৃত্তিকাবর্ম বা ক্যারাপেস (Carapace) বলেন।

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—

পেরিপ্লানেটা অ্যামেরিকানা (*Periplaneta americana*)।
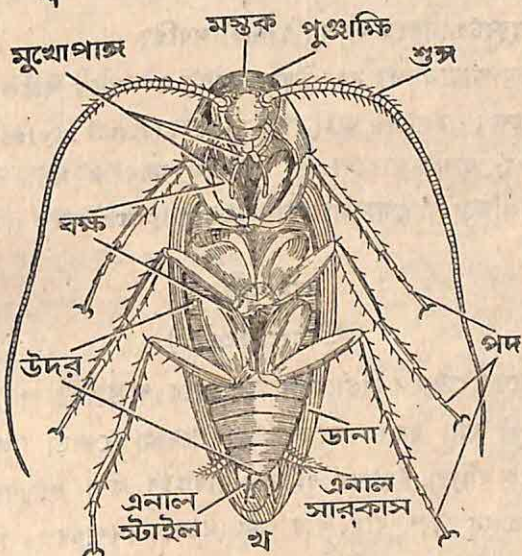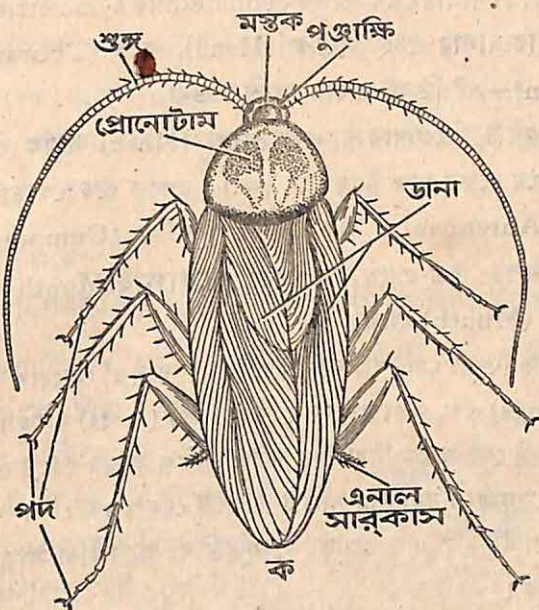
১৩৬নং চিত্র—আরসোলা: ক. পৃষ্ঠদৃশ্য, খ. অঙ্কদৃশ্য।

(১) আরসোলা উপর-নিচে চাপা লম্বাটে পতঙ্গ। ইহা লম্বায় প্রায় পাঁচ

সেন্টিমিটার। ইহার দেহ গাঢ় বাদামী রঙের কিউটিকল-এর আবরণ দিয়া আবৃত।

(২) ইহা দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম (Bilaterally symmetrical)।

(৩) আরসোলার দেহ **মস্তক** (Head), **বক্ষ** (Thorax) ও **উদর** (Abdomen)—এই তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত।

(৪) মস্তকটি ত্রিকোণাকার এবং **গ্রীবা** (Neck) নামক ছোট একটি অংশের মাধ্যমে বক্ষের সঙ্গে উলম্বভাবে যুক্ত। মস্তকে এক জোড়া বহু গাঁইট-যুক্ত **শুঙ্গ** (Antennae) ও এক জোড়া **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eyes) থাকে। মস্তকের অগ্র-প্রান্তে অবস্থিত **মুখোপাঙ্গ**(Mouth parts)-এর গোড়ায় **মুখ** (Mouth) থাকে।

(৫) বক্ষ তিনটি দেহ-খণ্ডক নিয়া গঠিত। বক্ষের পৃষ্ঠদেশে দুই জোড়া **ডানা** (Wings) এবং অঙ্কদেশে তিন জোড়া **পদ** (Legs) থাকে।

(৬) দশটি দেহ-খণ্ডক নিয়া উদর গঠিত; কিন্তু বাহির হইতে স্ত্রী- ও পুরুষ-আরসোলার অঙ্কদেশে যথাক্রমে সাতটি ও নয়টি দেহ-খণ্ডক দেখা যায়। শেষ দেহ-খণ্ডকে গাঁইট-যুক্ত এক জোড়া **পায়ুকূর্চ** বা **অ্যানাল সার্সি** (Anal cerci)* থাকে।

(৭) পায়ুকূর্চের নিকটে **পায়ু** (Anus) অবস্থিত।

(৮) পুরুষ-আরসোলার নবম উদর-খণ্ডকের দুই পাশে আরও দুইটি গাঁইট-বিহীন কূর্চ থাকে। ইহাদের **অ্যানাল স্টাইল** (Anal styles) বলে।

(৯) পুরুষ- ও স্ত্রী-আরসোলার যথাক্রমে নবম ও সপ্তম উদর-খণ্ডকের অঙ্কদেশে **জননছিদ্র** বা **গোনোপোর** (Gonopore) থাকে।

শতপদী
(Centipede)

বিভিন্ন জাতের তেঁতুলে বিছাকে সাধারণভাবে **শতপদী** বা **সেন্টিপেড** (Centipedes) বলা হয়। অনেকগুলি (পনেরো জোড়া অথবা তাহার বেশি) পদ থাকে বলিয়া, ইহাদের এইরকম নামকরণ করা হইয়াছে। ইহারা প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করে এবং স্বভাবে নিশাচর। দিনের বেলা আবর্জনাপূর্ণ স্যাঁতসেঁতে, অপরিষ্কার, অন্ধকার স্থানে লুকাইয়া থাকে; রাত্রে খাবারের খোঁজে বাহির হয়। ইহারা সাধারণতঃ কেঁচো, পতঙ্গ ইত্যাদি

* বহুবচন; অ্যানাল সার্কাস (Anal cercus) — একবচন।

শিকার করিয়া খায় ; বড় জাতের তেঁতুলে বিছারা টিক্‌টিকি অথবা নেংটি ইঁদুরও শিকার করিতে পারে। অধিকাংশ তেঁতুলে বিছা বিষধর ; ইহাদের বিষ মানুষের পক্ষেও বেদনাদায়ক। তেঁতুলে বিছা সন্ধিপদ পর্ব(Phylum Arthropoda)-এর অন্তর্গত, মীরিয়াপোডা শ্রেণী(Class Myriapoda)-ভুক্ত একলিঙ্গ প্রাণী। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক জাতের তেঁতুলে বিছা পাওয়া যায়। নিচে পশ্চিমবঙ্গে সচরাচর প্রাপ্য তেঁতুলে বিছার বিজ্ঞান-সম্মত নাম এবং উহার বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতির বর্ণনা দেওয়া হইল।

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—

স্কোলোপেনড্রা অ্যামাজোনিকা (*Scolopendra amazonica*)।

(১) তেঁতুলে বিছার দেহ লম্বাটে, উপর-নিচে চাপা, তেঁতুলের বীচির মতো কুড়িটি দেহ-খণ্ডক নিয়া গঠিত এবং দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম (Bilaterally symmetrical)। সমগ্র দেহ অপেক্ষাকৃত নরম কিউটিকল-এর আবরণ দিয়া আবৃত। ইহারা লম্বায় সাধারণতঃ পঁচিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়।

(২) দেহ **মস্তক** (Head) ও **দেহ-কাণ্ড**(Trunk)-এ বিভক্ত।

(৩) মস্তকের অগ্রভাগে চৌদ্দ গাঁইট-যুক্ত এক জোড়া **শুঙ্গ** (Antennae) থাকে। ইহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়।

(৪) মস্তকের সম্মুখভাগে কতকগুলি **সরলাক্ষি** (Simple eyes) বা **অসিলি** (Ocelli) পুঞ্জীভূত অবস্থায় থাকে।

(৫) মস্তকের অগ্রভাগে **মুখ** (Mouth) অবস্থিত।

(৬) মুখের দুই পাশে এক জোড়া **চোয়াল** বা **ম্যাণ্ডিব্‌ল**(Mandibles) এবং তাহার পিছনে এক জোড়া **ম্যাক্সিলি** (Maxillae) থাকে। ইহারা খাদ্যগ্রহণে সাহায্য করে।
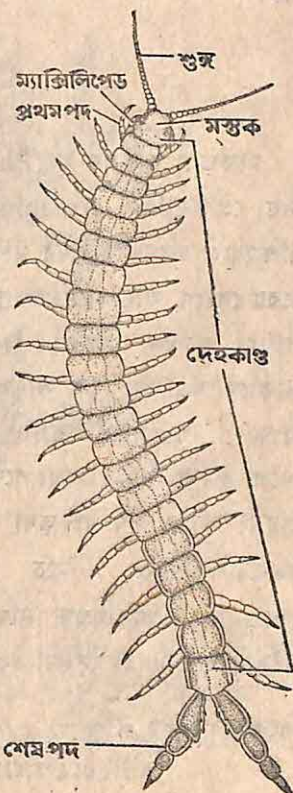
১৩৭নং চিত্র—তেঁতুলে বিছা।

(৭) শেষ দেহ-খণ্ডক ছাড়া, দেহকাণ্ডের প্রতিটি দেহ-খণ্ডক হইতে এক জোড়া করিয়া উপাঙ্গ বাহির হয়। ইহাদের পদ (Legs) বলে। প্রতিটি উপাঙ্গ সাতটি খণ্ড নিয়া গঠিত। সপ্তম খণ্ডটিতে সরু ও বাঁকা **নখর (Claw)** থাকে।

(৮) দেহকাণ্ডের প্রথম খণ্ডকের উপাঙ্গ দুইটি **ম্যাক্সিলিপেড (Maxillipedes)** অথবা **বিষনখ (Poison claws)** নামে পরিচিত। ইহাদের গোড়ায় একটি করিয়া ছোট ছিদ্র থাকে এবং ঐ ছিদ্রগুলি বিষগ্রন্থি(Poison glands)-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

(৯) শেষ দেহ-খণ্ডকের উপাঙ্গ দুইটি সবচেয়ে বড়।

(১০) শেষ দেহ-খণ্ডকের অঙ্কদেশে **পায়ু (Anus)** অবস্থিত।

(১১) শেষ দেহ-খণ্ডকের আগেরটির অঙ্কদেশে **জননছিদ্র (Gonopore)** থাকে।

মাকড়সা
(Spider)

মাকড়সা সন্ধিপদ পর্ব(Phylum Arthropoda)-এর অন্তর্গত, অ্যারাক্নিডা শ্রেণী(Class Arachnida)-ভুক্ত **একলিঙ্গ (Unisexual)** প্রাণী। পশ্চিমবঙ্গে অনেক রকমের মাকড়সা দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘরের কোণে, কড়িকাঠে, আবার কেহ কেহ বনে-জঙ্গলে জাল পাতিয়া শিকারের আশায় অপেক্ষা করে। স্ত্রী-মাকড়সা সাধারণতঃ পুরুষ-মাকড়সার চেয়ে আকারে বড় হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারাই "মাকড়সার জাল" বুনিয়া থাকে। মশা, মাছি ইত্যাদি ছোট ছোট পতঙ্গ মাকড়সার জালে আট্‌কাইয়া গেলে, ক্রমশঃ নির্জীব হইয়া পড়ে; মাকড়সা তখন উহাদের দেহের রস চুষিয়া খায়। অবশ্য, সব মাকড়সা জাল বুনিতে পারে না। অধিকাংশ মাকড়সাই কম-বেশি বিষধর। নিচে পশ্চিমবঙ্গের ঘর-বাড়ীতে অন্যতম সহজপ্রাপ্য মাকড়সার বিজ্ঞান-সম্মত নাম এবং সাধারণভাবে মাকড়সার বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতির বিবরণ দেওয়া হইল।

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—
হেটারোপোডা ভেনাটোরিয়া (*Heteropoda venatoria*)।

(১) মাকড়সার দেহ কিউটিকল-নির্মিত ছোট ছোট রোমে আবৃত এবং দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম (Bilaterally symmetrical)।

(২) **শিরোবক্ষ** (Cephalothorax) এবং **উদর** (Abdomen)—এই দুইটি প্রধান অংশ নিয়া মাকড়সার দেহ গঠিত। এই অংশ দুইটির মধ্যে একটি সরু ও ছোট অংশ থাকে। ইহাকে **কটি** (Waist) বা **পিডাংক্ল** (Peduncle) বলে।

(৩) শিরোবক্ষ **মস্তক** (Head) এবং **বক্ষ** (Thorax) নিয়া গঠিত।

(৪) মস্তকের অগ্র-প্রান্তে **মুখ** (Mouth) থাকে।

(৫) মস্তকের পৃষ্ঠদেশে চারটি করিয়া দুই পাশে মোট আটটি **সরলাক্ষি** (Simple eyes) থাকে।
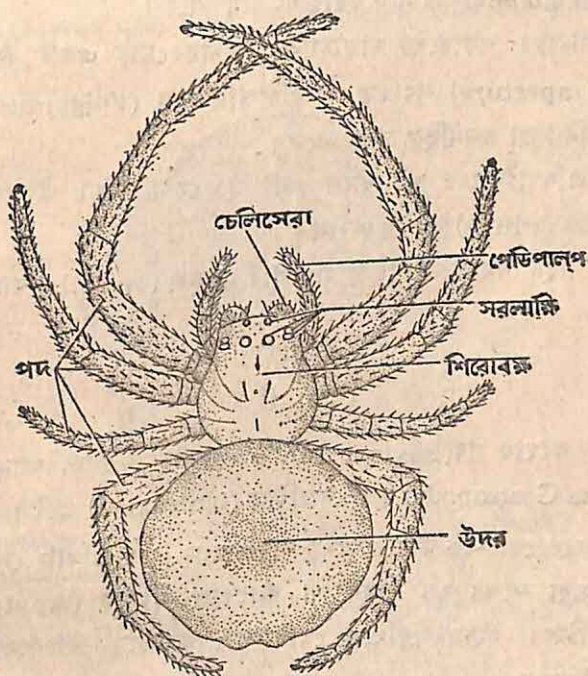
১৩৮নং চিত্র—মাকড়সা (অ্যারানিয়াস)।

(৬) মুখের দুই পাশে দুইটি **চেলিসেরি** (Chelicerae)* নামক উপাঙ্গ থাকে। চেলিসেরির নখর-সদৃশ অগ্র-প্রান্তের নিকটে একটি ছোট ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দিয়া শিরোবক্ষের মধ্যস্থ **বিষগ্রন্থি** (Poison gland) হইতে বিষ বাহির হইয়া আসে।

(৭) চেলিসেরির পিছনে দাঁড়ার মতো এক জোড়া **পেডিপাল্পি**

* বহুবচন ; চেলিসেরা (Chelicera) — একবচন।

(Pedipalpi)* থাকে। চেলিসেরি ও পেডিপাল্‌পিকে **শিরোপাঙ্গ** বা **সেফালিক অ্যাপেণ্ডেজ** (Cephalic appendages) বলা হয়।

(৮) বক্ষের অঙ্কদেশে চার জোড়া **পদ** (Legs) দেখা যায়। প্রতিটি পদ সাতটি খণ্ড-যুক্ত ; শেষ খণ্ডটিতে কয়েকটি **নখর** (Claws) থাকে।

(৯) শিরোবক্ষের তুলনায় উদর বড়, নরম এবং ডিম্বাকার।

(১০) উদরের পশ্চাৎ-ভাগে **পায়ু** (Anus) অবস্থিত।

(১১) পায়ুর নিকটে চারটি হইতে ছয়টি মাংসল **বুনন-যন্ত্র** বা **স্পিনারেট** (Spinnerets) থাকে। উদরে অবস্থিত **বুনন-গ্রন্থি** বা **স্পিনিং গ্ল্যান্ড** (Spinning glands)-এর সঙ্গে ইহার সংযোগ আছে।

(১২) উদরের অঙ্কদেশের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট একটি **জননছিদ্র** (Genital aperture) অবস্থিত। **এপিগাইনাম** (Epigynum) নামক একটি ঢাক্‌নি দিয়া জননছিদ্র ঢাকা থাকে।

(১৩) এপিগাইনামের দুই পাশে দুইটি ছিদ্র দেখা যায়। ইহাদের **বই-ফুস্‌ফুস্**(Book-lung)-এর ছিদ্র বলে।

(১৪) পায়ুর নিকটে **শ্বাসছিদ্র** বা **স্পাইরাক্‌ল** (Spiracle) থাকে।

শামুক
(Snail)

শামুক কম্বোজ পর্ব(Phylum Mollusca)-এর অন্তর্গত, গ্যাস্‌ট্রোপোডা শ্রেণী(Class Gastropoda)-ভুক্ত **একলিঙ্গ** (Unisexual) প্রাণী।

পশ্চিমবঙ্গে ছোট-বড় নানা রকমের শামুক জলে এবং ডাঙ্গায় দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে জলের বড় শামুক বা **আপেল শামুক** (Apple Snail) বেশি পরিচিত। ইহারা দেখিতে গোলাকার, কতকটা আপেলের মতো। সেইজন্য, ইহাদের এইরকম নামকরণ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ বর্ষার শুরুতে ইহারা সক্রিয় হইয়া উঠে এবং শীত ও বসন্তকালে জল শুকাইয়া গেলে মাটির নিচে বেশ কয়েক মাস চুপ্‌চাপ কাটাইয়া দেয়। গেঁড়ি (Land Snail) আর একটি সচরাচর দেখা শামুক। ইহাদের সাধারণতঃ শাক-সব্‌জির বাগানে পাওয়া যায়। গেঁড়ির বিজ্ঞান-সম্মত নাম **অ্যাকাটিনা ফুলিকা** (*Achatina fulica*)। ইহাদের ঢাক্‌নি থাকে না। পরের পৃষ্ঠায় আপেল শামুকের বিজ্ঞান-সম্মত নাম এবং উহার বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতির বিবরণ দেওয়া হইল।

* বহুবচন ; পেডিপাল্‌প (Pedipalp) — একবচন।

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—

পাইলা গ্লোবোসা (*Pila globosa*)।

(১) আপেল শামুকের দেহ **অপ্রতিসম** (Asymmetrical) এবং **মস্তক** (Head), **পদ** (Foot) ও **আন্তরযন্ত্রীয় পিণ্ড** বা **ভিসেরাল মাস** (Visceral mass)—এই তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত।

(২) স্বভাবিক অবস্থায়, আন্তরযন্ত্রীয় পিণ্ড একটি **খোলক**(Shell)-এর মধ্যে, এবং মস্তক ও পদ খোলকের বাহিরে থাকে। কিন্তু উত্তেজিত হইলে, শামুক সমগ্র দেহকে খোলকের মধ্যে গুটাইয়া নেয় এবং ঢাকনি বা **অপারকুলাম** (Operculum) নামক পাতের সাহায্যে খোলকের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়।
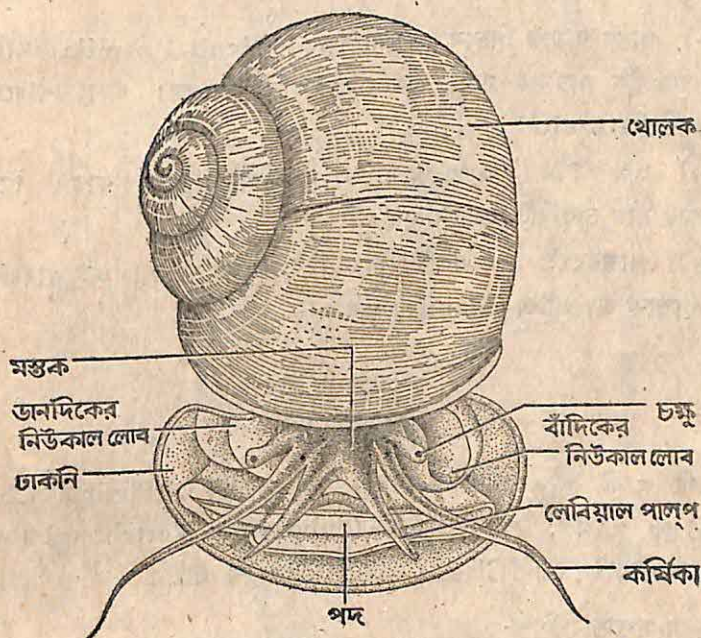
১৩৯নং চিত্র—আপেল শামুক।

(৩) খোলকটি প্রায় গোলাকার, প্রধানতঃ চুর্ণকময় পদার্থ দিয়া তৈয়ারী, সাড়ে ছয়টি আবর্ত নিয়া গঠিত এবং হলুদ, বাদামী অথবা কালো রঙের।

(৪) মস্তকের সামনের অংশকে **তুণ্ড** (Snout) বলে। তুণ্ডের দুই পাশে দুইটি **লেবিয়াল পাল্‌প** (Labial palp) নামক প্রলম্বিত শাঙ্কব অংশ থাকে।

(৫) লেবিয়াল পাল্‌প দুইটির পিছনের দিকে, মোটা সুতার মতো দুইটি **কর্ষিকা (Tentacles)** থাকে।

(৬) প্রতিটি কর্ষিকার গোড়ার কাছে একটি করিয়া সবৃন্তক (Stalked) **চক্ষু (Eye)** দেখা যায়।

(৭) মস্তকের সামনের অংশে, অঙ্কদেশের মধ্যরেখা-বরাবর চেরা **মুখ (Mouth)** অবস্থিত।

(৮) পদের উপরে, মস্তকের দুই পাশে দুইটি মাংসল ভাঁজ থাকে। ইহাদের **নিউকাল লোব (Nuchal lobe)** বলা হয়। বাঁদিকের লোবটি ডানদিকের চেয়ে বড়।

(৯) ডানদিকের নিউকাল লোবের কিনারার কাছে **পায়ু (Anus)** অবস্থিত।

(১০) পায়ুর সামান্য পিছনে, **জননপিড়কা (Genital papilla)** নামক একটি অল্প উঁচু জায়গার মধ্যে, একটি চেরা ছিদ্র থাকে। ইহাই শামুকের **জননছিদ্র (Genital aperture)**।

(১১) পদ অঙ্কীয় (Ventral), মাংসল এবং প্রায় ত্রিকোণাকার। পদের পৃষ্ঠতলের সঙ্গে ঢাকনিটি লাগানো থাকে।

(১২) আন্তরযন্ত্রীয় পিণ্ড একটি আবরণ দিয়া আবৃত থাকে। এই আবরণের মুক্ত-প্রান্তকে **ম্যান্‌ট্‌ল (Mantle)** বলে।

রুই
(Rohu)

রুই একটি অতি পরিচিত মাছ। ইহা কর্ডাটা পর্ব(Phylum Chordata)-এর অন্তর্গত, উপপর্ব ভার্টিব্রাটা(Subphylum Vertebrata)-র অন্তর্ভুক্ত, অস্‌টিক্‌থিস শ্রেণী(Class Osteichthyes)-র প্রাণী।

বিজ্ঞান-সম্মত নাম— লেবিও রোহিতা (*Labeo rohita*)।

(১) রুই মাছের দেহ **দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম (Bilaterally symmetrical)** এবং **মস্তক (Head), দেহকাণ্ড (Trunk)** ও **লেজ (Tail)**—এই তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত। সামনের দিক হইতে কান্‌কুয়া পর্যন্ত অংশকে মস্তক, কান্‌কুয়ার পিছন হইতে পায়ু পর্যন্ত অংশকে দেহকাণ্ড এবং পায়ুর পরে অবস্থিত অংশকে লেজ বলা হয়।

নাসারন্ধ্র
পৃষ্ঠ-পাখ্না
মুখ
গুম্ফ
কানকুয়া
চক্ষু
বক্ষ-পাখ্না
শ্রোণী-পাখ্না
পার্শ্বরেখা
পায়ু-পাখ্না
পুচ্ছ-পাখ্না

১৪০নং চিত্র—রুই।

(২) ইহার দেহ লম্বাটে এবং দুই পাশে চাপা। পিঠের দিক লাল্‌চে, কিন্তু পেটের দিক সাদাটে। পরিণত রুই ১২৫ সেন্টিমিটারেরও বেশি লম্বা হইতে পারে।

(৩) মস্তক ও লেজ, দেহকাণ্ডের তুলনায় সরু।

(৪) মস্তক ছাড়া, দেহের অন্যান্য অংশ **উপচক্রাকার আঁইশ** বা **সাইক্লয়েড স্কেল** (Cycloid scales) দিয়া আবৃত।

(৫) মস্তকের অগ্রভাগে, অঙ্কদেশের দিকে অল্প ঘেঁষিয়া, **মুখ** (Mouth) অবস্থিত।

(৬) মুখের দুই পাশে দুইটি ছোট **গুম্ফ** বা **বারবেল** (Barbels) থাকে।

(৭) মুখের পিছনে, মস্তকের পৃষ্ঠদেশের উপর, দুইটি **নাসারন্ধ্র** (Nostrils) অবস্থিত।

(৮) প্রতিটি নাসারন্ধ্রের পিছনে একটি বৃত্তাকার **চক্ষু** (Eye) থাকে।

(৯) মস্তকের শেষভাগের দুই পাশে দুইটি অর্ধ-চন্দ্রাকার **কান্‌কুয়া** বা **অপারকুলাম** (Operculum) দেখা যায়।

(১০) মস্তকের পিছন হইতে লেজ পর্যন্ত দেহাংশের দুই পাশে দুইটি লম্বা দাগ থাকে। ইহাদের **পার্শ্ব-রেখা** (Lateral lines) বলে।

(১১) দেহকাণ্ড ও লেজের সংযোগ-স্থলের অঙ্ক-মধ্যরেখা(Mid-ventral line)-য় একটি সামান্য ফোলা জায়গা দেখা যায়। ঐখানে **পায়ু** (Anus) এবং **মূত্র-জননছিদ্র** (Urino-genital pore) অবস্থিত।

(১২) রুই মাছের দুই জোড়া **যুগ্ম পাখ্‌না** (Paired fins) এবং তিনটি **অযুগ্ম পাখ্‌না** (Unpaired fins) আছে। দুই জোড়া যুগ্ম পাখ্‌না যথাক্রমে **বক্ষ-পাখ্‌না** (Pectoral fins) এবং **শ্রোণী-পাখ্‌না** (Pelvic fins) নামে পরিচিত।

(১৩) বক্ষ-পাখ্‌না কান্‌কুয়ার পিছনের দিকে অবস্থিত এবং সতেরোটি রশ্মি(Ray)-যুক্ত।

(১৪) শ্রোণী-পাখ্‌না বক্ষ-পাখ্‌নার পিছনদিকে অবস্থিত ও নয়টি রশ্মিযুক্ত।

(১৫) দেহকাণ্ডের পৃষ্ঠদেশের মধ্যরেখা-বরাবর অবস্থিত এবং পনেরো অথবা ষোলটি রশ্মিযুক্ত, বড় ও ত্রিকোণাকার অযুগ্ম পাখ্‌নাটিকে **পৃষ্ঠ-পাখ্‌না** (Dorsal fin) বলে।

(১৬) পায়ুর পিছনদিকে, অঙ্কদেশের মধ্যরেখা-বরাবর অবস্থিত, ছয়টি অথবা সাতটি রশ্মিযুক্ত অযুগ্ম পাখ্‌নাকে **পায়ু-পাখ্‌না** (Anal fin) বলা হয়।

(১৭) তৃতীয় অযুগ্ম পাখ্‌নাটি **পুচ্ছ-পাখ্‌না** (**Caudal fin, Tail fin**) নামে পরিচিত এবং লেজের শেষভাগে অবস্থিত। ইহা প্রায় সমান দুই অংশে বিভক্ত এবং উনিশটি রশ্মিযুক্ত।

শিঙি, মাগুর ও কৈ
(Shingi, Magur and Koi)

শিঙি, মাগুর ও কৈ মাছ মজা পুকুর, ডোবা, বিল ইত্যাদির স্রোতহীন নোংরা জলে স্বচ্ছন্দে বাস করে। অন্যান্য মাছের মতো, ইহারা **ফুলকা** (**Gill**)-র সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়া শ্বসন করে। কিন্তু ইহাদের দেহে **অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র** (**Accessory respiratory organs**) থাকে বলিয়া, এই মাছেরা বায়ু হইতেও অক্সিজেন নিয়া শ্বসন করিতে পারে। সেইজন্য ইহারা জলের বাহিরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে ; খুব অল্প জলের সংস্পর্শে রাখিলে, দিনের পর দিন ইহারা অনায়াসে বাঁচিতে পারে। এই কারণে ইহাদের **জিওল মাছ** (**Air-breathing fish**) বলা হয়। শাল, শোল, ল্যাঠা, কুঁচে—ইহারাও জিওল মাছ।

শিঙি ও মাগুর মাছের মুখের চারপাশে **গুম্ফ** (**Barbel**) থাকে বলিয়া, ইংরেজীতে ইহারা **ক্যাট্‌-ফিশ** (**Cat-fish**) নামে পরিচিত। বোয়াল, পাব্‌দা, ট্যাংরা ইত্যাদিও এই-জাতীয় মাছ।

শিঙি, মাগুর ও কই—এই তিনটি মাছ, রুই মাছের মতো, কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত, ভার্টিব্রাটা উপবর্গের অন্তর্ভুক্ত, অস্‌টিক্‌থিস শ্রেণীর প্রাণী।

শিঙি (Shingi)

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—

হেটারপ্‌নিউস্‌টিস ফসিলিস (*Heteropneustes fossilis*)।

(১) রুই মাছের মতো, শিঙি মাছের দেহ **মস্তক** (**Head**), **দেহকাণ্ড** (**Trunk**) এবং **লেজ** (**Tail**)—এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত এবং **দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম** (**Bilaterally symmetrical**)।

(২) পরিণত শিঙি কাল্‌চে বাদামী রঙের এবং লম্বায় প্রায় ত্রিশ সেন্টি-মিটার। দেহের প্রথম অংশ প্রায় বেলনাকার, শেষ অংশ দুই পাশে চাপা।

(৩) দেহ পিচ্ছিল এবং আঁইশ-বিহীন।

(৪) উপর-নিচে চাপা মস্তকের অগ্রভাগে ছোট **মুখ** (**Mouth**) থাকে।

(৫) মুখের চারপাশে (উপরের চোয়ালে এক জোড়া, নিচের চোয়ালে দুই

(২) ইহার দেহ লম্বাটে এবং দুই পাশে চাপা। পিঠের দিক লাল্চে, কিন্তু পেটের দিক সাদাটে। পরিণত রুই ১২৫ সেন্টিমিটারেরও বেশি লম্বা হইতে পারে।

(৩) মস্তক ও লেজ, দেহকাণ্ডের তুলনায় সরু।

(৪) মস্তক ছাড়া, দেহের অন্যান্য অংশ **উপচক্রাকার আঁইশ** বা **সাইক্লয়েড স্কেল** (Cycloid scales) দিয়া আবৃত।

(৫) মস্তকের অগ্রভাগে, অঙ্কদেশের দিকে অল্প ঘেঁষিয়া, **মুখ** (Mouth) অবস্থিত।

(৬) মুখের দুই পাশে দুইটি ছোট **গুম্ফ** বা **বারবেল** (Barbels) থাকে।

(৭) মুখের পিছনে, মস্তকের পৃষ্ঠদেশের উপর, দুইটি **নাসারন্ধ্র** (Nostrils) অবস্থিত।

(৮) প্রতিটি নাসারন্ধ্রের পিছনে একটি বৃত্তাকার **চক্ষু** (Eye) থাকে।

(৯) মস্তকের শেষভাগের দুই পাশে দুইটি অর্ধ-চন্দ্রাকার **কান্কুয়া** বা **অপারকুলাম** (Operculum) দেখা যায়।

(১০) মস্তকের পিছন হইতে লেজ পর্যন্ত দেহাংশের দুই পাশে দুইটি লম্বা দাগ থাকে। ইহাদের **পার্শ্ব-রেখা** (Lateral lines) বলে।

(১১) দেহকাণ্ড ও লেজের সংযোগ-স্থলের অঙ্ক-মধ্যরেখা(Mid-ventral line)-য় একটি সামান্য ফোলা জায়গা দেখা যায়। ঐখানে **পায়ু** (Anus) এবং **মূত্র-জননছিদ্র** (Urino-genital pore) অবস্থিত।

(১২) রুই মাছের দুই জোড়া **যুগ্ম পাখ্না** (Paired fins) এবং তিনটি **অযুগ্ম পাখ্না** (Unpaired fins) আছে। দুই জোড়া যুগ্ম পাখ্না যথাক্রমে **বক্ষ-পাখ্না** (Pectoral fins) এবং **শ্রোণী-পাখ্না** (Pelvic fins) নামে পরিচিত।

(১৩) বক্ষ-পাখ্না কান্কুয়ার পিছনের দিকে অবস্থিত এবং সতেরোটি রশ্মি(Ray)-যুক্ত।

(১৪) শ্রোণী-পাখ্না বক্ষ-পাখ্নার পিছনদিকে অবস্থিত ও নয়টি রশ্মিযুক্ত।

(১৫) দেহকাণ্ডের পৃষ্ঠদেশের মধ্যরেখা-বরাবর অবস্থিত এবং পনেরো অথবা ষোলটি রশ্মিযুক্ত, বড় ও ত্রিকোণাকার অযুগ্ম পাখ্নাটিকে **পৃষ্ঠ-পাখ্না** (Dorsal fin) বলে।

(১৬) পায়ুর পিছনদিকে, অঙ্কদেশের মধ্যরেখা-বরাবর অবস্থিত, ছয়টি অথবা সাতটি রশ্মিযুক্ত অযুগ্ম পাখ্নাকে **পায়ু-পাখ্না** (Anal fin) বলা হয়।

(১৭) তৃতীয় অযুগ্ম পাখ্‌নাটি **পুচ্ছ-পাখ্‌না** (Caudal fin, Tail fin) নামে পরিচিত এবং লেজের শেষভাগে অবস্থিত। ইহা প্রায় সমান দুই অংশে বিভক্ত এবং উনিশটি রশ্মিযুক্ত।

শিঙি, মাগুর ও কৈ
(Shingi, Magur and Koi)

শিঙি, মাগুর ও কৈ মাছ মজা পুকুর, ডোবা, বিল ইত্যাদির স্রোতহীন নোংরা জলে স্বচ্ছন্দে বাস করে। অন্যান্য মাছের মতো, ইহারা **ফুলকা** (Gill)-র সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়া শ্বসন করে। কিন্তু ইহাদের দেহে **অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র** (Accessory respiratory organs) থাকে বলিয়া, এই মাছেরা বায়ু হইতেও অক্সিজেন নিয়া শ্বসন করিতে পারে। সেইজন্য ইহারা জলের বাহিরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে ; খুব অল্প জলের সংস্পর্শে রাখিলে, দিনের পর দিন ইহারা অনায়াসে বাঁচিতে পারে। এই কারণে ইহাদের **জিওল মাছ** (Air-breathing fish) বলা হয়। শাল, শোল, ল্যাঠা, কুঁচে—ইহারাও জিওল মাছ।

শিঙি ও মাগুর মাছের মুখের চারপাশে **গুম্ফ** (Barbel) থাকে বলিয়া, ইংরেজীতে ইহারা **ক্যাট্‌-ফিশ** (Cat-fish) নামে পরিচিত। বোয়াল, পাব্‌দা, ট্যাংরা ইত্যাদিও এই-জাতীয় মাছ।

শিঙি, মাগুর ও কই—এই তিনটি মাছ, রুই মাছের মতো, কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত, ভার্টিব্রাটা উপবর্গের অন্তর্ভুক্ত, অস্‌টিকৃথিস শ্রেণীর প্রাণী।

শিঙি (Shingi)

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—

হেটারপ্‌নিউস্‌টিস ফসিলিস (*Heteropneustes fossilis*)।

(১) রুই মাছের মতো, শিঙি মাছের দেহ **মস্তক** (Head), **দেহকাণ্ড** (Trunk) এবং **লেজ** (Tail)—এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত এবং **দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম** (Bilaterally symmetrical)।

(২) পরিণত শিঙি কাল্‌চে বাদামী রঙের এবং লম্বায় প্রায় ত্রিশ সেন্টি-মিটার। দেহের প্রথম অংশ প্রায় বেলনাকার, শেষ অংশ দুই পাশে চাপা।

(৩) দেহ পিচ্ছিল এবং আঁইশ-বিহীন।

(৪) উপর-নিচে চাপা মস্তকের অগ্রভাগে ছোট **মুখ** (Mouth) থাকে।

(৫) মুখের চারপাশে (উপরের চোয়ালে এক জোড়া, নিচের চোয়ালে দুই

জোড়া এবং উপরের চোয়াল ও নিচের চোয়ালের সংযোগ-স্থলে বড় এক জোড়া) মোট চার জোড়া **গুম্ফ** (**Barbels**) থাকে।

(৬) উপরের চোয়ালের অগ্রভাগে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি **নাসারন্ধ্র** (**Nostrils**) থাকে।

(৭) প্রতিটি নাসারন্ধ্রের পিছনে একটি করিয়া **চক্ষু** (**Eye**) আছে।

(৮) মস্তকের শেষভাগের দুই পাশে **কান্‌কুয়া** (**Operculum**) থাকে।
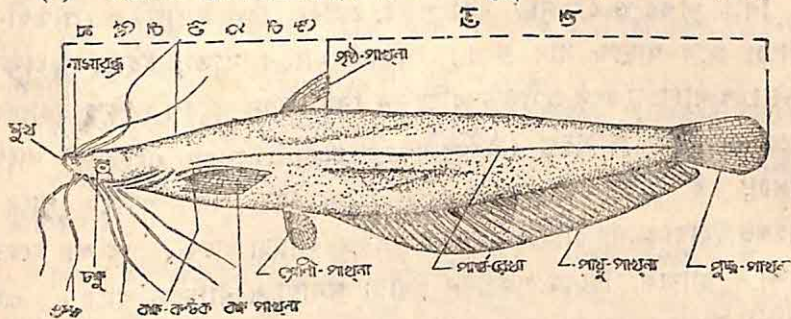
১৪১নং চিত্র—শিঙি।
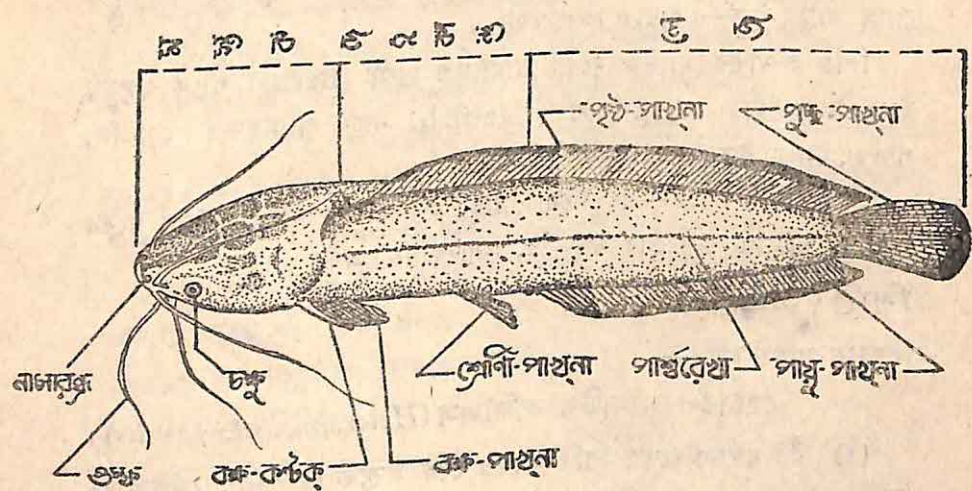
১৪২নং চিত্র—মাগুর।

(৯) মস্তকের পিছন হইতে লেজ পর্যন্ত দেহাংশের দুই পাশের দুইটি লম্বা দাগ থাকে। ইহাদের **পার্শ্ব-রেখা** (**Lateral lines**) বলে।

(১০) দেহকাণ্ডের শেষভাগের অঙ্কদেশে **পায়ু** (**Anus**) এবং উহার কাছে **মূত্র-জননছিদ্র** (**Urino-genital pore**) অবস্থিত।

(১১) শিঙি মাছেরও দুই জোড়া **যুগ্ম পাখ্‌না** (**Paired fins**) এবং তিনটি **অযুগ্ম পাখ্‌না** (**Unpaired fins**) থাকে।

(১২) **বক্ষ-পাখ্না** (Pectoral fins) নামক যুগ্ম পাখ্না কান্কুয়ার পিছনে পাশাপাশি থাকে। প্রতিটি বক্ষ-পাখ্না ছয় হইতে নয়টি রশ্মিযুক্ত। প্রথম রশ্মিটি ধারালো কণ্টকের মতো। ইহাকে **বক্ষ-কণ্টক** (Pectoral spine) বলে।

(১৩) **শ্রোণী-পাখ্না** (Pelvic fins) নামের অন্য যুগ্ম পাখ্না দেহ-কাণ্ডের অঙ্কদেশে পাশাপাশি থাকে। প্রতিটি শ্রোণী-পাখ্না ছয়টি অথবা সাতটি রশ্মিযুক্ত।

(১৪) দেহকাণ্ডের প্রথমদিকের পৃষ্ঠভাগে ছয়টি অথবা সাতটি রশ্মিযুক্ত **পৃষ্ঠ-পাখ্না** (Dorsal fins) নামের অযুগ্ম পাখ্না থাকে।

(১৫) লেজের অঙ্ক-মধ্যরেখা-বরাবর **পায়ু-পাখ্না** (Anal fin) নামক বড় অযুগ্ম পাখ্না অবস্থিত। ইহাতে ষাট হইতে উনআশিটি রশ্মি থাকে।

(১৬) লেজের শেষপ্রান্তে প্রায় গোলাকার এবং উনিশটি অথবা কুড়িটি রশ্মিযুক্ত ছোট **পুচ্ছ-পাখ্না** (Caudal fin) দেখা যায়।

১৪৩নং চিত্র—শিঙি (উপরে) ও মাগুর (নিচে) মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র।

অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র (Accessory respiratory organs) —শিঙি মাছের দেহকাণ্ডের দুই পাশে দুইটি নলাকার থলির মতো অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র অবস্থিত। ফুলকা-প্রকোষ্ঠের সঙ্গে ইহাদের সংযোগ থাকে। ইহারা **শ্বাসনল** (Respiratory tubes) নামে অভিহিত। বায়ুপূর্ণ থাকে বলিয়া, ইহারা **বায়ুনল** (Air tubes) নামেও পরিচিত।

মাগুর (Magur)

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—

ক্লেরিয়াস ব্যাট্রাকাস (*Clarius batrachus*)।

মাগুর মাছ অনেকটা শিঙি মাছের মতো। তবে ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

নিচের তালিকায় শিঙি ও মাগুর মাছের বহিরাকৃতির এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের বৈসাদৃশ্য দেওয়া হইল। এই তালিকা হইতে মাগুর মাছের বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি সহজে বোঝা যায়।

শিঙি (Shingi)	মাগুর (Magur)
বহিরাকৃতি (External features)	
(১) **দৈর্ঘ্য**—পরিণত শিঙি ত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।	(১) **দৈর্ঘ্য**—পরিণত মাগুর পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।
(২) **রঙ**—কালচে বাদামী রঙের।	(২) **রঙ**—কতকটা হলুদ রঙের।
(৩) **আকার**—সরু, লেজের দিক দুই পাশে চাপা।	(৩) **আকার**—অপেক্ষাকৃত মোটা এবং বেঁটে।
(৪) **মস্তক**—উপর-নিচে খুব বেশি চাপা।	(৪) **মস্তক**—উপর-নিচে অপেক্ষাকৃত কম চাপা। কয়েকটি দাগ দেখা যায়।
(৫) **মুখ**—মস্তকের অগ্রভাগে অবস্থিত, অপেক্ষাকৃত ছোট।	(৫) **মুখ**—মস্তকের অগ্রভাগের সামান্য অঙ্কদেশে অবস্থিত, অপেক্ষাকৃত বড় এবং প্রায় অর্ধ-চন্দ্রাকার।
(৬) **গুম্ফ**—আটটি, সবগুলি প্রায় একই রকম সরু এবং লম্বা।	(৬) **গুম্ফ**—আটটি, এক জোড়া খুব মোটা।
(৭) **বক্ষ-পাখ্না**—ছয়টি হইতে নয়টি রশ্মিযুক্ত। বক্ষ-কণ্টক ধারালো এবং সরু।	(৭) **বক্ষ-পাখ্না**—নয়টি হইতে বারোটি রশ্মিযুক্ত। বক্ষ-কণ্টক অপেক্ষাকৃত মোটা এবং ভোঁতা।
(৮) **শ্রোণী-পাখ্না**—ছয়টি অথবা সাতটি রশ্মিযুক্ত।	(৮) **শ্রোণী-পাখ্না**—ছয়টি রশ্মিযুক্ত।
(৯) **পৃষ্ঠ-পাখ্না**—ছোট, ছয়টি অথবা সাতটি রশ্মিযুক্ত।	(৯) **পৃষ্ঠ-পাখ্না**—খুব বড়, প্রায় পুচ্ছ-পাখ্না পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বাষট্টি হইতে ছিয়াত্তরটি রশ্মিযুক্ত।
(১০) **পায়ু ও মূত্র-জননছিদ্র**—সহজে পৃথক করা যায় না।	(১০) **পায়ু ও মূত্র-জননছিদ্র**—একটি নিচু জায়গায় পর পর অবস্থিত, সহজে পৃথক করা যায়।
(১১) **লেজ**—দেহের তুলনায় অনেক বড়, দুই পাশ খুব চাপা।	(১১) **লেজ**—দেহের তুলনায় ছোট এবং কম চাপা।
(১২) **পায়ু-পাখ্না**—ইহাই সবচেয়ে বড় পাখ্না এবং ষাট হইতে উনআশিটি রশ্মিযুক্ত।	(১২) **পায়ু-পাখ্না**—পঁয়তাল্লিশ হইতে আটান্নটি রশ্মিযুক্ত বড় পাখ্না, কিন্তু বৃহত্তম নয়।

শিঙি (Shingi)	মাগুর (Magur)
অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র (Accessory respiratory organs)	
(১৩) শ্বাসনল(Respiratory tube)-ই অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র। ইহারা ফুলকার কিছুদূরে অবস্থিত।	(১৩) দেখিতে কতকটা কদম ফুলের মতো, অথবা শাখা-প্রশাখা-যুক্ত উদ্ভিদের মতো। ইহাদের শ্বাস-বৃক্ষ (Respiratory tree) বলা হয়। ইহারা ফুলকা-সংলগ্ন।
বসতি (Habitat)	
(১৪) কেবল মিঠা জলেই পাওয়া যায়।	(১৪) মিঠা জলই স্বাভাবিক বসতি হইলেও, কখনও কখনও মোহানা-অঞ্চলের লাবণ জল (Brakish water)-এ পাওয়া যায়।
খাদ্য-মূল্য (Food value)	
(১৫) ইহার মাংসে ২৩% প্রোটীন, ১.৫% চর্বি, ২.৩% লৌহ, ৬৭০ মিলিগ্রাম ক্যাল্শিয়াম এবং ৬৫০ মিলিগ্রাম ফস্ফরাস থাকায়, ইহা রোগীর উত্তম পথ্য।	(১৫) ইহার মাংসে ১০% প্রোটীন, ২% চর্বি, ০.৮৩% লৌহ, ৩২০ মিলিগ্রাম ক্যাল্শিয়াম এবং ৩৮০ মিলিগ্রাম ফস্ফরাস থাকায়, ইহাও খাদ্য হিসাবে পুষ্টিকর, তবে শিঙির চেয়ে কম পুষ্টিকর।

কৈ (Koi)

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—

অ্যানাবাস টেস্‌টুডিনিয়াস (*Anabas testudineus*)।

(১) কৈ মাছের দেহ **দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম** (Bilaterally symmetrical) এবং **মস্তক** (Head), **দেহকাণ্ড** (Trunk) ও **লেজ** (Tail)—এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

(২) পরিণত কৈ মাছ সবুজাভ হলুদ রঙের এবং লম্বায় কুড়ি সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। ইহার দেহ অপেক্ষাকৃত বেঁটে এবং দুই পাশে চাপা।

(৩) মস্তকের অগ্রভাগ ছাড়া, দেহের অন্যান্য অংশ **কণ্টকী আঁইশ** বা **টিনয়েড স্কেল** (Ctenoid scale) দিয়া আবৃত।

(৪) মস্তকের অগ্রভাগে **মুখ** (Mouth) অবস্থিত।

(৫) চোয়ালে ছোট-বড় অনেকগুলি **দাঁত** (Denticles) থাকে।

(৬) উপরের চোয়ালের অগ্রভাগের কাছে দুইটি **নাসারন্ধ্র** (Nostrils) এবং উহাদের পিছনে দুইটি বড় **চক্ষু** (Eyes) দেখা যায়।

পুচ্ছ-পাখনা
পায়ু-পাখনা
পার্শ্ব-রেখা
শ্রোণী-পাখনা
বক্ষ-কণ্টক
বক্ষ-পাখনা
কানকুয়া
চক্ষু
মুখ
দাঁত
নাসারন্ধ্র
পৃষ্ঠ-পাখনা

১৪৪নং চিত্র—কৈ।
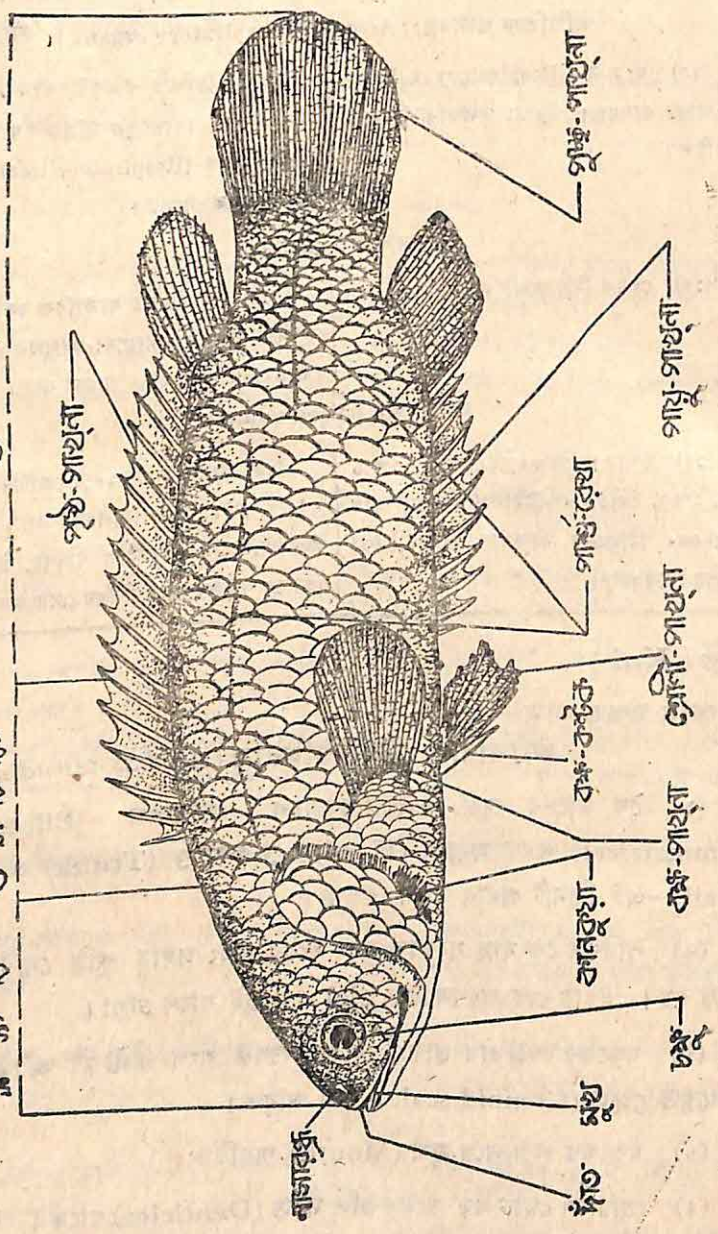
(৭) মস্তকের শেষভাগের দুই পাশে কাঁটা-যুক্ত দুইটি **কান্‌কুয়া** (**Operculum**) থাকে।

(৮) মস্তকের পিছন হইতে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত দেহাংশের দুই পাশে দুইটি **পার্শ্ব-রেখা** (**Lateral lines**) দেখা যায়। লেজের শেষভাগে পার্শ্ব-রেখা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

(৯) দেহকাণ্ড ও লেজের সংযোগ-স্থলে **পায়ু** (**Anus**) এবং উহার কাছে **মূত্র-জননছিদ্র** (**Urino-genital pore**) অবস্থিত।

(১০) কান্‌কুয়া দুইটির পিছনে দুইটি **বক্ষ-পাখ্‌না** (**Pectoral fins**) থাকে। বক্ষ-পাখ্‌নায় বারোটি করিয়া রশ্মি থাকে।

(১১) বক্ষ-পাখ্‌না দুইটির পিছনে, সামান্য অঙ্কদেশ ঘেঁষিয়া দুইটি **শ্রোণী-পাখ্‌না** (**Pelvic fins**) থাকে। প্রতিটি শ্রোণী-পাখ্‌না ছয়টি রশ্মিযুক্ত। প্রথম রশ্মিটি **কণ্টক**(**Spine**)-এ রূপান্তরিত হইয়াছে।

(১২) পৃষ্ঠদেশের মধ্যরেখা-বরাবর পঁচিশ হইতে আঠাশটি রশ্মিযুক্ত একটি বড় **পৃষ্ঠ-পাখ্‌না** (**Dorsal fin**) থাকে। প্রথমদিকের সতেরো অথবা আঠারোটি রশ্মি কাঁটার মতো।

(১৩) লেজ দেহকাণ্ডের চেয়ে লম্বা। লেজের অঙ্ক-মধ্যরেখায় আঠারো হইতে একুশটি রশ্মিযুক্ত একটি বড় **পায়ু-পাখ্‌না** (**Anal fin**) থাকে। প্রথমদিকের নয়টি অথবা দশটি রশ্মি কাঁটার মতো।

(১৪) লেজের শেষপ্রান্তে একটি গোলাকার **পুচ্ছ-পাখ্‌না** (**Caudal fin**) থাকে।

১৪৫নং চিত্র—কৈ মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র।

অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র (**Accessory respiratory organs**)—কৈ মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র দেখিতে কতকটা ফোটা গোলাপের পাপড়ির মতো। প্রতিটি ফুলকা-প্রকোষ্ঠে, ফুলকাগুলির পৃষ্ঠভাগে একটি করিয়া অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকে।

কোলা ব্যাঙ (Frog)

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—

রানা টাইগ্রিনা (*Rana tigrina*)।

কোলা ব্যাঙ বা সোনা ব্যাঙ দেখিতে মোটামুটি কুনো ব্যাঙেরই মতো। তবে কুনো ব্যাঙের সঙ্গে ইহার কতকগুলি পার্থক্য দেখা যায়। যেমন—

(১) কোলা ব্যাঙ সাধারণতঃ কুনো ব্যাঙের চেয়ে বড়।

(২) অঙ্কদেশ সোনালী হলুদ; পৃষ্ঠদেশের রঙ শেওলা-সবুজ। পৃষ্ঠদেশে কালো ডোরা এবং ছাপ দেখা যায়।
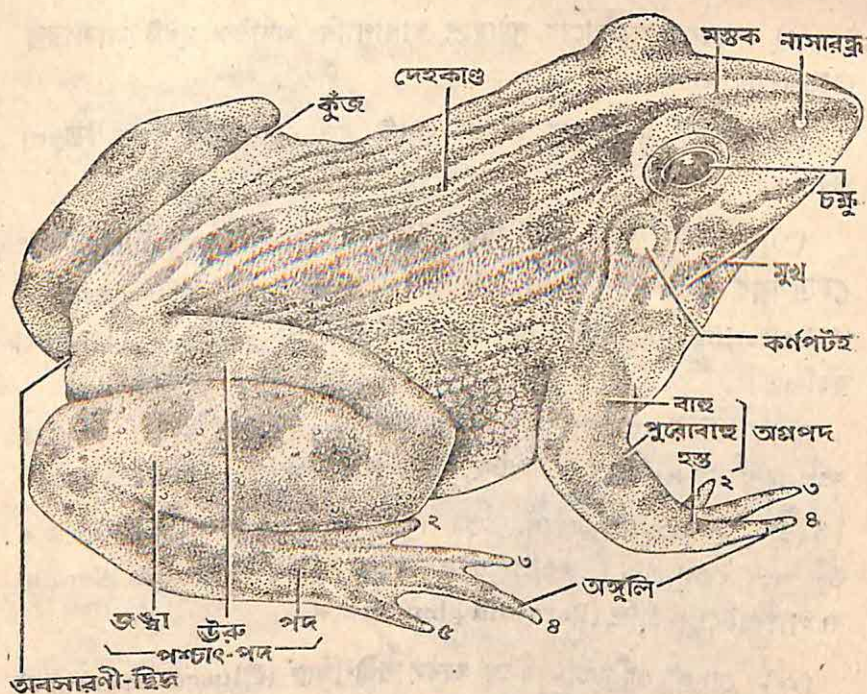
১৪৭নং চিত্র—কোলা ব্যাঙ।

(৩) মস্তক ত্রিকোণাকার, তবে অগ্রভাগ বেশি সুচালো।

(৪) উপরের চোয়ালে দাঁত থাকে।

(৫) ত্বক্ মসৃণ।

(৬) প্যারাটয়েড গ্রন্থি বাহির হইতে দেখা যায় না।

(৭) কোমরে কুঁজ (Hump) থাকে।

(৮) অগ্রপদ ও পশ্চাৎ-পদ, বিশেষ করিয়া পশ্চাৎ-পদ, বেশি শক্তিশালী।

(৯) পশ্চাৎ-পদের অঙ্গুলিগুলি প্রায় সমগ্র দৈর্ঘ্য-বরাবর পাতলা পর্দা দিয়া পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

পূর্বোক্ত পার্থক্যগুলি হইতে কোলা ব্যাঙের বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি সহজে বোঝা যায়।

টিকৃটিকি
(Lizard)

টিকৃটিকি-জাতীয় প্রাণীরা কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত, ভার্টিব্রাটা উপপর্বের অন্তর্ভুক্ত, সরীসৃপ বা রেপ্‌টিলিয়া শ্রেণী(Class Reptilia)-র প্রাণী। সরীসৃপ শ্রেণীর অন্যতম বর্গ স্কুয়ামেটা (Order Squamata)। এই বর্গের অন্তর্গত সাউরিয়া উপবর্গ(Suborder Sauria)-এর প্রাণীদের সাধারণভাবে **লিজার্ড** (Lizards) বলা হয়। সেই হিসাবে টিকৃটিকি বা গৃহ-গোধিকা (House Lizard), গিরগিটি (Garden Lizard), তক্ষক, গো-সাপ—ইহারা সকলেই টিকৃটিকি।

পশ্চিমবঙ্গে ঘর-বাড়ীতে অথবা উহার আশপাশে সচরাচর যে টিকৃটিকি (House Lizard) দেখা যায়, তাহার বিজ্ঞান-সম্মত নাম ও বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতির বিবরণ নিচে দেওয়া হইল। ইহারা ঘরের দেওয়ালে, ছাদের ভিতরের তলে স্বচ্ছন্দে কীট-পতঙ্গ শিকার করিয়া বেড়ায়। হঠাৎ উপর হইতে নিচে পড়িয়া গেলে, অথবা সামান্য আঘাত পাইলে, ইহাদের লেজ সহজে ছিঁড়িয়া যায়। ছেঁড়া লেজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত নড়িতে থাকে।

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—

হেমিড্যাক্‌টাইলাস ফ্লাভিভিরিডিস (*Hemidactylus flaviviridis*)।

(১) টিকৃটিকির দেহ **দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম** (**Bilaterally symmetrical**) এবং **মস্তক (Head)**, **গ্রীবা (Neck)**, **দেহকাণ্ড (Trunk)** ও **লেজ (Tail)**—এই চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত।

(২) ইহা লম্বায় কুড়ি সেন্টিমিটারেরও বেশি হইতে পারে। দেহ ছোট ছোট **আঁইশ (Scales)** দিয়া আবৃত। পিঠের দিকের রঙ ধূসর অথবা বাদামী, পেটের দিকের রঙ অনেক হাল্‌কা।

(৩) প্রায় ত্রিকোণাকার মস্তকের অগ্র-প্রান্তে **মুখ (Mouth)** অবস্থিত। উপরের ও নিচের চোয়ালে অনেকগুলি ছোট ছোট **দাঁত (Teeth)** থাকে।

(৪) মুখের উপরের দিকে পাশাপাশি দুইটি **নাসারন্ধ্র** (Nostrils) থাকে।
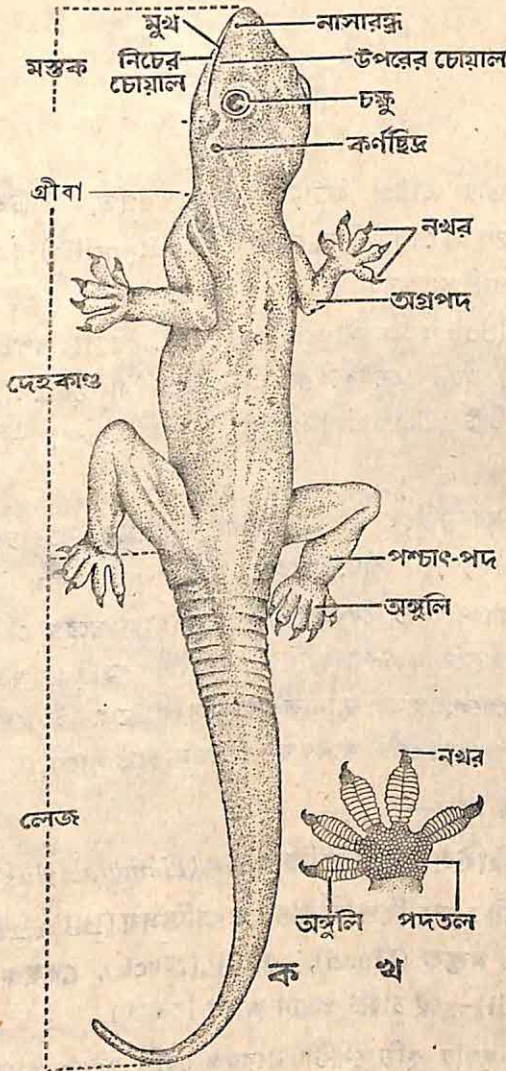
১৪৮নং চিত্র—টিকটিকি : ক. বহিরাকৃতি, খ. পশ্চাৎ-পদের শেষ অংশ (অঙ্ক-দৃশ্য)।

(৫) প্রতিটি নাসারন্ধ্রের পিছনে একটি **চক্ষু** (Eye) থাকে। কুনো ব্যাঙের মতো, টিকটিকির চক্ষুও, **ঊর্ধ্ব-নেত্রপল্লব** (Upper eye-lid),

নিম্ন-নেত্রপল্লব (Lower eye-lid) এবং **উপপল্লব** (Nictitating membrane)—এই তিনটি নেত্রপল্লব দিয়া সুরক্ষিত।

(৬) প্রতিটি চক্ষুর পিছনে, একটি নিচু জায়গার মধ্যে, মসৃণ চর্মাবৃত গোলাকার **কর্ণপটহ** (Tympanum) থাকে। নিচু জায়গাটিকে **কর্ণকুহর** (Auditory meatus) বলে।

(৭) গ্রীবাটি ছোট। ইহা মস্তককে দেহকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে।

(৮) দেহকাণ্ড উপর-নিচে চাপা। দেহকাণ্ডের অগ্রভাগে ও পশ্চাৎ-ভাগে যথাক্রমে এক জোড়া করিয়া **অগ্রপদ** (Fore limbs) এবং **পশ্চাৎ-পদ** (Hind limbs) থাকে।

(৯) প্রতিটি পদে **নখর**(Claws)-যুক্ত পাঁচটি করিয়া **অঙ্গুলি** (Digits) দেখা যায়। অঙ্গুলির মধ্যভাগ মোটা। এই অঞ্চলের নিচের তলে, দুই সারি ছোট ছোট অবতল অংশ (Concavities) সমান্তরালভাবে সাজানো থাকে।

(১০) দেহকাণ্ড ও লেজের সংযোগ-স্থলে, অঙ্কদেশে আড়াআড়িভাবে **অবসারণী-ছিদ্র** (Cloacal aperture) অবস্থিত।

(১১) লেজের গোড়ার দিক মোটা এবং উপর-নিচে চাপা, কিন্তু শেষের দিক সরু ও বেলনাকার।

পায়রা
(Pigeon)

পায়রা কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত, ভার্টিব্রাটা উপপর্বের অন্তর্ভুক্ত পক্ষী বা আভিস শ্রেণী(Class Aves)-র প্রাণী।

বিজ্ঞান-সম্মত নাম— কলাম্বা লিভিয়া (*Columba livia*)।

(১) পায়রার দেহ **দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম** (Bilaterally symmetrical) এবং **মস্তক** (Head), **গ্রীবা** (Neck), **দেহকাণ্ড** (Trunk) ও **লেজ** (Tail)—এই চারটি ভাগে বিভক্ত।

(২) পায়রা লম্বায় প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়।

(৩) চক্ষু, চঞ্চু এবং পায়ের কিছু অংশ ছাড়া, দেহের অন্যান্য অংশ **পালক** (Feathers) দিয়া আবৃত।

(৪) মস্তক প্রায় গোলাকার। ইহার অগ্র-প্রান্তে **মুখ** (Mouth)

১৪৯নং চিত্র—পায়রা।

অবস্থিত ; উপরের চোয়াল এবং নিচের চোয়াল সম্মিলিতভাবে **চঞ্চু** (Beak) গঠন করে।

(৫) চঞ্চুর গোড়ায় দুইটি **নাসারন্ধ্র** (Nostrils) পাশাপাশি অবস্থিত।

(৬) নাসারন্ধ্র দুইটিকে ঘিরিয়া পালক-বিহীন একটি নরম অংশ থাকে। ইহাকে **সিরি** (Cere) বলে।

(৭) মস্তকের প্রতি পাশে একটি বড়, গোলাকার **চক্ষু** (Eye) থাকে। চক্ষু যথারীতি **ঊর্ধ্ব-নেত্রপল্লব** (Upper eye-lid), **নিম্ন-নেত্রপল্লব** (Lower eye-lid) এবং **উপপল্লব** (Nictitating membrane) দিয়া সুরক্ষিত।

(৮) মস্তকের শেষভাগের প্রতি পাশে পালকে ঢাকা একটি **কর্ণছিদ্র** (Auditory aperture) থাকে।

(৯) গ্রীবা বেশ লম্বা। ইহা মস্তককে দেহকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে।

(১০) দেহকাণ্ডের অগ্রভাগের পৃষ্ঠদেশে পাশাপাশি দুইটি **ডানা** (Wings) থাকে। ইহারা অগ্রপদের রূপান্তর। ডানায় বড় বড় তেইশটি পালক এবং অসংখ্য ছোট পালক আছে। বড় পালকগুলিকে **রেমিজেস** (Remiges) বলা হয়।

(১১) দেহকাণ্ডের অঙ্কদেশে এক জোড়া পা বা **পদ** (Legs) থাকে। পদের শেষ অংশ **আঁইশ** (Scale) দিয়া আবৃত।

(১২) প্রতি পদে **নখর**(Claws)-যুক্ত চারটি **অঙ্গুলি** (Digits) আছে। তিনটি অঙ্গুলি সামনের দিকে এবং অপরটি পিছনের দিকে থাকে।

(১৩) দেহকাণ্ডের শেষপ্রান্তের অঙ্কদেশে বড় **অবসারণী-ছিদ্র** (Cloacal aperture) অবস্থিত।

(১৪) অবসারণী-ছিদ্রের পিছনে খুব ছোট একটি লেজ থাকে। লেজ হইতে বারোটি বড় পালক বাহির হয়। এই পালকগুলিকে **পুচ্ছ-পালক** (Tail feathers) বা **রেট্রিসেস** (Retrices) বলে। সচরাচর পুচ্ছ-পালকের সমষ্টিকে **পুচ্ছ** (Tail) বলা হয়।

গিনিপিগ
(Guineapig)

গিনিপিগ কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত, ভার্টিব্রাটা উপবর্গের অন্তর্ভুক্ত, স্তন্যপায়ী বা ম্যামালিয়া শ্রেণী(Class Mammalia)-র প্রাণী।

বিজ্ঞান-সম্মত নাম—

কেভিয়া পোর্‌সেলাস (*Cavia porcellus*)।

(১) গিনিপিগের দেহ **দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম** (Bilaterally symmetrical) এবং **মস্তক** (Head), **গ্রীবা** (Neck) ও **দেহকাণ্ড** (Trunk)—এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

(২) গিনিপিগ লম্বায় কুড়ি সেন্টিমিটার পর্যন্ত হইতে পারে।

(৩) মস্তকের অগ্রভাগের কিছু অংশ এবং পদতল ছাড়া, দেহের অন্যান্য অংশ **লোম** (Hairs) দিয়া আবৃত।

(৪) মস্তক লম্বাটে। ইহার অগ্র-প্রান্তে **মুখ** (Mouth) অবস্থিত। মুখ **ঊর্ধ্বোষ্ঠ** (Upper lip) এবং **নিম্নোষ্ঠ** (Lower lip) দিয়া সুরক্ষিত। ঊর্ধ্বোষ্ঠ মাঝখানে চেরা (Cleft)।

(৫) ঊর্ধ্বোষ্ঠে দুইটি **নাসারন্ধ্র** (Nostrils) পাশাপাশি অবস্থিত।

(৬) ঊর্ধ্বোষ্ঠের দুই পাশে কয়েকটি বড় বড় শক্ত লোম থাকে। ইহাদের **গুম্ফ** (Vibrissae) বলে।

(৭) মস্তকের দুই পাশে দুইটি **চক্ষু** (Eyes) আছে। প্রতিটি চক্ষুর উপরে ও নিচে যথাক্রমে **ঊর্ধ্ব-নেত্রপল্লব** (Upper eye-lid) এবং **নিম্ন-নেত্রপল্লব** (Lower eye-lid) থাকে। ইহাদের **উপপল্লব** (Nictitating membrane) ক্ষয়প্রাপ্ত এবং চক্ষুর ভিতরের কোণের দিকে অবস্থিত।

(৮) চক্ষুর পিছনে **কর্ণছত্র** (Pinna) থাকে। ইহার গোড়ায় অবস্থিত ছিদ্রটিকে **কর্ণকুহর** (Auditory meatus) বলে।

(৯) গ্রীবা ছোট। ইহা মস্তককে দেহকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে।

(১০) দেহকাণ্ডের অগ্রভাগকে **বক্ষ** (Thorax) এবং পশ্চাৎ-ভাগকে **উদর** (Abdomen) বলা হয়।

(১১) বক্ষ ও উদরের দুই পাশ হইতে যথাক্রমে এক জোড়া করিয়া **অগ্রপদ** (Fore limbs) এবং **পশ্চাৎ-পদ** (Hind limbs) বাহির হয়।

(১২) অগ্রপদে চারটি এবং পশ্চাৎ-পদে তিনটি করিয়া **নখর**(Claws)-যুক্ত **অঙ্গুলি** (Digits) আছে।

(১৩) উদরের অঙ্কদেশে দুইটি **স্তনবৃন্ত** (Teats) থাকে।

(১৪) দেহকাণ্ডের শেষপ্রান্তে **পায়ু** (Anus) অবস্থিত।

(১৫) পুরুষ-গিনিপিগের পায়ুর সামনে একটি নলাকার **পুং-জননেন্দ্রিয়**
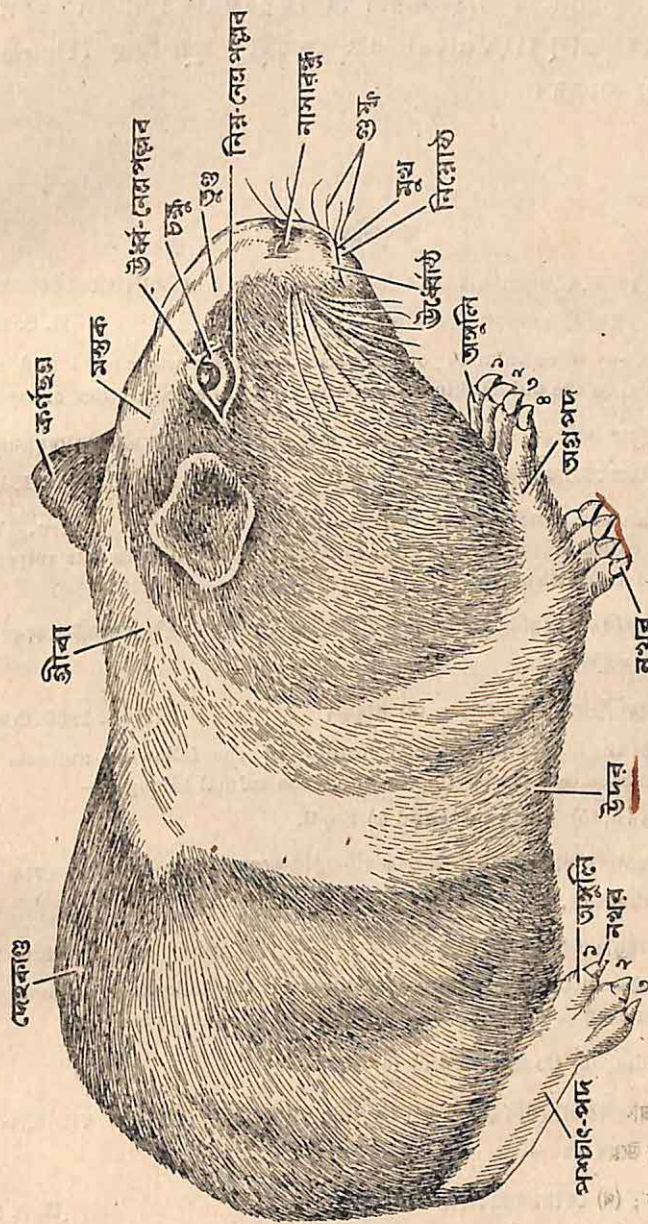
১৫০নং চিত্র—গিনিপিগ।

(**Penis**) এবং তাহার গোড়ায় থলির-মতো একটি **অণ্ডকোষ** (**Scrotum**) থাকে। স্ত্রী-গিনিপিগের পায়ুর সামনে পর পর দুইটি ছিদ্র থাকে। ইহাদের মধ্যে বড়টিকে **ভাল্‌ভা** (**Vulva**) এবং ছোটটিকে **মূত্র-ছিদ্র** (**Urinary aperture**) বলা হয়।

অনুশীলনী

১। পুকুরের জলে পাওয়া যায় এমন তিনটি প্রাণীর নাম কর এবং প্রাণি-রাজ্যে উহাদের স্থান নির্দেশ কর। প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [H. S. 1961]

Mention any three animals you have seen in a fresh-water pond and state their position in the animal kingdom. Give an outline description of each.

২। হাইড্রার শরীরের গঠন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ। হাইড্রাকে একনালীদেহী বলা হয় কেন? এ-বিষয়ে কেঁচোর সঙ্গে ইহার প্রভেদ দেখাও। [*cp*. H. S. 1971, 1970]

Write a short note on the construction of the body of *Hydra*. Why *Hydra* is called a member of Coelenterata? Show, how in this respect, it differs from an Earthworm.

৩। নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি বর্ণনা কর এবং কোনটি কোন পর্বের অন্তর্গত, তাহা বল :— [H. S. 1962 (Comp.)]

(ক) গলদা চিংড়ি; (খ) কেঁচো ও (গ) শামুক।

Describe the distinctive external features of the following animals and mention in each case the phylum to which the animal belongs :—

(*a*) Prawn, (*b*) Earthworm and (*c*) Snail.

৪। নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি উল্লেখ কর এবং কোনটিকে কোন পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহা বল :— [H. S. 1962]

(ক) হাইড্রা; (খ) আরসোলা ও (গ) রুই।

State the distinctive external features of the following animals and mention in each case the phylum in which the animal is placed :—

(*a*) Hydra, (*b*) Cockroach and (*c*) Rohu.

৫। নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির বিজ্ঞান-সম্মত নাম, বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি এবং প্রাণি-রাজ্যে উহাদের স্থান উল্লেখ কর :— [H. S. 1967]

(ক) কৈ; (খ) কোলা ব্যাঙ; (গ) গিনিপিগ।

Mention the scientific names and distinctive external features of the following animals and indicate their position in the animal kingdom :—

(*a*) Koi, (*b*) Frog, (*c*) Guineapig.

৬। নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি, এবং উহারা যে যে পর্ব ও শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা উল্লেখ কর :—

(ক) মাগুর ; (খ) টিকটিকি ; (গ) গিনিপিগ। [H. S. 1966 (Comp.)]

Mention the distinctive external features of the following animal and state the Phylum and Class to which they belong :—

(*a*) Magur ; (*b*) Lizard ; (*c*) Guineapig.

৭। নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি, এবং উহারা যে যে পর্ব ও শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা উল্লেখ কর :—

(ক) আরসোলা ; (খ) মাকড়সা ; (গ) শামুক। [H. S. 1966]

Mention the distinctive external features of the following animals and state the Phylum and Class to which they belong :—

(*a*) Cockroach ; (*b*) Spider ; (*c*) Snail.

৮। নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির যে-কোনও তিনটির বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি উল্লেখ কর এবং উহারা যে যে পর্ব ও শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা বল :—

(ক) শতপদী ; (খ) শিঙি ; (গ) কুনো ব্যাঙ ; (ঘ) পায়রা।

Mention the distinctive external features of any three of the following animals and state the Phylum and Class to which they belong :—

(*a*) Centipede ; (*b*) Shingi ; (*c*) Toad ; (*d*) Pigeon.

৯। শিঙি ও মাগুরের বহিরাকৃতির প্রধান পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর।

Point out the main differences in external features of Shingi and Magur.
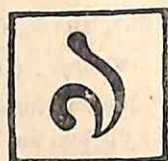
কয়েকটি প্রাণীর বিশদ বিবরণ
(Detailed account of some animals)

এই পরিচ্ছেদে কেঁচো, চিংড়ি, আরসোলা, রুই, কুনো ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ, টিকৃটিকি, পায়রা ও গিনিপিগ—এই কয়টি প্রাণীর স্বভাব, বসতি, বহিরাকৃতির বিভিন্ন অঙ্গের কাজ ইত্যাদি আলোচনা করা হইল।

কেঁচো
(Earthworm)

স্বভাব ও বসতি (**Habit and Habitat**)

কেঁচো মাটির নিচে, গর্তে বাস করে। ইহাদের গর্ত মোটামুটি সোজা। সাধারণতঃ ভিজা এবং আল্‌গা মাটিই ইহাদের বসতি। বর্ষাকালে মাটির উপরের স্তর ভিজা থাকে। তখন ইহারা মাটির নিচে, ত্রিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত গভীরতায় থাকে। শীতকালে অথবা বসন্তকালে মাটির উপরের স্তর শুকাইয়া গেলে, ইহারা আরও গভীরে চলিয়া যায়।
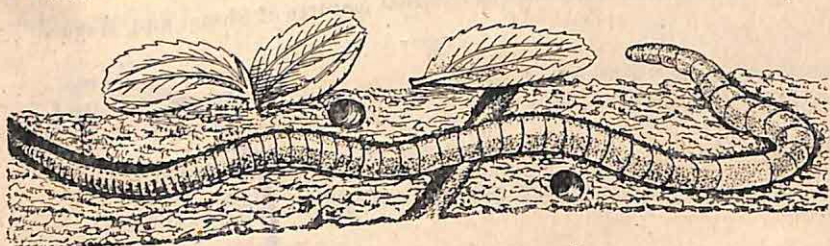
১৫১নং চিত্র—কেঁচোর স্বাভাবিক বসতি।

কেঁচো স্বভাবে খুব নিরীহ, নিশাচর এবং অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসে। দিনের বেলা ইহারা গর্তের মধ্যে চুপচাপ থাকে, রাত্রে খাবারের খোঁজে মাটির উপরে উঠিয়া আসে। তাহা ছাড়া, যৌন-সঙ্গম(Mating)-এর সময়, এবং বর্ষাকালে গর্তের মধ্যে জল প্রবেশ করিলে, কেঁচো গর্তের বাহিরে চলিয়া আসে। বাহিরে আসিয়া, ইহারা সাধারণতঃ পাতা অথবা অন্য কিছু দিয়া, গর্তের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়।

গমন (Locomotion)

দেহকে ক্রমান্বয়ে বেঁটে ও মোটা এবং সরু ও লম্বা করিয়া, অর্থাৎ যথাক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া, কেঁচো খুব ধীরে ধীরে চলাফেরা বা **গমন** (Locomotion)* করে। এই সময়ে, ইহারা ছোট ছোট কাঁটার মতো **সিটা** (Seta)-গুলির সাহায্য নেয়।

খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ (Food and Feeding)

পচা পাতা, ছোট ছোট বীজ, পতঙ্গের ডিম এবং মাটিতে মিশ্রিত গলিত জৈব পদার্থ কেঁচোর খাদ্য। মাটিতে খাদ্যের পরিমাণ অল্প থাকায়, কেঁচো মুখ দিয়া ক্রমাগত খাদ্য-মিশ্রিত মাটি গ্রহণ করে। মাটির খাদ্যভাগ পৌষ্টিক নালীতে শোষণ করিয়া, খাদ্যশূন্য মাটিকে পায়ু দিয়া বাহির করিয়া দেয়।† মাটির সঙ্গে কেঁচোর নাইট্রোজেন-ঘটিত বর্জ্য পদার্থ-ও বাহির হইয়া আসে। বর্জিত মাটি কেঁচোর গর্তের মুখে জমা হয়। এইগুলিকে কেঁচোর **বিষ্ঠাকুণ্ডলী** (Castings) বলে। কোনও জায়গায় বিষ্ঠাকুণ্ডলী দেখিয়া, সেখানে কেঁচোর অস্তিত্ব বোঝা যায়। আলোচ্য কেঁচোর বিষ্ঠাকুণ্ডলী, অবশ্য, কুণ্ডলী-আকারে থাকে না—ছোট গোল গোল দলা বা বড়ির আকারে জমা হয়।

জনন (Reproduction)

বর্ষাকালে কেঁচো বংশবৃদ্ধি করে। এই সময়ে ইহারা খুব সক্রিয় হইয়া উঠে। কাজেই তখন, বিশেষ করিয়া রাত্রে, কেঁচো ধরা সহজ।

কেঁচোর হৃত দেহাংশের **পুনরুৎপত্তি** (Regeneration) করার ক্ষমতা খুব বেশি। অগ্রভাগ-বিহীন কেঁচো আবার অগ্রভাগ সৃষ্টি করিতে পারে। একইভাবে, পশ্চাদ্‌ভাগ-বিহীন কেঁচো পশ্চাদ্‌ভাগের পুনর্জন্ম দেয়। কেঁচো সাধারণতঃ সাড়ে তিন বছরের বেশি বাঁচে না।

বহিরাকৃতি (External features)

কেঁচোর দেহ স্বচ্ছ **কৃত্তিক**(Cuticle)-নির্মিত পাতলা আবরণ দিয়া আবৃত। কঠিন বস্তুর আঘাত হইতে কেঁচোর নরম দেহকে রক্ষা করা ইহার কাজ।

---

* যে প্রক্রিয়ায় জীব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে, তাহাকে গমন (Locomotion) বলা হয়।

† "কেঁচো মাটি খায়"—এই প্রচলিত ধারণা ভুল। কারণ, কেঁচো আদৌ মাটি খায় না। খাদ্য-মিশ্রিত মাটি কেঁচোর পৌষ্টিক নালীতে যেমন প্রবেশ করে, তেমনি খাদ্যশূন্য মাটি আবার উহার পায়ু দিয়া বাহির হইয়া আসে।

দেহ-খণ্ডকের দুইদিকে অবস্থিত দুইটি খাঁজ, বাহির হইতে প্রতিটি দেহ-খণ্ডকের সীমা নির্দেশ করে। প্রথম, শেষ এবং ক্লাইটেলামের দেহ-খণ্ডকগুলি ছাড়া, প্রত্যেক দেহ-খণ্ডকের মাঝ-বরাবর কতকগুলি বাঁকা, ছোট সূচের মতো **সিটা** (Seta) বৃত্তাকারে পর পর সাজানো থাকে। সিটাগুলি সাধারণতঃ অঙ্কদেশে এবং পার্শ্বদেশে বেশি সংখ্যায় থাকে। এইগুলি দেখিতে অনেকটা ইংরেজী লম্বা "*S*" অক্ষরের মতো। সিটা কেঁচোর **গমন-অঙ্গ** (**Organs of locomotion**)। ইহাদের সাহায্যে কেঁচো গমন এবং অনুভব করে।

পৃষ্ঠদেশের মধ্যরেখা-বরাবর অবস্থিত কালো দাগটি (১৭৮ পৃষ্ঠা) আসলে দেহের মধ্যে ঐ জায়গায় অবস্থিত একটি রক্তবাহী নালীর অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

১৫২নং চিত্র—কেঁচোর অগ্রভাগ (পৃষ্ঠদৃশ্য)।

মুখের ছিদ্র অর্ধ-চন্দ্রাকার। ইহার পৃষ্ঠভাগে, প্রথম দেহ-খণ্ডকে একটি মাংসল অংশ থাকে। ইহাকে **ওষ্ঠ** বা **প্রস্টোমিয়াম** (**Prostomium**) বলা হয়। মুখ দিয়া কেঁচো খাদ্য গ্রহণ করে; প্রস্টোমিয়াম ঐ কাজে সাহায্য করে।

ক্লাইটেলাম(**Clitellum**)-এর অপর নাম **সিংগুলাম** (**Cingulum**)। ইহা কেঁচোর দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্লাইটেলামের আগে অবস্থিত দেহাংশকে সাধারণভাবে দেহের অগ্রভাগ এবং উহার পরের অংশকে পশ্চাদ্‌ভাগ বলা হয়। ক্লাইটেলামের দেহ-খণ্ডকগুলির মধ্যবর্তী জায়গায় বাহির হইতে কোনও খাঁজ দেখা যায় না। কারণ, বাদামী রঙের ফিতার মতো একটি গঠন এই অংশকে ঘিরিয়া রাখে। যৌন-সঙ্গমের সময়, এই অংশ হইতে একরকম রস বাহির হয় এবং পরে ঐ রস শুকাইয়া, কেঁচোর **গুটি** বা **কোকুন** (Cocoon) সৃষ্টি করে।
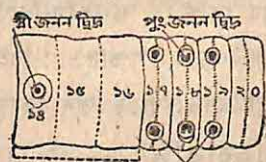
১৫৩নং চিত্র—কেঁচোর ক্লাইটেলাম-অঞ্চল (অঙ্কদৃশ্য)

ক্লাইটেলামের চতুর্দশ দেহ-খণ্ডকের অঙ্কদেশের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে। ইহা কেঁচোর **স্ত্রী-জননছিদ্র** (**Female generative aperture**)। এই ছিদ্র দিয়া **ডিম্বাণু** (**Ova**) বাহির হয়। ক্লাইটেলামের অষ্টাদশ দেহ-খণ্ডকে, অঙ্কদেশের মধ্যরেখার দুই পাশে দুইটি **পুং-জননছিদ্র** (**Male generative apertures**) থাকে। যৌন-সঙ্গমের

সময়, ঐ ছিদ্র দিয়া **শুক্রাণু** (Sperms) বাহির হয়। সপ্তদশ এবং উনবিংশ দেহ-খণ্ডকের অঙ্কদেশে, একইভাবে এক জোড়া করিয়া মোট দুই জোড়া **জনন-পিড়কা** (Genital papillae) থাকে। জননপিড়কাগুলি ছিদ্র নয়, দেখিতে কতকটা ছোট রেকাবীর মতো। ইহারা পুং-জননছিদ্র দুইটির ঠিক সামনে এবং পিছনে থাকে। যৌন-সঙ্গমের সময়, জননপিড়কাগুলি হইতে একরকম আঠালো রস বাহির হয় এবং উহার সাহায্যে সঙ্গমরত কেঁচো দুইটি পরস্পরের সঙ্গে আট্‌কাইয়া থাকে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ, ষষ্ঠ ও সপ্তম, সপ্তম ও অষ্টম, অষ্টম ও নবম—এই দেহ-খণ্ডক-গুলির মধ্যবর্তী খাঁজের কিছুটা অঙ্কদেশ ঘেঁষিয়া, প্রতি পাশে একটি করিয়া মোট চার জোড়া **শুক্রধানী-ছিদ্র** (**Spermathecal apertures**) থাকে। যৌন-সঙ্গমের সময়, অপর কেঁচোর দেহ হইতে শুক্রাণু এই ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া, দেহ-মধ্যস্থ **শুক্রধানী**(Spermatheca)-তে সাময়িকভাবে জমা হয়। পরে ঐ ছিদ্র-পথে শুক্রাণুগুলি আবার বাহির হইয়া **নিষেক**(Fertilisation)-এর কাজে লাগে।
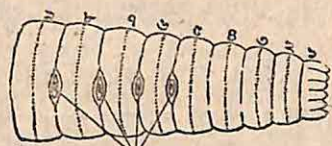
১৫৪নং চিত্র—কেঁচোর অগ্রভাগ (পার্শ্বদৃশ্য)।

দ্বাদশ দেহ-খণ্ডক হইতে শুরু করিয়া, শেষ দেহ-খণ্ডকের আগের দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত প্রত্যেক দুইটি দেহ-খণ্ডকের সংযোগ-স্থলে, পৃষ্ঠদেশের মধ্যরেখা-বরাবর একটি করিয়া ছিদ্র থাকে। এইগুলির নাম **পৃষ্ঠ-ছিদ্র** (**Dorsal pores**)। পৃষ্ঠ-ছিদ্রের মধ্য দিয়া দেহ হইতে একরকম রস (Coelomic fiuid) বাহির হইয়া, দেহের উপরিভাগকে পিচ্ছিল এবং ভিজা রাখে। শ্বসন এবং গমনের সুবিধার জন্য, কেঁচোর ত্বক্ ভিজা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথম দুইটি দেহ-খণ্ডক ছাড়া অন্যান্য দেহ-খণ্ডকগুলিতে, বিশেষ করিয়া উহাদের অঙ্কদেশে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি **রেচন-ছিদ্র** (**Nephridio-pores**) থাকে। রেচন-ছিদ্রের মধ্য দিয়া দেহ হইতে তরল রেচন-পদার্থ নিষ্কাশিত হয়।

শেষ দেহ-খণ্ডকে অবস্থিত **পায়ু** (**Anus**) উপবৃত্তাকার ছিদ্রবিশেষ। ইহার মধ্য দিয়া মল বাহির হয়।

কেঁচোর উপকারিতা (Importance of Earthworm)

যে স্থানে কেঁচো বাস করে, সেখানকার মাটিকে ইহারা উর্বর করিয়া তোলে। প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে কেঁচো মাটিকে উর্বর করে। যেমন—(১) মাটিতে অসংখ্য গর্ত করায়, মাটির ভিতরে আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে পারে ; (২) নিচের নরম মাটি উপরে আসায়, উপরের কাঁকর-বালি-মিশ্রিত মাটি ক্রমে নিচে নামিয়া যায় ; (৩) কেঁচোর বিষ্ঠাকুণ্ডলীতে নাইট্রোজেন-ঘটিত বর্জ্য দ্রব্য থাকায়, উহা উৎকৃষ্ট সারের কাজ করে। কেঁচো নিচের মাটি উপরে তোলায় কতকটা লাঙল দেওয়ার কাজ হয়। সেইজন্য, কেঁচোকে জমির "স্বাভাবিক কর্ষক" বলা হয়। মানুষ সৃষ্টির বহু পূর্ব হইতেই কেঁচো জমি কর্ষণ করিয়া আসিতেছে। সেই কারণে, কেঁচোকে "পৃথিবীর প্রথম কর্ষক" বলা হয়। জমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া কেঁচো কৃষকের অনেক উপকার করে।

কেঁচো কয়েক জাতের পাখি এবং মাছের প্রিয় খাদ্য। মাছ ধরার 'টোপ' হিসাবে কেঁচো ব্যবহৃত হয়। অঙ্গুরীমাল প্রাণীদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য কেঁচোকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং পরীক্ষাগারে ইহারা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

আরসোলা
(Cockroach)

স্বভাব ও বসতি (Habit and Habitat)

আরসোলা গৃহস্থালির অন্যতম উপদ্রব। ইহারা স্বভাবে **নিশাচর** (**Nocturnal**) এবং গরম ও অন্ধকার স্থান পছন্দ করে। দিনের বেলা সাধারণতঃ রান্নাঘর, ভাঁড়ার, গুদাম ইত্যাদির অন্ধকার কোণে লুকাইয়া থাকে, রাত্রে খাবারের খোঁজে বাহির হইয়া আসে।

খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ (Food and Feeding)

আরসোলা অতিভোজী। জল-অঙ্গার (Carbohydrate) অর্থাৎ শ্বেতসার (Starch) এবং শর্করা(Sugar)-জাতীয় খাদ্যই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা আলু, চাল, ডাল এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য খাইয়া প্রচুর ক্ষতি করে। মুখোপাঙ্গগুলি আরসোলার খাদ্যগ্রহণে সাহায্য করে। খাদ্যগ্রহণের সময় লালা (Saliva) নিঃসৃত হওয়ায়, মুখোপাঙ্গগুলি ভিজিয়া যায়। কাজেই, খাদ্য মুখে প্রবেশ করার আগে লালার সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

গমন (Locomotion)

স্বাভাবিক অবস্থায় তিন জোড়া **পদ** (Legs) অর্থাৎ পায়ের সাহায্যে আরসোলা হাঁটিয়া চলাফেরা করে। শুঙ্গ দুইটি ইহাদের পথ-নির্দেশে সাহায্য করে। কিন্তু হঠাৎ কোনও কারণে উত্তেজিত হইলে, দুই জোড়া **ডানা** (Wings)-র সাহায্যে উড়িতে শুরু করে।

বহিরাকৃতি (External features)

আরসোলার **মস্তক** (Head) অনেকটা ত্রিকোণাকার এবং বক্ষের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত। ফলে, মস্তকের অগ্রভাগ অঙ্কদেশে থাকে। মস্তকের কৃত্তিক-নির্মিত আবরণ অপেক্ষাকৃত পুরু এবং শক্ত। শুঙ্গ দুইটির পিছনে একটি করিয়া মোট দুইটি বড় ও গোল **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eyes) থাকে। প্রতিটি পুঞ্জাক্ষি আসলে অসংখ্য ছোট ছোট **ওমাটিডিয়া** (Ommatidia)-র সমষ্টি। ইহার উপরিভাগে ছক্-কাগজের মতো দাগ থাকে। পুঞ্জাক্ষি দুইটি আরসোলার দর্শনেন্দ্রিয়। মস্তকের শীর্ষদেশে ইংরেজী উল্টা "Y" অক্ষরের মতো একটি সাদা দাগ দেখা যায়।

আরসোলার মস্তকে চার জোড়া উপাঙ্গ থাকে। এইগুলিকে **শির-উপাঙ্গ** (Cephalic appendages) বলে। আরসোলার শির-উপাঙ্গগুলি নিম্নরূপ।

(১) এক জোড়া **শুঙ্গ** বা **অ্যান্টেনা** (Antenna) পুঞ্জাক্ষি দুইটির মাঝে অবস্থিত। ইহারা লম্বা এবং পঁচাত্তর হইতে নব্বুইটি গাঁইট-যুক্ত। প্রতিটি গাঁইটে অসংখ্য ছোট ছোট রোম থাকে। শুঙ্গ দুইটি আরসোলার স্পর্শেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

(২) মুখের প্রতি পাশে একটি করিয়া মোট এক জোড়া **চোয়াল** বা **ম্যাণ্ডিব্‌ল** (Mandibles) অবস্থিত। ইহাদের ভিতরের দিকে শক্ত দাঁত থাকে। খাদ্য পেষা এবং ছেঁড়া ইহাদের কাজ।

(৩) চোয়ালের পিছনে এক জোড়া **প্রথম ম্যাক্সিলা** (First Maxillae) বা **লেব্রাম** (Labrum) অবস্থিত। ইহারা ঊর্ধ্বোষ্ঠের মতো খাদ্যগ্রহণে সাহায্য করে।

(৪) প্রথম ম্যাক্সিলা দুইটির পিছনে এক জোড়া **দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা** (Second Maxillae) বা **লেবিয়াম** (Labium) মাঝ-বরাবর অবস্থিত। ইহারা নিম্নোষ্ঠের মতো খাদ্যগ্রহণে সাহায্য করে। লেবিয়ামের ভিতরের

দিকে **জিহ্বা** বা **হাইপোফ্যারিংস** (Hypopharynx) নামে একটা অংশ থাকে।

লেব্রামের নিচে **মুখ** (Mouth) অবস্থিত। চোয়াল, প্রথম ও দ্বিতীয় ম্যাক্সিলাকে আরসোলার **মুখোপাঙ্গ** (Mouth parts) বলা হয় (১৫৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

ছোট **গ্রীবা** (Neck) মস্তককে বক্ষের সঙ্গে যুক্ত করে। আরসোলা ইহার সাহায্যে মস্তকটিকে উল্লম্বতলে ঘুরাইতে পারে।

আরসোলার **বক্ষ**(Thorax)-কে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়। যেমন—**অগ্রবক্ষ** (Prothorax), **মধ্যবক্ষ** (Mesothorax) এবং **পশ্চাদ্‌বক্ষ** (Metathorax)। এই অংশগুলি পাতলা পর্দা দিয়া পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। বক্ষের প্রতিটি অংশের পৃষ্ঠ্য, পার্শ্বীয় এবং অঙ্কীয় দেশ কুত্তিক-নির্মিত আবরণ দিয়া সুরক্ষিত। অগ্রবক্ষের পৃষ্ঠদেশের আবরণটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং ত্রিকোণাকার। ইহা গ্রীবাকে এবং মধ্যবক্ষের প্রথমভাগ পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখে। ইহাকে **প্রোনোটাম** (Pronotum) বলা হয়।
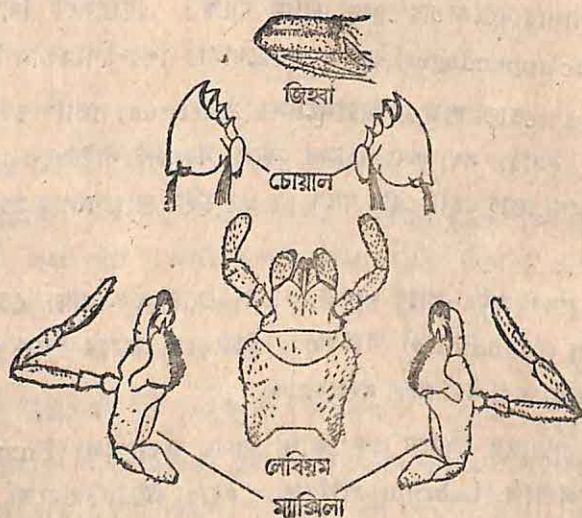
১৫৫নং চিত্র—আরসোলার মুখোপাঙ্গ।

অগ্রবক্ষ ও মধ্যবক্ষের সংযোগ-স্থলের পৃষ্ঠদেশ হইতে এক জোড়া, এবং মধ্যবক্ষ ও পশ্চাদ্‌বক্ষের সংযোগ-স্থলের ঐরকম স্থান হইতে আর এক জোড়া—মোট দুই জোড়া **ডানা** (Wings) বাহির হয়। প্রথম ডানা জোড়া অপেক্ষাকৃত

পুরু, কিন্তু দ্বিতীয় জোড়া পাতলা। সাধারণ অবস্থায় দ্বিতীয় ডানা জোড়া ভাঁজ হইয়া থাকে এবং প্রথম জোড়া উহাদের ঢাকিয়া রাখে। ডানাগুলিতে পাতার
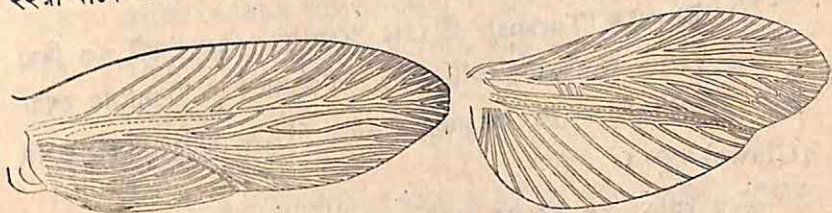
১৫৬নং চিত্র—আরসোলার ডানা: ক. সামনের ডানা, খ. পিছনের ডানা।

মতো শিরা (Veins) থাকে। ইহাদের সাহায্যে আরসোলা উড়িতে পারে বস্তুতঃপক্ষে, দ্বিতীয় ডানা জোড়ার সাহায্যেই আরসোলা উড়িয়া থাকে।

বক্ষের প্রত্যেকটি খণ্ডকের অঙ্ক-দেশে এক জোড়া করিয়া, মোট তিন জোড়া পদ (Legs) থাকে। প্রত্যেক পদে নিচে বর্ণিত পাঁচটি প্রধান অংশ থাকে।

১৫৭নং চিত্র—আরসোলার পদ।

(১) কক্সা (Coxa)—ইহার প্রথম অংশ চওড়া, শেষ অংশ সরু। ইহা দেহের সঙ্গে আটকানো থাকে।

(২) ট্রোক্যান্টার (Trochanter)—একটি ছোট অংশ। কক্সার সঙ্গে আল্‌গাভাবে লাগানো থাকায়, ইহা ঘুরিতে পারে।

(৩) ফিমার (Femur)—লম্বা, দণ্ডের মতো অংশ। ইহা ট্রোক্যান্টারের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে লাগানো থাকে ইহার গায়ে ছোট ছোট কণ্টক আছে।

(৪) টিবিয়া (Tibia)—ফিমারের চেয়ে সরু এবং লম্বা। ইহার গায়ে
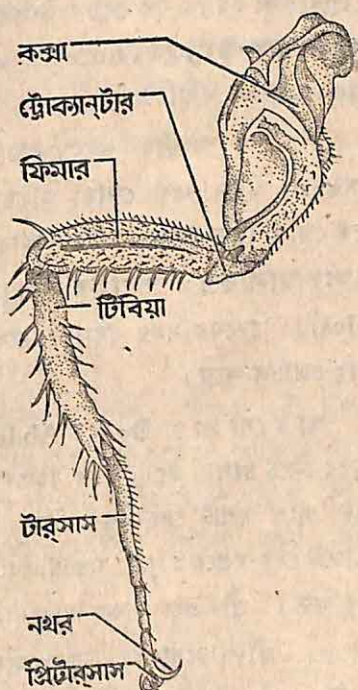
অনেকগুলি বড় বড় কণ্টক থাকে। ফিমারের সঙ্গে ইহা এমনভাবে যুক্ত থাকে, যাহাতে এই অংশ ভাঁজ হইয়া ফিমারের নিচে আসিতে পারে।

(৫) **টার্সাস** (Tarsus)—টিবিয়ার পরের অংশ এবং পাঁচটি খণ্ড দিয়া গঠিত। ইহাতে অনেকগুলি ছোট ছোট কণ্টক থাকে। টার্সাসের শেষ-ভাগকে **প্রিটার্সাস** (Pretarsus) বলে। ইহাতে দুইটি বাঁকা **নখর** (Claws) থাকে।

প্রথম জোড়া পদ সবচেয়ে ছোট এবং তৃতীয় জোড়া সবচেয়ে বড়। পদগুলির সাহায্যে আরসোলা চলাফেরা করে বলিয়া, ইহাদের **চলিবার উপাঙ্গ** (Walking legs) বলা হয়। বক্ষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, ইহারা **বক্ষ-উপাঙ্গ** (Thoracic appendages) নামে পরিচিত।

১৫৮নং চিত্র—(ক) স্ত্রী- ও (খ) পুরুষ-আরসোলার উদরের শেষভাগ (অঙ্কদৃশ্য)।

পর পর অবস্থিত দুই জোড়া পদের অন্তর্বর্তী স্থানে এক জোড়া করিয়া, মোট দুই জোড়া ছিদ্র থাকে। ইহারা আরসোলার বক্ষঃস্থ **শ্বাসছিদ্র** বা **স্পাইরাকল** (Spiracles)। শ্বসনের সময় ইহাদের মধ্যে দিয়া বায়ু-চলাচল করে।

আরসোলার **উদর** (Abdomen) উপর-নিচে চাপা। ইহা দেহের বৃহত্তম অংশ। এই অংশ দশটি দেহ-খণ্ডক দিয়া গঠিত। প্রতিটি দেহ-খণ্ডকের পৃষ্ঠ্য, অঙ্কীয় এবং পার্শ্বীয় দেশ ক্বিতিক-নির্মিত আবরণ দিয়া সুরক্ষিত। স্ত্রী- এবং পুরুষ-আরসোলার উদরের গঠনে কতকগুলি পার্থক্য আছে। স্ত্রী-আরসোলার উদর অপেক্ষাকৃত মোটা এবং শেষ-অংশ ভোঁতা; দশটি দেহ-খণ্ডকের মধ্যে মাত্র সাতটি অঙ্কদেশ হইতে দেখা যায়; সপ্তম দেহ-খণ্ডকটি খুব বড় এবং দেখিতে নৌকার মতো। এই দেহ-খণ্ডকের অঙ্কদেশে অবস্থিত ছিদ্র দিয়া স্ত্রী-আরসোলা **ডিম্বাধার** (Ootheca) প্রসব করে। পুরুষ-আরসোলার উদর লম্বা এবং শেষ-অংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে; অঙ্ক-দেশ হইতে নয়টি দেহ-খণ্ডক দেখা যায়; নবম দেহ-খণ্ডকের অঙ্কদেশে অবস্থিত

ছিদ্রের মধ্য দিয়া **শুক্রাণু** (Sperms) বাহির হয়। পুরুষ-আরসোলার নবম দেহ-খণ্ডকে এক জোড়া গাঁইট-বিহীন **কূর্চ** বা **এনাল স্টাইল** (Anal styles) থাকে। উদরের শেষভাগে **পায়ু** (Anus) অবস্থিত। পায়ু দিয়া মল বাহির হয়। পায়ুর উপরে একটি এবং দুই পাশে দুইটি কৃত্তিক-নির্মিত ছোট পাত থাকে। দশম দেহ-খণ্ডকের দুই পাশ হইতে বহু-গাঁইটযুক্ত দুইটি **পায়ুকূর্চ** বা **এনাল সার্‌সি** (Anal cerci)* বাহির হয়।

উদরে মোট আট জোড়া শ্বাসছিদ্র থাকে। প্রথম জোড়া শ্বাসছিদ্র উদরের প্রথম দেহ-খণ্ডকের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। অন্যান্য শ্বাসছিদ্র দেহ-খণ্ডকগুলির সংযোগ-স্থলের পাশে থাকে। ইহাদের কাজ বক্ষের শ্বাসছিদ্রগুলির মতো।

আরসোলার গুরুত্ব (Importance of Cockroach)

কোনও কোনও দেশে আরসোলা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আরসোলা অন্যতম **অপকারী পতঙ্গ** (Harmful insect)। ইহারা গৃহস্থালির উপদ্রব এবং নানারকম সংক্রামক ব্যাধির বাহক। অধিকাংশ দেশে আরসোলার বিবরণ দিয়া পতঙ্গ-বিজ্ঞান(Entomology)-এর শিক্ষা শুরু হয়।

চিংড়ি
(Prawn)

স্বভাব ও বসতি (Habit and Habitat)

গলদা চিংড়ি নামক চিংড়ি মিঠা জলের বাসিন্দা। ইহারা নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতির অপেক্ষাকৃত স্রোতবিহীন জলে বাস করে। চিংড়ি স্বভাবে **নিশাচর** (Nocturnal), দিনের বেলায় জলের গভীর অংশে চলিয়া যায়। কিন্তু রাত্রে, বিশেষ করিয়া রাত্রির শেষভাগে, খাদ্যের সন্ধানে পুকুর, নদী প্রভৃতির পাড়ের দিকে অল্প জলে চলিয়া আসে।

খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ (Food and Feeding)

নানা ধরনের শেওলা ও জলজ উদ্ভিদ গলদা চিংড়ির প্রধান খাদ্য। তবে ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ এবং জলের তলায় পড়িয়া-থাকা গলিত জৈব পদার্থ-ও ইহারা খাইয়া থাকে। খাদ্যের সঙ্গে কিছু বালিও ইহাদের পৌষ্টিক নালীতে

* বহুবচন ; এনাল সার্‌কাস (Anal cercus) — একবচন।

প্রবেশ করে। খাদ্যগ্রহণের সময় ইহারা সাঁড়াশির মতো দুই জোড়া বক্ষ-উপাঙ্গ দিয়া খাদ্যের টুকরাগুলিকে মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এই দুই জোড়া উপাঙ্গ ছাড়া, মস্তক ও বক্ষের আরও কতকগুলি উপাঙ্গ খাদ্যগ্রহণে নানাভাবে সাহায্য করে (পরে দ্রষ্টব্য)।

গমন (Locomotion)

স্বাভাবিক অবস্থায় চিংড়ি বক্ষ-সংলগ্ন পাঁচ জোড়া **চলিবার উপাঙ্গ** (Walking legs) দিয়া জলের তলায় ধীরে ধীরে হাঁটিতে পারে। **উদর-উপাঙ্গ**(Abdominal appendages)-এর সাহায্যে ইহারা খুব ধীরে ধীরে সাঁতার দিতে পারে। কিন্তু হঠাৎ জরুরী প্রয়োজনে, ইহারা উদরের শেষপ্রান্তে অবস্থিত **পুচ্ছ-পাখ্না**(Tail fin)-র সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি পিছনের দিকে বেশ কিছুদূর লাফাইয়া যাইতে পারে।

জনন (Reproduction)

চিংড়ি দলবদ্ধভাবে থাকে। সাধারণতঃ বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ইহা খুব তৎপর হইয়া উঠে। গ্রীষ্মের শেষে এবং বর্ষার শুরুতে ইহারা বংশবৃদ্ধি করে। এই সময়ে স্ত্রী-চিংড়ি উদরের দুই সারি উপাঙ্গের মধ্যে ডিম বহন করিয়া বেড়ায়। ডিম ফুটিয়া শিশু-চিংড়ি বাহির হয়। শিশু-চিংড়ি কয়েকবার **নির্মোচন** (Ecdysis) অর্থাৎ **খোলস ত্যাগ** (Moulting) করিয়া, ক্রমশঃ পূর্ণাঙ্গ চিংড়িতে পরিণত হয়। পূর্ণাঙ্গ চিংড়িও মাঝে মাঝে খোলস বদলায়।

বহিরাকৃতি (External features)

শিরোবক্ষ (Cephalothorax)—

শিরোবক্ষ চিংড়ির দৈর্ঘ্যের একের তিন ভাগেরও কম লম্বা। **মস্তক** বা **শির** (Head) এবং **বক্ষ** (Thorax)—এই দুইটি অংশ জুড়িয়া গিয়া শিরোবক্ষ সৃষ্টি হইয়াছে। শিরোবক্ষ মোট তেরোটি দেহ-খণ্ডক নিয়া গঠিত। প্রথম পাঁচটি দেহ-খণ্ডক মস্তক সৃষ্টি করিয়াছে এবং পরের আটটি দেহ-খণ্ডক মিলিয়া বক্ষ সৃষ্টি হইয়াছে।

শিরোবক্ষের পৃষ্ঠ- এবং পার্শ্বদেশ ঘিরিয়া কৃত্তিক-নির্মিত পুরু **শিরোবর্ম** (Dorsal shield) থাকে। অনেকে ইহাকে **কৃত্তিকাবর্ম** বা **ক্যারাপেস** (Carapace) বলেন। শিরোবক্ষের অঙ্কদেশেও কৃত্তিক-নির্মিত আবরণ থাকে। শিরোবর্মের অগ্রভাগ সরু, লম্বা, দুই পাশে চাপা এবং ঊর্ধ্বমুখী। এই

অংশকে **রোস্‌ট্রাম** (Rostrum) বলে। রোস্‌ট্রামের উপরের কিনারায় বারো হইতে পনেরোটি এবং নিচের কিনারায় দশ হইতে চৌদ্দটি দাঁত থাকে। দাঁতগুলি কতকটা করাতের দাঁতের মতো সাজানো থাকে।

রোস্‌ট্রামের গোড়ার দিকে প্রতি পাশে পর পর দুইটি **কণ্টক** (Spines) থাকে। সামনের কণ্টককে **শুঙ্গ-কণ্টক** (Antennal spines) এবং অন্যটিকে **যকৃৎ-কণ্টক** (Hepatic spines) বলা হয়।

শিরোবর্মের অঙ্কভাগ **ব্রাঙ্কিওস্টিগাইট** (Branchiostigite) নামে পরিচিত। এই অংশ চিংড়ির ফুলকাগুলিকে রক্ষা করে।

শিরোবক্ষকে রক্ষা করা শিরোবর্মের সাধারণ কাজ। রোস্‌ট্রাম ও কণ্টকগুলি চিংড়ির আত্মরক্ষা ও শত্রু-দমনের অঙ্গ।

রোস্‌ট্রামের উৎপত্তি[illegible]র দুই পাশে দুইটি **সবৃন্তক পুঞ্জাক্ষি** (Stalked compound eyes) থাকে। বৃন্তের সাহায্যে চিংড়ি পুঞ্জাক্ষি দুইটিকে এদিক-ওদিক ঘুরাইতে পারে। এই দুইটি চিংড়ির দর্শনেন্দ্রিয়।

শিরোবক্ষের অঙ্কদেশের অগ্র-অংশে, কতকটা আড়াআড়িভাবে **মুখ** (Mouth) অবস্থিত। মুখের সামনের দিকে একটি চার-কোণা **ঊর্ধ্বোষ্ঠ** বা **লেব্রাম** (Labrum) এবং পিছনের দিকে একটি দ্বিখণ্ডিত **নিম্নোষ্ঠ** বা **লেবিয়াম** (Labium) থাকে। চিংড়ি মুখ দিয়া খাদ্য গ্রহণ করে।

শিরোবক্ষের উপাঙ্গ (Cephalothoracic appendages)—

চিংড়ির উপাঙ্গগুলির মধ্যে আপাতঃ-বৈষম্য থাকিলেও, উহাদের সকলের গঠনের ভিত্তি মূলতঃ এক। চিংড়ির **আদর্শ উপাঙ্গ**(Typical appendage)-কে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায় :—(ক) দেহ-সংলগ্ন দণ্ডের মতো **প্রোটোপোডাইট** (Protopodite) নামক অংশ এবং প্রোটোপোডাইটের শেষভাগে পাশাপাশি অবস্থিত অপর দুইটি অংশ। শেষোক্ত অংশ দুইটির মধ্যে যেটি স্বাভাবিক অবস্থায় দেহের নিকটের দিকে থাকে, তাহাকে (খ) **এণ্ডোপোডাইট** (Endopodite) এবং অপর যে অংশটি স্বভাবতঃ দেহ হইতে দূরে থাকে, তাহাকে (গ) **এক্সোপোডাইট** (Exopodite) বলা হয়। প্রথমোক্ত অংশটির উপর শেষোক্ত অংশ দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি শাখার মতো যুক্ত থাকে। সেইজন্য, এইরকম উপাঙ্গকে **দ্বিশাখ উপাঙ্গ** (Biramous appendage) বলা হয়। প্রোটোপোডাইট আবার দুইটি

খণ্ড দিয়া গঠিত—দেহের সঙ্গে যুক্ত **কক্সোপোডাইট** (Coxopodite) বা কক্সা (Coxa) এবং **বেসিপোডাইট** (Basipodite) বা বেসিস (Basis)। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন উপাঙ্গের অংশগুলি নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। সেইজন্য, অনেক সময় ইহাদের দ্বিশাখ রূপ সহজে ধরা পড়ে না।

শিরোবক্ষের তেরোটি দেহ-খণ্ডকে মোট তেরো জোড়া উপাঙ্গ, দেহের অঙ্কদেশের দুই পাশে সাজানো থাকে। প্রথম পাঁচ জোড়া **শির-উপাঙ্গ** (Cephalic appendages), পরের আট জোড়া **বক্ষ-উপাঙ্গ** (Thoracic appendages)। নিচে ইহাদের গঠন ও কাজ ক্রমানুসারে বর্ণনা করা হইল।

শির-উপাঙ্গ (Cephalic appendages)

(১) **প্রথম শুঙ্গ, প্রথম অ্যান্টেনা** (First Antennae), **শুঙ্গক** বা **অ্যান্টিনিউল** (Antennules)—পুঞ্জাক্ষির বৃন্তের নিকটে অবস্থিত দেহের প্রথম জোড়া উপাঙ্গ। ইহাদের প্রত্যেকটির প্রোটোপোডাইট ক্রমানুসারে প্রি-কক্সা (Precoxa), কক্সা এবং বেসিস নামক তিনটি খণ্ড দিয়া গঠিত। স্বাভাবিক অবস্থায় পুঞ্জাক্ষি প্রি-কক্সার একটি অবতল অংশে থাকে। চিংড়ির ভারসাম্য রক্ষার অঙ্গ (Organ of balance) স্ট্যাটোসিস্ট (Statocyst) এই খণ্ডে থাকে এবং উহার ছিদ্র ঐ নিচু অংশে অবস্থিত। বেসিস হইতে বহু-গাঁইটযুক্ত দুইটি শুঙ্গ (Flagella) বাহির হয়; উহাদের মধ্যে বাহিরেরটি আবার দুইটি অসমান ভাগে বিভক্ত হওয়ায়, মোট তিনটি শুঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। বড় শুঙ্গ দুইটি চিংড়ির স্পর্শেন্দ্রিয় এবং ছোট শুঙ্গটি ইহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাজ করে।
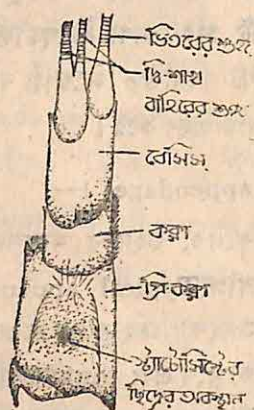
১৫৯নং চিত্র—চিংড়ির প্রথম অ্যান্টেনা।

(২) **দ্বিতীয় শুঙ্গ, দ্বিতীয় অ্যান্টেনা** (Second Antennae), **শুঙ্গ** বা **অ্যান্টেনা** (Antennae)—আগের উপাঙ্গের ঠিক পিছনে অবস্থিত। ইহাদের প্রোটোপোডাইট অংশ নিয়মানুযায়ী কক্সা এবং বেসিস দিয়া গঠিত।

এই অংশের মধ্যে চিংড়ির রেচন-অঙ্গ (Excretory organs) থাকে এবং কক্সায় ছোট রেচন-ছিদ্র (Excretory opening) অবস্থিত। রেচন-ছিদ্রের মাধ্যমে দেহ হইতে রেচন-পদার্থ বাহির হয়। ইহার এক্সোপোডাইট দেখিতে আঁইশের মতো, স্কুয়ামা (Squama) নামে পরিচিত এবং সম্ভবতঃ সাঁতারে ভারসাম্য রক্ষা করিতে সাহায্য করে। এক্সোপোডাইটটি শুঙ্গ সৃষ্টি করে। শুঙ্গ স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।
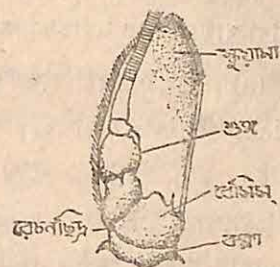
১৬০নং চিত্র—চিংড়ির দ্বিতীয় অ্যান্টেনা।

(৩) **চোয়াল বা ম্যাণ্ডিব্‌ল** (Mandibles)—মুখের দুই পাশে অবস্থিত খুব শক্ত এক জোড়া উপাঙ্গ। প্রোটোপোডাইটের কক্সা খণ্ড দিয়া প্রত্যেকটি চোয়ালের প্রধান অংশ সৃষ্টি হইয়াছে। চামচের মতো আকার-বিশিষ্ট **অ্যাপোফাইসিস** (Apophysis) নামক প্রথম অংশ এবং **মস্তক** (Head) নামক অপর অংশ নিয়া কক্সা গঠিত। মস্তক আবার **কুন্তক উপাঙ্গ** (Incisor process) এবং **পেষক উপাঙ্গ** (Molar process) নামক দুইটি অংশে বিভক্ত। কুন্তক উপাঙ্গ অ্যাপোফাইসিসের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত এবং পাঁচ-ছয়টি হলুদ অথবা বাদামী রঙের দাঁত-যুক্ত। মস্তকের বাহিরের দিক হইতে তিনখণ্ড-সমন্বিত এবং বহু সিটা-যুক্ত একটি **ম্যাণ্ডিবুলার পাল্প্‌** (Mandibular palp) বাহির হয়। ম্যাণ্ডিবুলার পাল্পের প্রথম খণ্ডটি প্রোটোপোডাইটের বেসিস অংশ, এবং বাকি খণ্ড দুইটি এণ্ডোপোডাইট সৃষ্টি করিয়াছে। এই উপাঙ্গে এক্সোপোডাইট নাই।
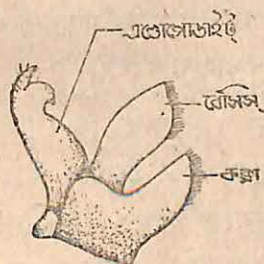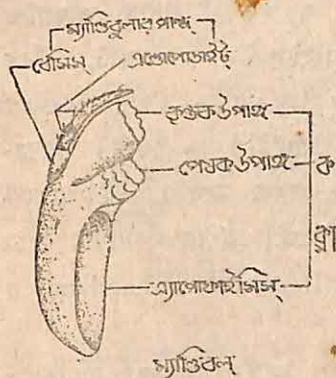
১৬১নং চিত্র—চিংড়ির ম্যাণ্ডিব্‌ল ও প্রথম ম্যাক্সিলা।

খাদ্যবস্তু খণ্ডিত করা অথবা পেষণ করা চোয়ালের প্রধান কাজ হইলেও, ইহারা খাদ্যগ্রহণেও সহায়তা করে।

(৪) **প্রথম ম্যাক্সিলা** (First Maxillae) বা **ম্যাক্সিলুলা** (Maxillulae)—লেবিয়ামের পিছনে অবস্থিত এবং চিংড়ির উপাঙ্গগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ইহা আঁইশের মতো তিনটি পাতলা অংশ দিয়া গঠিত। ইহাদের প্রোটোপোডাইটের কক্সা ও বেসিস অংশ ভিতরের দিকে অবস্থিত। ইহাদের কিনারায় অসংখ্য কণ্টক ও সিটা থাকে। এণ্ডোপোডাইট বাঁকা, বেসিসের বাহিরের দিক হইতে উৎপন্ন ও অগ্রভাগে দ্বিধা-বিভক্ত ; এক্সোপোডাইট নাই।

প্রথম ম্যাক্সিলা খাদ্যকে মুখে প্রবেশ করাইতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, ইহারা খাদ্যকে টুকরা করিতেও পারে।

(৫) **দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা** (Second Maxillae) বা **ম্যাক্সিলা** (Maxillae)—প্রথম ম্যাক্সিলা দুইটির পিছনে অবস্থিত এই উপাঙ্গ জোড়াটিও আঁইশের মতো পাতলা। ইহার প্রোটোপোডাইটের কক্সা খুব ছোট, বেসিস অপেক্ষাকৃত বড়। বেসিস দেহের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে ; ইহার শেষ-অংশ দুই ভাগে বিভক্ত এবং সিটা-যুক্ত। এণ্ডোপোডাইট-ও খুব ছোট। এক্সোপোডাইট বেশ বড় এবং দেখিতে কতকটা হাত-পাখার মতো। এই অংশকে **স্ক্যাফোগ্‌নাথাইট** (Scaphognathite) বলে। ইহার কিনারায় সিটা থাকে এবং ইহা অংশতঃ চিংড়ির শ্বাস-প্রকোষ্ঠ(Respiratory chamber)-এর মধ্যে থাকে।

বেসিস খাদ্য কাটা-ছেঁড়ার কাজে সাহায্য করে। স্ক্যাফোগ্‌নাথাইটের অবিরাম স্পন্দনের ফলে সৃষ্ট জলস্রোত চিংড়ির শ্বাস-প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বাহির হইয়া যায়। কাজেই, ইহা শ্বসনে সাহায্য করে।

বক্ষ-উপাঙ্গ (Thoracic appendages)—

বক্ষের আট জোড়া উপাঙ্গের প্রথম তিন জোড়া কতকটা চোয়াল আবার কতকটা পদের মতো কাজ করে বলিয়া, ইহাদের **ম্যাক্সিলিপেড** (Maxillipedes) বা **পদস্থিত চোয়াল** (Foot-jaws) বলা হয়। শেষ পাঁচ জোড়া বক্ষ-উপাঙ্গের সাহায্যে চিংড়ি হাঁটে বলিয়া, উহাদের **চলিবার উপাঙ্গ** (Walking legs) বলা হয়।

(৬) **প্রথম ম্যাক্সিলিপেড** (First Maxillipedes)—ইহারা ম্যাক্সিলিপেডদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ইহার প্রোটোপোডাইট অংশ পাতার মতো

চ্যাপ্টা এবং দেহের দিকে ঘুরানো। কক্সা এবং বেসিসের কিনারায় অনেকগুলি ছোট সুচালো কণ্টক থাকে। কক্সার বাহিরের দিকে **এপিপোডাইট (Epipodite)** নামক দ্বি-খণ্ডিত পাতার মতো একটি অংশ থাকে। এণ্ডোপোডাইট ছোট এবং সরু। এক্সোপোডাইটের প্রথম অংশ ফলকাকার, শেষ অংশ সরু এবং লম্বা।

প্রোটোপোডাইট খাদ্য কাটা-ছেঁড়ায়, এপিপোডাইট শ্বসনে এবং এক্সোপোডাইট মুখ হইতে বর্জিত খাদ্যাংশ দূরীকরণে সাহায্য করে।

(৭) **দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড (Second Maxillipedes)**—এই উপাঙ্গ জোড়াটি প্রথম ম্যাক্সিলিপেডের তুলনায় কম চ্যাপ্টা। ইহার কক্সার
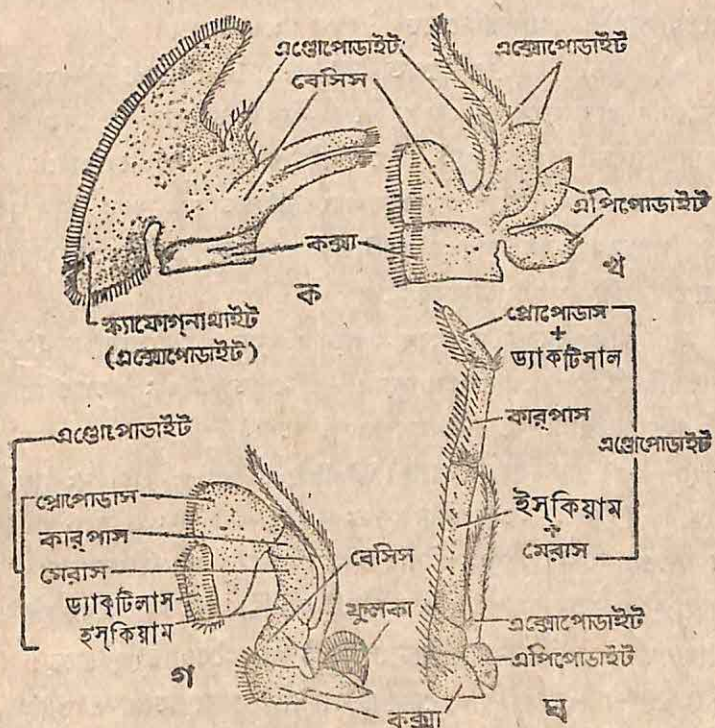
১৬২নং চিত্র—চিংড়ির শিরোবক্ষের কয়েকটি উপাঙ্গ: ক. দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা, খ. প্রথম ম্যাক্সিলিপেড, গ. দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড, ঘ. তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড।

বাহিরের দিকে একটি ছোট এপিপোডাইট এবং একটি **ফুলকা (Gill)** লাগানো থাকে। এণ্ডোপোডাইট পাঁচটি **পদখণ্ড** বা **পোডোমিয়ার (Podomeres)** দিয়া গঠিত; যথা—**ইস্‌কিওপোডাইট (Ischiopodite)**

বা ইস্কিয়াম (Ischium), মেরোপোডাইট (Meropodite) বা মেরাস (Merus), কার্পোপোডাইট (Carpopodite) বা কার্পাস (Carpus), প্রোপোডাইট (Propodite) বা প্রোপোডাস (Propodus) এবং ড্যাক্টিলোপোডাইট (Dactylopodite) বা ড্যাক্টিলাস (Dactylus)। ইহাদের মধ্যে শেষ দুইটি পদখণ্ড বাঁকিয়া প্রথম তিনটি পদখণ্ডের পাশে চলিয়া আসে। প্রোপোডাসের মধ্যভাগে ড্যাক্টিলাস থাকে এবং ড্যাক্টিলাসের চারধারে তীক্ষ্ণ কণ্টক থাকায়, এই অংশে একটি কর্তন-ফলক (Cutting plate) সৃষ্টি হইয়াছে। এক্সোপোডাইট চাবুকের মতো লম্বা এবং শেষভাগে সিটা-যুক্ত।

কর্তন-ফলক খাদ্যকে চোয়ালের মস্তকের কাছে নিয়া যায়। অন্যান্য অংশের কাজ প্রথম ম্যাক্সিলিপেডের ঐরকম অংশের মতো।

(৮) **তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড (Third Maxillipedes)**—ম্যাক্সিলিপেডদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং দেখিতে কতকটা চলিবার উপাঙ্গের মতো। কক্সার বাহিরের দিকে একটি এপিপোডাইট থাকে। এণ্ডোপোডাইটে তিনটি পদখণ্ড থাকে ; ইস্কিয়াম ও মেরাস এবং প্রোপোডাস ও ড্যাক্টিলাস জুড়িয়া গিয়া যথাক্রমে প্রথম ও শেষ খণ্ডটি সৃষ্টি হইয়াছে, মধ্যের খণ্ডটি কার্পাস। এক্সোপোডাইট কতকটা চাবুকের মতো।

ভারী খাদ্য মুখের মধ্যে প্রবেশ করানোর সময়, এণ্ডোপোডাইট সাঁড়াশির মতো চলিবার উপাঙ্গকে সাহায্য করে। এপিপোডাইট এবং এক্সোপোডাইটের কাজ অন্য ম্যাক্সিলিপেডদের ঐরকম অংশের মতো।

(৯—১৩) **চলিবার উপাঙ্গ (Walking legs)**—ইহারা সংখ্যায় পাঁচ জোড়া। ইহাদের সকলের গঠন মূলতঃ একইরকমের এবং দেখিতে মোটামুটি লম্বা দণ্ডের মতো। চতুর্থ চলিবার উপাঙ্গকে আদর্শ বলা যাইতে পারে। এই উপাঙ্গ একই কক্ষে পর পর সজ্জিত সাতটি খণ্ড নিয়া গঠিত। প্রথম দুইটি খণ্ড অর্থাৎ কক্সা ও বেসিস নিয়া প্রোটোপোডাইট অংশ তৈয়ারি হইয়াছে। শেষ পাঁচটি খণ্ড অর্থাৎ ইস্কিয়াম, মেরাস, কার্পাস, প্রোপোডাস ও ড্যাক্টিলাস নিয়া এণ্ডোপোডাইট গঠিত। শেষ পদখণ্ড অর্থাৎ ড্যাক্টিলাসের শেষে নখর থাকে। এক্সোপোডাইট থাকে না।

প্রথম চলিবার উপাঙ্গের শেষ পদখণ্ড (অর্থাৎ ড্যাক্টিলাস) প্রোপোডাসের শেষ প্রান্তে যুক্ত না হইয়া, পাশে থাকে। ফলে, ইহার শেষভাগ বাঁকিয়া গিয়া সাঁড়াশির মতো দেখিতে হয়। ইহাকে কিলা (Chela) বলে। সাঁড়াশি

অংশের ভিতরের কিনারা দুইটিতে কয়েকটি করিয়া দাঁত, এবং গায়ে অসংখ্য সিটা থাকে। সাঁড়াশির সাহায্যে ইহারা খাদ্য-সংগ্রহ, আত্মরক্ষা ও শত্রু-দমনের কাজ করে।
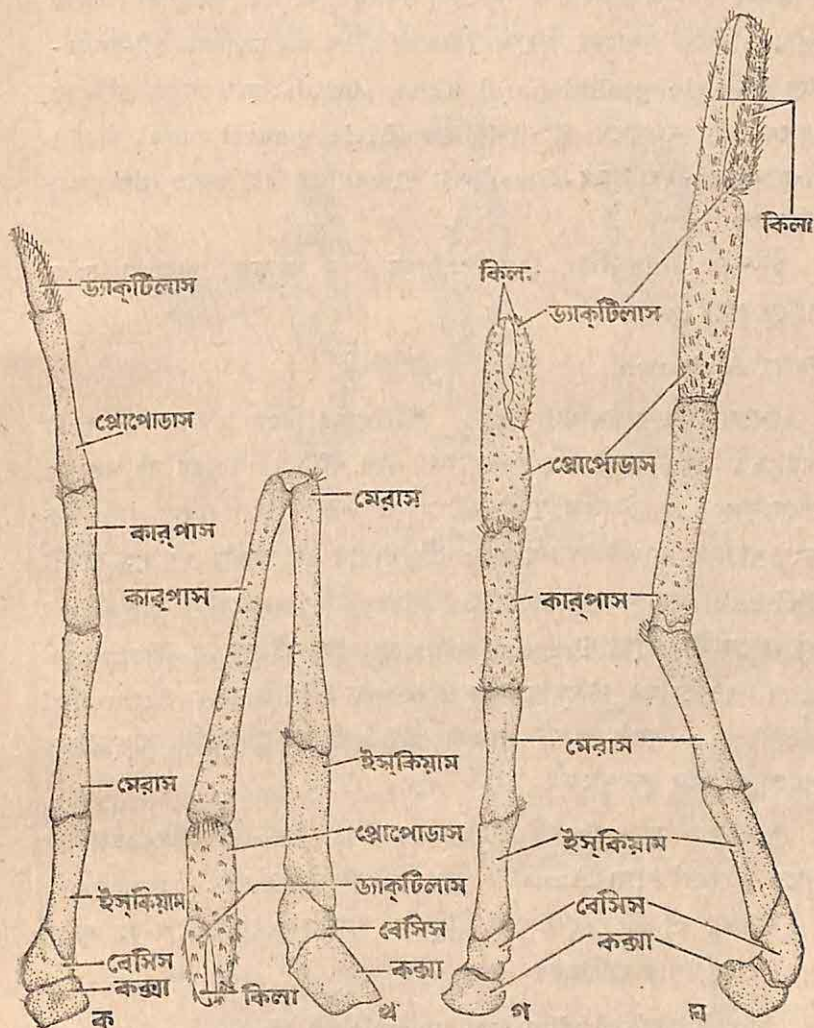
১৬৩নং চিত্র—চিংড়ির কয়েকটি চলিবার উপাঙ্গ : ক. চতুর্থ, খ. প্রথম, গ. দ্বিতীয় (স্ত্রী), ঘ. দ্বিতীয় (পুং)।

দ্বিতীয় চলিবার উপাঙ্গ প্রথমটিরই মতো; তবে অনেক বড় এবং বেশি শক্তিশালী। ইহার ইস্‌কিয়াম অংশে খাঁজ থাকে। সমবয়সী স্ত্রী-চিংড়ির

তুলনায় পুরুষ-চিংড়ির দ্বিতীয় চলিবার উপাঙ্গ বেশি উজ্জ্বল রঙের, সাঁড়াশি অংশ বেশি সংখ্যক সিটা ও কণ্টক দিয়া আবৃত এবং আকারে বড়। ইহার কাজ প্রথম চলিবার উপাঙ্গের মতো।

তৃতীয় ও পঞ্চম চলিবার উপাঙ্গ চতুর্থ উপাঙ্গের মতো। তবে স্ত্রী-চিংড়ির তৃতীয় চলিবার উপাঙ্গের কক্সার ভিতরের দিকে অর্ধ-চন্দ্রাকার **স্ত্রী-জননছিদ্র** (Female genital pore) থাকে। পুরুষ-চিংড়িতে পঞ্চম চলিবার উপাঙ্গের ঐরকম অংশে **পুং-জননছিদ্র** (Male genital pore) থাকে। স্ত্রী-জননছিদ্র দিয়া "ডিম্ব (Eggs)" এবং পুং-জননছিদ্র দিয়া শুক্রাণু (Sperms) বাহির হয়।

চলিবার উপাঙ্গগুলির, বিশেষতঃ শেষ তিন জোড়ার, সাহায্যে চিংড়ি হাঁটিতে পারে।

উদর (Abdomen)

শিরোবক্ষের পরের অংশ উদর। ইহা শেষের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। মোট ছয়টি দেহ-খণ্ডক নিয়া উদর গঠিত। উদরের ষষ্ঠ খণ্ডকের শেষে **পুচ্ছক** বা **টেল্‌সন** (Telson) নামক একটি ত্রিকোণাকার অতিরিক্ত অংশ থাকে। প্রতিটি উদর-খণ্ডকের পৃষ্ঠ্য, পার্শ্বীয় এবং অঙ্কীয় দেশ **স্ক্লেরাইট** (Sclerite) নামক কৃত্তিক-নির্মিত আবরণ দিয়া আবৃত। স্ক্লেরাইটের পৃষ্ঠভাগকে **টার্‌গাম** (Tergum) এবং অঙ্কভাগকে **স্টার্‌নাম** (Sternum) বলে। স্ত্রী-চিংড়ির স্টার্‌নাম অপেক্ষাকৃত বড়। সন্ধি-পর্দা (Arthrodial membrane) নামে একটি পাতলা পর্দা দিয়া স্ক্লেরাইটগুলি আল্‌গাভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

পুচ্ছকের অঙ্কদেশে একটি উঁচু জায়গার উপর একটি লম্বালম্বি-চেরা ছিদ্র থাকে। ইহাই **পায়ু** (Anus)। পায়ু দিয়া মল নির্গত হয়।

উদরের প্রতিটি দেহ-খণ্ডকের টার্‌গাম ও স্টার্‌নামের সংযোগ-স্থল হইতে এক জোড়া উপাঙ্গ বাহির হয়।

উদর-উপাঙ্গ (Abdominal appendages)—

চতুর্দশ হইতে উনবিংশ—এই ছয় জোড়া উপাঙ্গ চিংড়ির উদরে অবস্থিত। ইহাদের সাহায্যে চিংড়ি সাঁতার দেয় বলিয়া, ইহাদের **সন্তরণী** (Swimerets) বলা হয়। ইহারা **প্লিওপড** (Pleopods) নামেও পরিচিত। তৃতীয় উদর-উপাঙ্গ অর্থাৎ দেহের ষোড়শ উপাঙ্গ জোড়াকে চিংড়ির আদর্শ উদর-উপাঙ্গ

বলা যাইতে পারে। ইহার প্রোটোপোডাইটের কক্সাটি ছোট, কিন্তু বেসিস অপেক্ষাকৃত লম্বা। বেসিসের শেষে, কিনারায় সিটা-যুক্ত পত্রাকার এণ্ডোপোডাইট ও এক্সোপোডাইট অবস্থিত। এণ্ডোপোডাইট এক্সোপোডাইটের চেয়ে ছোট। এণ্ডোপোডাইটের ভিতরের দিকে একটি ছোট বাঁকা কাঠির মতো অংশ থাকে। ইহাকে **অ্যাপেন্‌ডিক্স্‌ ইন্‌টার্‌না** (**Appendix interna**) বলে।
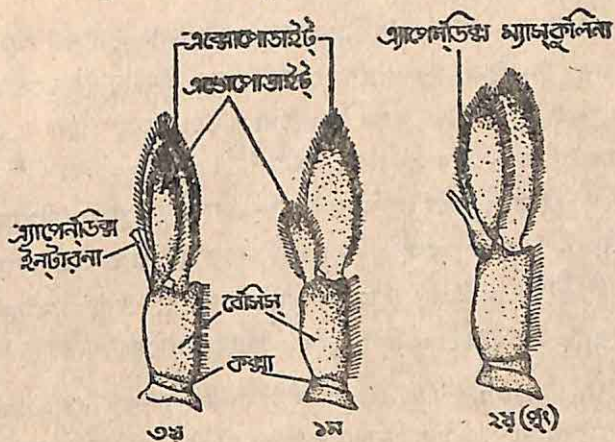
১৬৪নং চিত্র—চিংড়ির কয়েকটি উদর-উপাঙ্গ।

অন্যান্য উদর-উপাঙ্গ তৃতীয় উদর-উপাঙ্গেরই মতো। তবে প্রথম উদর-উপাঙ্গের এণ্ডোপোডাইট খুব ছোট এবং ইহাতে অ্যাপেন্‌ডিক্স্‌ ইন্‌টার্‌না থাকে না। পুরুষ-চিংড়ির দ্বিতীয় উদর উপাঙ্গে অ্যাপেন্‌ডিক্স্‌ ইন্‌টার্‌নার ভিতরের দিকে **অ্যাপেন্‌ডিক্স্‌ ম্যাসকুলিনা** (**Appendix masculina**) নামক আরও একটি সিটা-যুক্ত কাঠির মতো অংশ থাকে। স্ত্রী-চিংড়ির ঐ উপাঙ্গে এইরকম অংশ থাকে না।

চতুর্থ ও পঞ্চম উদর-উপাঙ্গগুলি তৃতীয় উদর-উপাঙ্গেরই মতো।

১৬৫নং চিত্র—চিংড়ির ষষ্ঠ উদর-উপাঙ্গ (পুচ্ছ-পদ)।

ষষ্ঠ উদর-উপাঙ্গ জোড়া বড় এবং বিচিত্র। ইহাদের প্রোটোপোডাইটের কক্সা ও বেসিস জুড়িয়া গিয়া ত্রিকোণাকার পদখণ্ড তৈয়ারি করে। এণ্ডোপোডাইট ও এক্সোপোডাইট অন্যান্য উদর-

উপাঙ্গের তুলনায় শেষ বড়। এক্সোপোডাইটের মাঝ-বরাবর আড়াআড়িভাবে একটি দাগ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই উপাঙ্গ দুইটি পুচ্ছকের দুই পাশে থাকে। ইহারা পুচ্ছকের সঙ্গে মিলিয়া একটি **পুচ্ছ-পাখ্না (Tail-fin)** তৈয়ারি করে। সেইজন্য, ইহাদের **পুচ্ছ-পদ** বা **ইউরোপড (Uropods)** বলা হয়।

প্রজনকালে, স্ত্রী-চিংড়িতে দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম উদর-উপাঙ্গের এক পাশের অ্যাপেন্‌ডিক্স্ ইন্‌টার্‌না অন্য পাশের অ্যাপেন্‌ডিক্স্ ইন্‌টার্‌নার সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে, দেহ এবং উপাঙ্গগুলির মধ্যে যে জায়গা পড়িয়া থাকে, তাহার মধ্যে ইহারা ডিমগুলিকে রাখিয়া, বহিয়া বেড়ায়। অ্যাপেন্‌ডিক্স্ ম্যাস্‌কুলিনা পুরুষ-চিংড়ির যৌন-সঙ্গমে সহায়তা করে। সমস্ত উদর-উপাঙ্গের সাহায্যে চিংড়ি সাঁতার দেয়। সাঁতার দিবার সময় পুচ্ছ-পদ দুইটি কতকটা হালের মতো কাজ করে। হঠাৎ জরুরী প্রয়োজনে চিংড়ি পুচ্ছ-পাখ্নার সাহায্যে দেহকে ঝাঁকুনি দিয়া খুব তাড়াতাড়ি পিছন দিকে বেশ কিছুদূর লাফাইতে পারে।

পুচ্ছক (Telson)—ইহা বস্তুতঃপক্ষে চিংড়ির দেহের উনিশটি দেহ-খণ্ডক ছাড়া অতিরিক্ত অংশ এবং ষষ্ঠ উদর-খণ্ডকের সঙ্গে আল্‌গাভাবে যুক্ত। ইহার শেষভাগে দুইটি কণ্টক থাকে।

স্ত্রী- ও পুরুষ-চিংড়ির বহিরাকৃতিগত পার্থক্য (External differences between male and female prawn)

(১) পুরুষ-চিংড়ি সমবয়সী স্ত্রী-চিংড়ির চেয়ে আকারে বড়।

(২) পুরুষ-চিংড়ির দ্বিতীয় চলিবার উপাঙ্গ সমবয়সী স্ত্রী-চিংড়ির চেয়ে অনেক বড়, উজ্জ্বল রঙের এবং উহার সাঁড়াশি অংশে অনেক বেশি সিটা ও কণ্টক থাকে।

(৩) পুরুষ-চিংড়ির জননছিদ্র পঞ্চম চলিবার উপাঙ্গের কক্সায় থাকে। স্ত্রী-চিংড়ির জননছিদ্র থাকে তৃতীয় চলিবার উপাঙ্গের কক্সায়।

(৪) পুরুষ-চিংড়ির তুলনায় স্ত্রী-চিংড়ির উদরের স্টার্‌নামগুলি বড়।

(৫) পুরুষ-চিংড়ির দ্বিতীয় উদর-উপাঙ্গে অ্যাপেন্‌ডিক্স্ ম্যাসকুলিনা থাকে, কিন্তু স্ত্রী-চিংড়িতে থাকে না।*

---

* বহিরাকৃতি হইতে স্ত্রী- ও পুরুষ-চিংড়ি নির্ভুলভাবে চেনার খুব সহজ উপায় দ্বিতীয় উদর-উপাঙ্গ পরীক্ষা করা। যদি উহার প্রোটোপোডাইটের শেষে মোট চারটি (এক্সোপোডাইট, এণ্ডোপোডাইট, অ্যাপেন্‌ডিক্স্ ইন্‌টার্‌না এবং অ্যাপেন্‌ডিক্স্ ম্যাস্‌কুলিনা) অংশ থাকে, তবে উহা পুরুষ-চিংড়ি ; তিনটি অংশ থাকিলে, উহা স্ত্রী-চিংড়ি।

চিংড়ির গুরুত্ব (Importance of Prawn)

চিংড়ির মাংসে প্রচুর পরিমাণে প্রোটীন ও চুন-জাতীয় খাদ্য থাকায়, অধিকাংশ দেশে ইহাকে পুষ্টিকর খাদ্যরূপে গণ্য করা হয়। সন্ধিপদ পর্বের কবচী শ্রেণী(Class Crustacea)-র প্রাণীদের প্রতিভূ হিসাবে, পরীক্ষাগারে চিংড়ি ব্যবচ্ছেদ করা হয়।

অস্থিময় মৎস্য—রুই
(A common bony fish—Rohu)

স্বভাব ও বসতি (Habit and Habitat)

রুই মাছ মিঠা জলের বাসিন্দা। স্রোতযুক্ত মিঠা জলের নদীই ইহাদের স্বাভাবিক বসতি। তবে পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ের বদ্ধ জলেও ইহারা থাকিতে পারে, কিন্তু বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে না। কাজেই, রুই মাছের চাষের জন্য পুকুর ইত্যাদিতে "বাচ্চা" ছাড়িতে হয়।

খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ (Food and Feeding)

রুই মাছ অধিকাংশ সময়ে জলাশয়ের তলদেশে খাদ্য-সংগ্রহে লিপ্ত থাকে। পূর্ণাঙ্গ রুই মূলতঃ শাকাশী। বিভিন্ন রকমের শেওলা, পচা পাতা ইত্যাদি ইহাদের প্রধান খাদ্য। অবশ্য, মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ জীবনের প্রথমভাগে, ইহারা এককোষী প্রাণী, অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণী, পতঙ্গের জলজ শূককীট (Larva) ইত্যাদি খাইয়া থাকে। মাংসল উর্ধ্বোষ্ঠ ও নিম্নোষ্ঠ এবং গুম্ফ (Barbels) ইহাদের খাদ্য-নির্বাচনে সাহায্য করে।

গমন (Locomotion)

রুই মাছ জলে সাঁতার কাটিয়া এক স্থান লইতে অন্য স্থানে চলাফেরা করে। জরুরী প্রয়োজনে, ইহারা হঠাৎ লাফ দিয়া জল ছাড়িয়া বেশ কিছুদূর যাইতে পারে। সাঁতার কাটার সময় দেহকে, বিশেষ করিয়া লেজ-অংশকে, পর্যায়ক্রমে ডানদিকে ও বাঁদিকে সঞ্চালিত করে। ফলে, দুই পাশের জল মাছের পিছনে চলিয়া যায় এবং মাছ আগাইয়া চলে। অগ্রগমনে পুচ্ছ-পাখ্না, পায়ু-পাখ্না এবং পৃষ্ঠ-পাখ্না গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। দুই জোড়া যুগ্ম পাখ্না মাছকে জলের মধ্যে উপরে-নীচে উঠা-নামা, কোনও নির্দিষ্ট গভীরতায় চলা, অথবা কোনও স্থানে স্থির হইয়া ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে। ইহারা মাছকে লাফ দিতেও সাহায্য করে।

জনন (Reproduction)

বর্ষার শুরুতে, খরস্রোতা নদীর কিনারার দিকের অগভীর জলে, রুই মাছ ডিম পাড়ে। জলেই ডিম নিষিক্ত (Fertilised) হয়। নিষিক্ত ডিম হইতে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া রুই মাছ পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌছায়।

বহিরাকৃতি (External features)

রুই মাছের দেহ, বিশেষতঃ পাখ্‌নাগুলি, লাল্‌চে রঙের। পিঠের দিক এবং মস্তকের অগ্রভাগ কতকটা কাল্‌চে। পেটের দিকে রঙ অনেকটা হাল্‌কা।

রুই মাছের দেহ দুই পাশে চাপা। দেহের মধ্যভাগের প্রস্থ ও উচ্চতা মস্তক ও লেজের চেয়ে বেশি। দেহের আকার এইরকম হওয়ায়, ইহারা খুব সহজে জলের বাধা অতিক্রম করিয়া চলাফেরা করিতে পারে।

রুই মাছের মস্তক এবং পাখ্‌নাগুলি ছাড়া, দেহের অন্যান্য অংশ আঁইশ দিয়া আবৃত। আঁইশগুলি সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। কোনও সারির আঁইশ উহার পিছনের সারির আঁইশগুলির অগ্রভাগকে কিছুটা ঢাকিয়া রাখে। রুই

১৬৬নং চিত্র—উপ-চক্রাকার আঁইশ।

মাছের আঁইশের কিনারা মসৃণ (কারণ, কিনারায় কণ্টক থাকে না) এবং ইহাতে কয়েকটি বৃত্তাকার দাগ দেখা যায়। এই ধরনের আঁইশকে **উপ-চক্রাকার আঁইশ** (Cycloid scale) বলা হয়। আঁইশগুলি মাছের দেহকে রক্ষা করে। আঁইশের উপরে একরকম ঘন পিচ্ছিল লালার আবরণ থাকে। উহাও মাছকে আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য করে।

পার্শ্ব-রেখা (Lateral lines) দুইটি রুই মাছের স্পর্শেন্দ্রিয়। ইহাদের সাহায্যে মাছ জলের মধ্যে উত্থিত তরঙ্গের তীব্রতা ও তারতম্য বুঝিতে পারে। ইহারা ভারসাম্য-রক্ষায়ও সাহায্য করে। পার্শ্ব-রেখা-বরাবর অবস্থিত আঁইশ-গুলিতে ছিদ্র থাকে।

মস্তক(Head)-এর অগ্রভাগে কিছুটা অঙ্কদেশ ঘেঁষিয়া আড়াআড়িভাবে **মুখ** (Mouth) অবস্থিত। মুখের উপরে এবং নিচে যথাক্রমে **ঊর্ধ্বোষ্ঠ** (Upper lip) এবং **নিম্নোষ্ঠ** (Lower lip) থাকে। ওষ্ঠ দুইটি মাংসল এবং সুবেদী (Sensitive)। ঊর্ধ্বোষ্ঠ ও নিম্নোষ্ঠের সংযোগ-স্থলে, মুখের দুই পাশে দুইটি ছোট **গুম্ফ** (Barbels) অবস্থিত। ইহারাও খুব সুবেদী। বলা বাহুল্য, মুখ দিয়া রুই মাছ খাদ্য গ্রহণ করে।

নাসারন্ধ্র (Nostrils) দুইটির সঙ্গে মুখ-বিবরের কোনও যোগ থাকে না। কাজেই, ইহা শ্বসনে সাহায্য করে না। ইহারা মাছের ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

রুই মাছের **চক্ষু** (Eyes) দুইটি গোলাকার। ইহাদের ঊর্ধ্ব-নেত্রপল্লব ও নিম্ন-নেত্রপল্লব থাকে না। তবে **উপপল্লব বা নিকৃটিটেটিং মেমব্রেন** (Nictitating membrane) নামক একটি ঈষদচ্ছ পর্দা চক্ষুকে ঢাকিতে পারে। উপপল্লব বালি ইত্যাদি হইতে চক্ষুকে রক্ষা করে।

চক্ষু দুইটির সাহায্যে মাছ জলের মধ্যে মোটামুটি দেখিতে পায়। চলাফেরার সময় পথ-নির্দেশের জন্য ইহারা চক্ষুর চেয়ে পার্শ্ব-রেখার উপরই বেশি নির্ভর করে।

কান্‌কুয়া (Operculum) দুইটি ফুলকাগুলিকে রক্ষা করে। কান্‌কুয়ার মুক্ত কিনারায় একটি পাতলা পর্দা থাকে। ঐ পর্দাটি মাছের শ্বাস-প্রকোষ্ঠ (Respiratory chamber)-এ জল প্রবেশ ও বহির্গমন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

দেহকাণ্ডের শেষভাগে **পায়ু** (Anus) অবস্থিত। ইহার মধ্য দিয়া মল নির্গত হয়। ইহার নিকটেই **মূত্রছিদ্র** (Urinary aperture) ও **জনন-ছিদ্র** (Genital pore) অবস্থিত। এই দুইটি ছিদ্রের মাধ্যমে যথাক্রমে মূত্র ও জননকোষ বাহির হয়।

রুই মাছের দেহে মোট সাতটি পাখ্‌না আছে। আগের পরিচ্ছেদে (১৯০ পৃষ্ঠায়) ইহাদের অবস্থান ও গঠন বর্ণনা করা হইয়াছে। ২৩৩ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন পাখ্‌নার কাজ আলোচিত হইয়াছে।

রুই মাছের গুরুত্ব (Importance of Rohu fish)

রুই মাছের দেহে চর্বির ভাগ কম এবং প্রোটীনের ভাগ বেশি থাকায়, খাদ্য হিসাবে ইহা পুষ্টিকর এবং সুস্বাদুও বটে। এই কারণে রুই মাছকে মূল্যবান মাছ বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

কুনো ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙ
(Toad and Frog)

কুনো ব্যাঙ (Toad)

স্বভাব ও বসতি (Habit and Habitat)

কুনো ব্যাঙ অন্ধকার ঘরের কোণে, আবর্জনা-স্তূপের নিচে অথবা ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের মধ্যে বাস করে। ইহারা অন্ধকার পছন্দ করে এবং দিনের বেলায়

সাধারণতঃ লুকাইয়া থাকে ; সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকার জায়গা হইতে খাদ্যের সন্ধানে বাহির হয়।

খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ (Food and Feeding)

কুনো ব্যাঙ মাংসাশী প্রাণী। পিঁপড়া ও অন্যান্য ছোট ছোট পতঙ্গ, কেঁচো, ছোট শামুক ইত্যাদি জীবন্ত প্রাণী ইহাদের খাদ্য। নড়াচড়া করে না এমন বস্তুকে কুনো ব্যাঙ খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করে না। কুনো ব্যাঙের অদ্ভুত ধরনের জিহ্বাটি খাদ্য-শিকারের প্রধান অঙ্গ। জিহ্বাটি মাংসল, সঙ্কোচী (Contractile) এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ইহার মুক্ত-প্রান্ত মুখ-বিবরের ভিতরের দিকে থাকে। খাদ্যের সন্ধান পাইলে, কুনো ব্যাঙ ধীরে ধীরে উহার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছায় এবং কিছুক্ষণ ধরিয়া খাদ্যের নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ করে। তাহার পর দেহের অগ্রভাগ কিছুটা নিচু করিয়া, হঠাৎ জিহ্বাটিকে উল্টাইয়া
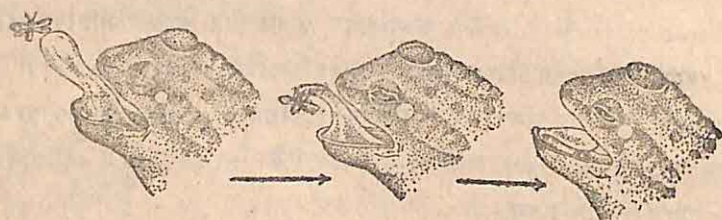
১৬৭নং চিত্র—কুনো ব্যাঙের শিকার ধরার পদ্ধতি।

মুখ-বিবরের বাহিরে আনিয়া ফেলে এবং খাদ্যের উপর চাপাইয়া দেয়। জিহ্বার অগ্রভাগে চট্‌চটে রস থাকায়, খাদ্যটি জিহ্বার সঙ্গে আট্‌কাইয়া যায়। তখন কুনো ব্যাঙ খাদ্যসহ জিহ্বাটিকে তীব্রগতিতে মুখ-বিবরের মধ্যে টানিয়া নেয়। মুখ-বিবরে না পৌঁছাইলে, কোনও বস্তু খাদ্য কি অখাদ্য, তাহা ইহারা ঠিক করিতে পারে না। ইহারা সাধারণতঃ কোনও ছোট বস্তুকে নড়াচড়া করিতে দেখিলে, উহা মুখে প্রবেশ করাইয়া দেয়। অখাদ্য হইলে, উহা আবার বাহির করিয়া দেয়।

গমন (Locomotion)

কুনো ব্যাঙ অলস প্রাণী। খুব প্রয়োজন না হইলে, ইহারা সাধারণতঃ নড়াচড়া করে না। কুনো ব্যাঙ স্থলে লাফাইয়া এবং জলে সাঁতার দিয়া চলাফেরা করে। দুই জোড়া পদ কুনো ব্যাঙের গমন-অঙ্গ (Locomotory organs)। ইহাদের পশ্চাৎ-পদ অগ্রপদের চেয়ে লম্বা, পেশীবহুল এবং বেশি শক্তিশালী। স্বাভাবিক অবস্থায় পশ্চাৎ-পদ দুইটি দেহের অঙ্কভাগে ভাঁজ হইয়া

থাকে। লাফাইবার সময় ইহারা অগ্রপদ দুইটিকে সাময়িকভাবে ভূমি হইতে তুলিয়া নেয় এবং একইসঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি ভাঁজ-করা পশ্চাৎ-পদ দুইটি প্রায় সোজা করিয়া দেয়। ফলে, কুনো ব্যাঙ সামনের দিকে কিছুদূর আগাইয়া যায়। কুনো ব্যাঙের পশ্চাৎ-পদের অঙ্গুলিগুলির গোড়ার দিক কিছুদূর পর্যন্ত পাতলা চামড়া দিয়া পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এইরকম পদকে **লিপ্তপাদ** (Webbed feet) বলা হয়। বস্তুতঃপক্ষে, এই লিপ্তপাদ-ই কুনো ব্যাঙের সন্তরণ-অঙ্গ। সাঁতার কাটার সময় ইহারা পশ্চাৎ-পদ দুইটি জোরে পিছনে ঠেলিয়া দেয়। ফলে, লিপ্তপাদে বাধা পাইয়া কিছু জল পিছন দিকে চলিয়া যায় এবং ব্যাঙের দেহ সামনের দিকে আগাইয়া যায়। অবশ্য, কুনো ব্যাঙ ভালো সাঁতারু নয়।

শীতঘুম (Hibernation)

শীতের সময় ছাড়া, প্রায় সারা বছরই কুনো ব্যাঙকে নিজের বসতির আশেপাশে দেখা যায়। বর্ষাকালে ইহারা খুব সক্রিয় হইয়া উঠে। কুনো ব্যাঙ অনুষ্ণশোণিত (Poikilothermous) প্রাণী বলিয়া, শীতকালে ইহাদের দেহের উষ্ণতা অনেক কমিয়া যায়। তখন ইহাদের পক্ষে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য, শীতের সময় ইহারা মাটির নিচে গর্তে, অথবা ঐরকম কোনও নিরিবিলি স্থানে চুপচাপ কাটাইয়া দেয়। এই সময় ইহারা খাদ্যগ্রহণ করে না। মুখ-বিবরের তলদেশ উঠা-নামা করা ছাড়া ইহাদের দেহের অন্যান্য অংশ নড়াচড়া করে না। দেহে সঞ্চিত চর্বি হইতে ইহারা বাঁচিয়া থাকার মতো শক্তি সংগ্রহ করে এবং চর্ম ও মুখ-বিবরের সাহায্যে শ্বসন সম্পন্ন করে। শীতকালীন এই নিষ্ক্রিয়তাকে **শীতঘুম** বা **হাইবার্নেশান** (Hibernation) বলা হয়। বসন্তকালে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে, ইহারা আবার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা শুরু করে। কুনো ব্যাঙ মাঝে মাঝে **নির্মোচন** (Ecdysis) অর্থাৎ খোলস ত্যাগ করে। ঐ সময়ে চর্মের উপরের আবরণ পরিত্যক্ত হয়।

জনন (Reproduction)

বর্ষাকাল কুনো ব্যাঙের প্রজনকাল (Breeding season)। এই সময়ে ইহারা খুব সক্রিয় হইয়া উঠে এবং পুরুষ-কুনো ব্যাঙ কর্কশ স্বরে ডাকিতে শুরু করে। পুরুষ-কুনো ব্যাঙের স্বরে আকৃষ্ট হইয়া স্ত্রী-কুনো ব্যাঙ উহার নিকটে যায়। পুরুষ-ব্যাঙ তখন স্ত্রী-ব্যাঙের পিঠের উপর চাপিয়া বসে। এই

অবস্থায় স্ত্রী-কুনো ব্যাঙ জলে ডিম পাড়ে। নিষিক্ত ডিম হইতে **ব্যাঙাচি** বা **ট্যাড্‌পোল** (Tadpole) বাহির হয়। ব্যাঙাচির দৈহিক **রূপান্তর** (Metamorphosis) হইয়া পূর্ণাঙ্গ কুনো ব্যাঙ সৃষ্টি হয়।

বহিরাকৃতি (External features)

পরিণত কুনো ব্যাঙের পৃষ্ঠদেশ ছাই রঙের, অঙ্কদেশ হাল্‌কা হলুদ রঙের। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কুনো ব্যাঙের অঙ্কদেশ সাদাটে। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া, ইহাদের গায়ের রঙ অল্প পরিবর্তিত হয়।

গ্রীবা না থাকায়, কুনো ব্যাঙ মস্তকটিকে ঘুরাইতে পারে না। পাশে অথবা পিছনে দেখিতে হইলে, ইহাকে সমগ্র দেহটিকে ঘুরাইতে হয়। পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের লেজ থাকে না।

কুনো ব্যাঙের **মস্তক** (Head) সমবাহু ত্রিভুজের মতো, তবে অগ্রভাগ কিছুটা ভোঁতা এবং প্রায় গোলাকার। মস্তকের দুই পাশ উঁচু, মধ্যভাগ একটু চাপা। **মুখ** (Mouth) খুব বড় এবং চক্ষু পর্যন্ত বিস্তৃত। মুখের উপরে ও নিচে যথাক্রমে **উপরের চোয়াল** (Upper jaw) এবং **নিচের চোয়াল** (Lower jaw) থাকে। উপরের চোয়াল শক্তিশালী ; ইহাতে দাঁত থাকে না এবং ইহা নড়িতে পারে না। নিচের চোয়াল উপর-নিচে নড়িয়া, মুখ বন্ধ করিতে ও খুলিতে পারে। জীবন্ত খাদ্যকে মুখ-বিবরের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে চোয়াল দুইটি ব্যাঙকে সাহায্য করে। **নাসারন্ধ্র** (Nostrils) দুইটি মুখ-বিবরের সঙ্গে যুক্ত থাকায়, ইহারা শ্বসনে সহায়তা করে। তাহা ছাড়া, ইহা ব্যাঙের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

চক্ষু (Eyes) দুইটি বেশ বড় এবং মস্তকের দুই পাশে উঁচু হইয়া থাকে। তিনটি নেত্রপল্লবের উপরেরটি অর্থাৎ **ঊর্ধ্ব-নেত্রপল্লব** (Upper eye-lid) পুরু এবং নড়িতে পারে না। **নিম্ন-নেত্রপল্লব** (Lower eye-lid) অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং উপরে-নিচে উঠা-নামা করিয়া চক্ষু বন্ধ করিতে ও খুলিতে পারে। তৃতীয় **নেত্রপল্লব** বা **উপপল্লব** (Nictitating membrane) ঈষদচ্ছ এবং পাতলা পর্দার মতো। ইহা সামনের দিক হইতে পিছনের দিকে সরিয়া চক্ষুকে বন্ধ করিতে পারে। নেত্রপল্লবগুলির কাজ চক্ষুকে রক্ষা করা। চক্ষু ব্যাঙের দর্শনেন্দ্রিয়।

কর্ণপটহ (Tympanic membrane, Tympanum, Ear drum) দুইটি গোলাকার, মসৃণ এবং অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা রঙের। ইহারা ব্যাঙের

শ্রবণেন্দ্রিয়ের অংশবিশেষ এবং শব্দ-তরঙ্গ সংগ্রহ করিয়া ব্যাঙকে শ্রবণে সাহায্য করে।

প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid glands) বা **প্যারাটয়েড গ্রন্থি** (Paratoid glands) দুইটি ব্যাঙের আত্মরক্ষা ও শত্রু-দমনের প্রধান অঙ্গ। কুনো ব্যাঙ আক্রান্ত অথবা উত্তেজিত হইলে, এই গ্রন্থি হইতে পুঁজের মতো একরকম চটচটে রস বাহির হয়। এই রস ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত এবং বিষাক্ত। দেহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত **গুটি** বা **ওয়ারূট** (Warts) হইতেও ঐরকম রস বাহির হয়। কাজেই, গুটিগুলিও কুনো ব্যাঙকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। কুনো ব্যাঙের দেহে প্যারাটয়েড গ্রন্থি থাকায়, অনেক মাংসাশী প্রাণী ইহাকে খাদ্যরূপে বিবেচনা করে না। সেই কারণে ইহাদের স্বাভাবিক শত্রুও কম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আক্রান্ত হইলে ব্যাঙ প্রথমতঃ বেগে মূত্র নিঃসরণ করিয়া পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করে। গুটি হইতে নিঃসৃত রস ত্বককে ভিজা রাখে। ত্বক্ দিয়া শ্বসনের জন্য উহা ভিজা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

দেহকাণ্ড(Trunk)-এর শেষভাগে অবস্থিত **অবসারণী-ছিদ্র** (Cloacal aperture) দিয়া মল ও মূত্র নির্গত হয়। তাহা ছাড়া, পুরুষ-ব্যাঙের ক্ষেত্রে **শুক্রাণু** (Sperms) এবং স্ত্রী-ব্যাঙের ক্ষেত্রে **ডিম্বাণু** (Ova) এই ছিদ্র দিয়া দেহের বাহিরে আসে।

দেহকাণ্ডের অগ্রভাগে ও পশ্চাদ্‌ভাগে যথাক্রমে এক জোড়া করিয়া **অগ্র-পদ** (Fore limbs) ও **পশ্চাৎ-পদ** (Hind limbs) অবস্থিত। অগ্রপদ তিনটি প্রধান অংশ নিয়া গঠিত। যথা—দেহ-সংলগ্ন **বাহু** (Arm) বা **ব্রেকিয়াম** (Brachium), পরবর্তী **পুরোবাহু** (Fore-arm) বা **অ্যান্‌টিব্রেকিয়াম** (Antibrachium) এবং **হস্ত** (Hand) বা **ম্যানাস** (Manus)। হস্তে চারটি **অঙ্গুলি** (Digits) থাকে, তৃতীয় অঙ্গুলিটি সব-চেয়ে লম্বা। প্রজনকালে কেবলমাত্র পুরুষ-কুনো ব্যাঙের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলির গোড়ায়, অগ্রপদের তালুতে দুইটি কালো রঙের নরম গদি সৃষ্টি হয়। ইহাকে **থাম্ব প্যাড** (Thumb pad) বা **নপ্‌শিয়াল প্যাড** (Nauptial pad) বলে। যৌন-সঙ্গমকালে স্ত্রী-ব্যাঙকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে থাম্ব প্যাড সাহায্য করে। পশ্চাৎ-পদও তিনটি প্রধান অংশ নিয়া গঠিত। যথা—**উরু** (Thigh), **জঙ্ঘা** (Shank)

১৬৮নং চিত্র—কুনো ব্যাঙের থাম্ব প্যাড।

এবং পদ (Foot) বা পেস (Pes)। পশ্চাৎ-পদে পাঁচটি অঙ্গুলি থাকে—চতুর্থটি দীর্ঘতম। পশ্চাৎ-পদের অঙ্গুলিগুলির গোড়ার দিক পাতলা চামড়া দিয়া পরস্পর যুক্ত হইয়া, লিপ্তপাদ (Webbed feet) সৃষ্টি করিয়াছে।

কোলা ব্যাঙ (Frog)

দেহের অঙ্কদেশে সোনালী হলুদ রঙের প্রাচুর্য দেখা যায় বলিয়া, কোলা ব্যাঙ সোনা ব্যাঙ নামেও পরিচিত। কোলা ব্যাঙের স্বভাব, বসতি ও বহিরাকৃতি প্রায় কুনো ব্যাঙের মতো। ইহাদের বিভিন্ন অঙ্গের কাজও কুনো ব্যাঙের একইরকম অঙ্গের মতো। তবে ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্যও আছে। নিচের তালিকায় কুনো ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙের পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

কুনো ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙের পার্থক্য
(Differences between toad and frog)

কুনো ব্যাঙ (Toad)	কোলা ব্যাঙ (Frog)
বসতি (Habitat)	
(১) অন্ধকার ঘরের কোণ, আবর্জনা-স্তূপ অথবা ছায়াচ্ছন্ন ঝোপ স্বাভাবিক বসতি। মনুষ্য-বসতির মধ্যে অথবা তাহার আশেপাশে দেখা যায়।	(১) পুকুর, ডোবা অথবা নালার কাছের স্যাঁতসেঁতে জায়গা, কিংবা ধানক্ষেত স্বাভাবিক বসতি। সচরাচর মনুষ্য-বসতির কাছে আসে না।
স্বভাব (Habit)	
(২) জলের প্রতি আকর্ষণ কম ; অধিকাংশ সময়ে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থাকে। ডিম পাড়িতে জলে যায় ; অন্যান্য সময়ে পারতপক্ষে জলকে এড়াইয়া চলে।	(২) জলের প্রতি আকর্ষণ বেশি। জলে ও স্থলে সমান স্বচ্ছন্দে থাকে। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য জলে লাফাইয়া পড়ে।
(৩) অন্ধকার খুব পছন্দ করে, আলোক এড়াইয়া চলে। কাজেই, দিনে ইহাদের দেখা পাওয়া একটু কঠিন।	(৩) অন্ধকার পছন্দ করিলেও, দিনে অথবা রাত্রে সব সময়েই ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়।
(৪) ছোট ছোট লাফ দিয়া, থপ্‌থপ্‌ করিয়া চলে। বড় লাফ দিতে পারে না।	(৪) বড় লাফ দেয়। এক লাফে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত যাইতে পারে।
(৫) ভালো সাঁতার দিতে পারে না।	(৫) খুব ভালো সাঁতার দিতে পারে।
(৬) পুরুষ-কুনো ব্যাঙ খুব কম সময়ে শব্দ করে। ইহাদের স্বর কর্কশ।	(৬) প্রজননকালে পুরুষ-কোলা ব্যাঙ দিন-রাত সব সময়েই ক্রমাগত শব্দ করিয়া চলে। ইহাদের স্বর অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর।

কুনো ব্যাঙ (Toad)	কোলা ব্যাঙ (Frog)
বহিরাকৃতি (External features)	
(৭) পরিণত কুনো ব্যাঙ অপেক্ষাকৃত ছোট।	(৭) পরিণত কোলা ব্যাঙ অপেক্ষাকৃত বড়।
(৮) মস্তকের তুলনায় দেহকাণ্ড অপেক্ষাকৃত কম লম্বা।	(৮) মস্তকের তুলনায় দেহকাণ্ড অনেক বেশি লম্বা।
(৯) পৃষ্ঠদেশ ছাই রঙের, অঙ্কদেশ হাল্‌কা হলুদ অথবা সাদা রঙের।	(৯) পৃষ্ঠদেশ শেওলা, হলুদ এবং হাল্‌কা কালো রঙের ডোরা-কাটা। অঙ্কদেশের রঙ উজ্জ্বল সোনালী।
(১০) ত্বক্ খস্‌খসে।	(১০) ত্বক্ মসৃণ।
(১১) পৃষ্ঠদেশে অসংখ্য ছোট-বড় গুটি থাকে।	(১১) দেহে গুটি থাকে না।
(১২) মস্তক সমবাহু ত্রিভুজাকার, তবে অগ্রভাগ ভোঁতা এবং কতকটা গোলাকার।	(১২) মস্তক সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকার এবং অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত সূচালো।
(১৩) চোয়ালে দাঁত থাকে না।	(১৩) উপরের চোয়ালে দাঁত থাকে।
(১৪) নিচের চোয়াল অর্ধ-চন্দ্রাকার।	(১৪) নিচের চোয়াল ত্রিভুজাকার।
(১৫) পুরুষ-কুনো ব্যাঙের স্বর-থলিটি নিচের চোয়ালের অঙ্কদেশে অবস্থিত এবং কালচে চামড়ায় ঢাকা থাকে। শব্দ করার সময় ঐ অংশ সামান্য ফুলিয়া উঠে।	(১৫) পুরুষ-কোলা ব্যাঙের দুইটি স্বর-থলি, এবং প্রতি পাশে, দুই চোয়ালের সংযোগ-স্থলের নিকটে অবস্থিত। ইহার উপরে চামড়ার আবরণ থাকে না। শব্দ করার সময় দুইটি নীল রঙের ফোলা বেলুনের মতো দেখায়।
(১৬) দুইটি বড় প্যারাটয়েড গ্রন্থি থাকে।	(১৬) প্যারাটয়েড গ্রন্থি অন্ততঃ বাহির হইতে দেখা যায় না।
(১৭) দেহকাণ্ডে কুঁজ দেখা যায় না।	(১৭) স্বাভাবিক অবস্থায়, দেহকাণ্ডের পৃষ্ঠদেশে সাধারণতঃ একটি কুঁজ দেখা যায়।
(১৮) কোলা ব্যাঙের তুলনায় ইহার পদগুলি কম লম্বা ও কম শক্তিশালী।	(১৮) কুনো ব্যাঙের তুলনায় ইহার পদগুলি, বিশেষতঃ পশ্চাৎ-পদ দুইটি, বেশি লম্বা ও বেশি শক্তিশালী।
(১৯) পশ্চাৎ-পদের অঙ্গুলিগুলির কেবল গোড়ার দিকে সামান্য কিছুদূর পাতলা চামড়া দিয়া যুক্ত থাকায়, ইহার লিপ্তপাদ অনুন্নত ধরনের।	(১৯) পশ্চাৎ-পদের অঙ্গুলিগুলি প্রায় সমগ্রভাবে পাতলা চামড়া দিয়া যুক্ত হওয়ায়, ইহার লিপ্তপাদ উন্নত ধরনের।
(২০) প্রজনকালে পুরুষ-কুনো ব্যাঙের অগ্রপদের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলির গোড়ায় অপেক্ষাকৃত বড় থাম্ব প্যাড গঠিত হয়।	(২০) প্রজনকালে পুরুষ-কোলা ব্যাঙের অগ্রপদের কেবল প্রথম অঙ্গুলির গোড়ায় ছোট থাম্ব প্যাড গঠিত হয়।

কুনো ব্যাঙ (Toad)	কোলা ব্যাঙ (Frog)
অন্যান্য পার্থক্য (Other differences)	
(২১) প্যারাটয়েড গ্রন্থি ও গুটি থাকায়, মাংসাশী প্রাণীরা খাদ্য হিসাবে সাধারণতঃ ইহাকে পছন্দ করে না। কাজেই, ইহার স্বাভাবিক শত্রু-সংখ্যা কম।	(২১) প্যারাটয়েড গ্রন্থি অথবা গুটি না থাকায়, ইহা অনেক প্রাণীর, বিশেষ করিয়া সাপের, খাদ্য। সাপই ইহার প্রধান স্বাভাবিক শত্রু।
(২২) কোনও ক্ষতি করে না। বরং ক্ষতি-কারক পোকা-মাকড় খাইয়া পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার করে।	(২২) মাছের পোনা খাইয়া মাছ-চাষের ক্ষতি করে। শোল, শাল ইত্যাদি মাছের 'টোপ' হিসাবে ছোট কোলা ব্যাঙ ব্যবহৃত হয়। বড় কোলা ব্যাঙ অনেক দেশে খাদ্যরূপে বিবেচিত হয়।

কুনো ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙের গুরুত্ব (Importance of Toad and Frog)

উভয়চর শ্রেণীর প্রাণী তথা মেরুদণ্ডী প্রাণী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ বহুল-ব্যবহৃত প্রাণী। এই কারণে ব্যাঙকে প্রাণি-বিজ্ঞানের ব্যাকরণ (Grammar of Zoology) বলা হয়। সহজপ্রাপ্য বলিয়া, পশ্চিমবঙ্গে কুনো ব্যাঙই ব্যবচ্ছেদ করা হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নানা প্রজাতির কোলা ব্যাঙ ঐ কাজে ব্যবহৃত হয়।

পাখি
(Bird)

সপ্তম পরিচ্ছেদে পাখিদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। যদিও বিভিন্ন পাখির স্বভাব ও বসতি বিভিন্ন, তবু গঠন ও বিভিন্ন অঙ্গের কাজ সব পাখির ক্ষেত্রে মোটামুটি এক। অষ্টম পরিচ্ছেদে পরিচিত পাখি হিসাবে পায়রার বৈশিষ্ট্য-সূচক বহিরাকৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে পায়রার স্বভাব, বসতি এবং বহিরাকৃতির বিভিন্ন অঙ্গের কাজ আলোচনা করা হইল।

পায়রা (Pigeon)

পায়রা অন্যতম গৃহপালিত পাখি। অধিকাংশ গৃহপালিত প্রাণীর মতো, পায়রার বহিরাকৃতি ও স্বভাবকে মানুষ কৃত্রিম প্রজনন(Artificial breeding)-এর দ্বারা নানাভাবে পরিবর্তিত করিয়াছে। ফলে, নানা জাতের গৃহপালিত পায়রা (Domestic pigeons) সৃষ্টি হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় চল্লিশ

জাতের গৃহপালিত পায়রা দেখা যায়। ইহারা সকলেই পায়রা হইলেও, বহিরাকৃতিতে এত বেশী পৃথক যে, সহজে সকলকে একই প্রজাতির প্রাণী বলিয়া ধারণা করা কষ্টকর। বন্য **নীল পাহাড়ী পায়রা** (Blue Rock Pigeon) গৃহপালিত পায়রার উদ্‌বংশীয় (Ancestor) অর্থাৎ পূর্বপুরুষ। পশ্চিমবঙ্গে সচরাচর এই বন্য পায়রাই দেখা যায়। নিশ্চিত আশ্রয় এবং নিয়মিত খাদ্যের প্রতিশ্রুতিতে, গৃহপালিত পায়রার স্বভাব বন্য পায়রা হইতে অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। গোলাবাড়ী, শস্যভাণ্ডার, অথবা বাজারের আশেপাশে দলবদ্ধভাবে যে সব পায়রা বাস করে, তাহারা কতকটা অর্ধ-গৃহপালিত। ইহারা বন্য স্বভাব ত্যাগ করিয়া, মনুষ্য-বসতির আশেপাশে স্থায়ী বসতি বাছিয়া নিয়াছে। বন্য পায়রার স্বভাব, বসতি, বহিরাকৃতি ইত্যাদি আলোচনা প্রসঙ্গে, গৃহপালিত ও অর্ধ-গৃহপালিত পায়রার বিষয়েও উল্লেখ করা হইল।

স্বভাব ও বসতি (Habit and Habitat)

পায়রা স্বভাবে নিরীহ। বন্য পায়রা রুক্ষ পাহাড়ী অঞ্চলে, মনুষ্য-বসতি হইতে কিছুদূরে, দলবদ্ধভাবে বাস করে। ইহারা সকালে খাদ্যের সন্ধানে বাহির হয় এবং সন্ধ্যায় বাসস্থানে ফিরিয়া, সারারাত বিশ্রাম করে। অর্ধ-গৃহপালিত পায়রারা শস্যভাণ্ডার অথবা শস্যক্ষেত্রের আশেপাশে সারাদিন ঘুরিয়া বেড়ায়, রেলওয়ে স্টেশন অথবা ভাঙা বাড়ীতে রাতের জন্য আশ্রয় নেয়।

গমন (Locomotion)

পায়রা হাঁটিয়া (Walking) এবং উড়িয়া (Flying) গমন করে। ইহারা এক জোড়া পশ্চাৎ-পদ বা পায়ের সাহায্যে হাঁটে। পায়ের অঙ্গুলিতে নরম গদি (Pad) থাকায়, ইহাদের হাঁটিতে সুবিধা হয়। পায়রা খাদ্যের অন্বেষণে অথবা শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য উড়িয়া যায়। দুইটি **ডানা** (Wings) এবং বারোটি **পুচ্ছ-পালক** (Tail-feathers) ইহাদের উড়িবার প্রধান অঙ্গ। বক্ষ-সংলগ্ন তিনটি প্রধান পেশীসমেত প্রায় পঞ্চাশটি ছোট-বড় পেশী ডানা দুইটির উপর-নিচে উঠা-নামা নিয়ন্ত্রিত করে। ডানার ঐ রকম সঞ্চালনে পায়রা আগাইয়া চলে। বারোটি পুচ্ছ-পালক এবং ডানার কতকগুলি পালক উড়িবার দিক নির্দেশ করে। পায়রা সাধারণতঃ সোজা পথে তীব্র গতিতে উড়িয়া চলে। পোষা পায়রা ঘণ্টায় আটচল্লিশ হইতে আটান্ন কিলোমিটার বেগে উড়িতে পারে। ইহারা গাছের ডালেও স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিতে পারে। পায়ের তিনটি অঙ্গুলি সামনের দিকে এবং

একটি পিছনের দিকে থাকায়, পায়রা সহজে গাছের ডালে আট্‌কাইয়া থাকিতে পারে।

খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ (Food and Feeding)

পায়রা শাকাশী পাখি। ডাল, গম ইত্যাদি শস্য পায়রার প্রধান খাদ্য। গাছের কোমল অংশ ও কুঁড়ি এবং বট ও অন্যান্য ফল ইহাদের খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। খাদ্যের সন্ধান পাইলে, ইহারা দলবদ্ধভাবে মাটিতে নামিয়া আসে এবং চঞ্চুর সাহায্যে একের পর এক শস্য-কণা খুব তৎপরতার সঙ্গে মুখে তুলিয়া নেয়। ইহারা ইচ্ছা করিয়া কিছু কাঁকর-ও গিলিয়া ফেলে। ঐ কাঁকরগুলি পৌষ্টিক নালীর অংশ-বিশেষে খাদ্যকে পিষিয়া ফেলিতে সাহায্য করে।

জনন (Reproduction)

ছোট ছোট কাঠি, খড়, পালক ইত্যাদির সাহায্যে ইহারা বাসা (Nest) নির্মাণ করে। বছরের প্রায় সবসময়ই ইহাদের প্রজনকাল। তবে সাধারণতঃ বসন্তকালেই অধিকাংশ পায়রা ডিম পাড়ে। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় পায়রাই ডিমে তা দিয়া থাকে। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। সদ্যোজাত পায়রার বাচ্চা অসহায় এবং প্রায় পালক-বিহীন।

বহিরাকৃতি (External features)

বন্য পায়রা ঘন-ধূসর রঙের। ইহাদের গ্রীবায় ময়ূরপঙ্খী (Purple) এবং সবুজ রঙের ধাতব-ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়। ডানায় পর পর দুইটি চওড়া কালো দাগ থাকে। পুচ্ছ-পালকগুলিতেও একটি কালো দাগ থাকে।

পায়রার **মস্তক** (Head) প্রায় গোলাকার। মস্তকের অগ্রভাগে **চঞ্চু** (Beak) অবস্থিত। উপরের ও নিচের চোয়ালে একধরনের শক্ত আবরণ থাকায়, চঞ্চু সৃষ্টি হইয়াছে। চঞ্চুর উপরের অংশটি বাঁকা এবং নিচের অংশের চেয়ে সামান্য লম্বা। চঞ্চুর সাহায্যে পায়রা শস্য-কণা ঠোক্‌রাইয়া তুলিয়া নেয়। পায়রার চঞ্চু আত্মরক্ষায় বিশেষ সাহায্য করে না। বাসা তৈয়ারির সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং পালক পরিষ্কার করাও চঞ্চুর কাজ।

চঞ্চুর উপরের অংশের গোড়ার দিকে পাতলা চামড়ায় ঢাকা পালক-বিহীন একটি নরম মাংসল অংশ থাকে। ইহাকে **সিরি** (Cere) বলে। ইহা সুবেদী এবং পায়রার স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

সিরির মধ্যে **নাসারন্ধ্র** (Nostrils) দুইটি অবস্থিত। ইহারা পায়রার

ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ইহারা শ্বসনেও সাহায্য করে। **চক্ষু** (Eyes) দুইটি বেশ বড় এবং গোল। প্রতিটি চক্ষুতে **উর্ধ্ব-নেত্রপল্লব** (Upper eye-lid), **নিম্ন-নেত্রপল্লব** (Lower eye-lid) এবং **উপপল্লব** (Nictitating membrane) নামক তিনটি নেত্রপল্লব থাকে। চক্ষু বন্ধ করার সময় নিম্ন-পল্লব-সংলগ্ন ঈষদচ্ছ উপপল্লবটি তির্যকভাবে উপরে উঠিয়া যায়। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়।

প্রতিটি চক্ষুর পিছনে পালকে আবৃত একটি করিয়া **কর্ণছিদ্র** (Auditory apertures) থাকে। কর্ণছিদ্র পায়রার শ্রবণেন্দ্রিয়ের অংশ-বিশেষ। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া শব্দ-তরঙ্গ কর্ণের ভিতরকার অংশে পৌঁছায়।

পায়রার **গ্রীবা** (Neck) লম্বা। গ্রীবার সাহায্যে পায়রা মস্তকটিকে চারদিকে ঘুরাইতে পারে।

পায়রার **দেহকাণ্ড** (Trunk) মাংসল ও ভারী। ইহার অগ্রভাগকে **বক্ষ** (Thorax) এবং পশ্চাৎ-ভাগকে **উদর** (Abdomen) বলা যায়। দেহকাণ্ডের অগ্রভাগের দুই পাশ হইতে দুইটি **ডানা** (Wings) বাহির হয়। ডানা দুইটি বস্তুতঃপক্ষে অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্রপদের রূপান্তর-মাত্র। ডানার বিভিন্ন অংশে নানা ধরনের পালক থাকে (পরে দ্রষ্টব্য)। স্বাভাবিক অবস্থায় ডানা দুইটি পিঠের উপর ভাঁজ করা থাকে। দেহকাণ্ডের শেষভাগের অঙ্কদেশ হইতে এক জোড়া পশ্চাৎ-পদ বা **পদ** (Legs) বাহির হয়। পায়রার পদ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর পশ্চাৎ-পদের মতো হইলেও, ইহা একটু বিশিষ্ট ধরনের। বাহির হইতে পদের তিনটি অংশ দেখা যায়। প্রথম অংশটি পেশীবহুল এবং পালকাবৃত। পরের দুইটি অংশ আঁইশ দিয়া আবৃত। প্রতিটি পায়ে চারটি করিয়া **অঙ্গুলি** (Digits) থাকে এবং অঙ্গুলির শেষপ্রান্তে একটি করিয়া শক্ত বাঁকা **নখর** (Claw) থাকে। নখরগুলি খুব তীক্ষ্ণ না হওয়ায়, ইহারা পায়রার আত্মরক্ষায় বিশেষ কাজে আসে না। ইহারা পায়রাকে গাছের ডাল আঁকড়াইয়া থাকিতে সাহায্য করে।

দেহকাণ্ডের শেষভাগে বড় **অবসারণী-ছিদ্র** (Cloacal aperture) অবস্থিত। ইহার মধ্য দিয়া দেহ হইতে মল-মূত্র বাহির হয়। পুরুষ-পায়রার ক্ষেত্রে, ইহার মধ্য দিয়া শুক্রাণুও বাহির হয়। এই ছিদ্রপথে স্ত্রী-পায়রার নিষিক্ত ডিম বাহির হয়।

দেহকাণ্ডের শেষে একটি ছোট ত্রিকোণাকার অংশ থাকে। ইহাই পায়রার **লেজ** (Tail) বা **ইউরোপাইজিয়াম** (Uropygium)। এই অংশে একটি গোলাকার স্ফীত জাগয়া দেখা যায়। ইহাকে **তৈলগ্রন্থি** (Oil

gland), **প্রীন গ্ল্যান্ড** (Preen gland) বা **ইউরোপাইজিয়াল গ্ল্যান্ড** (Uropygial gland) বলে। তৈলগ্রন্থি হইতে মূলতঃ তৈল-জাতীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়। পায়রা চঞ্চুতে করিয়া ঐ তৈল-জাতীয় পদার্থ নিয়া, পালকে লাগাইয়া পালকের ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করে।
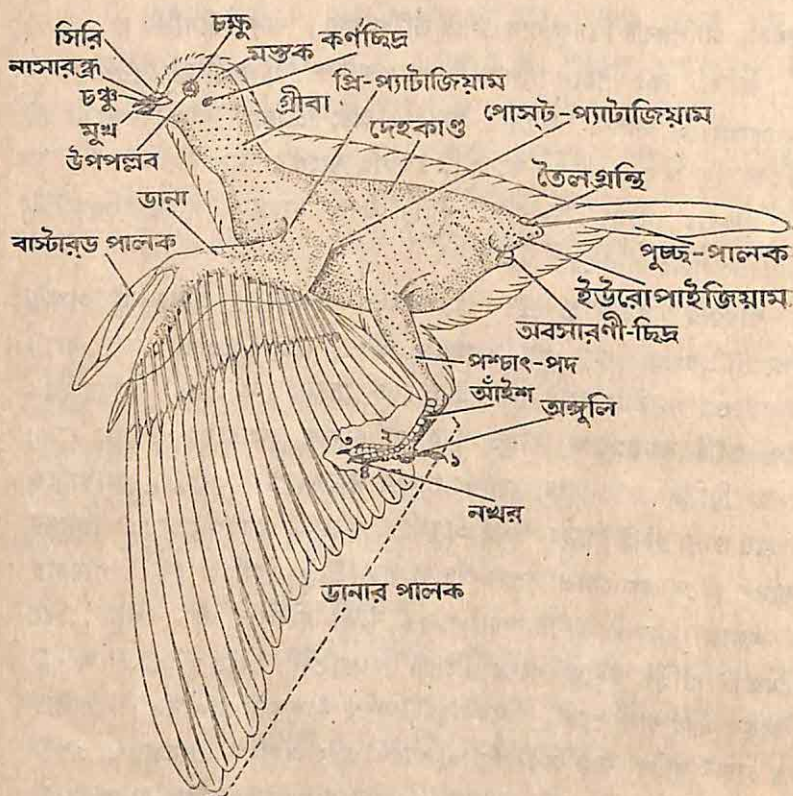
১৬৯নং চিত্র—পায়রার দেহে পালক-বিন্যাস।

চক্ষু, চঞ্চু এবং পদের শেষভাগ ছাড়া, পায়রার দেহের অন্য সব অংশ **পালক** (Feathers) দিয়া আবৃত। পূর্ণাঙ্গ পায়রার দেহের পালকগুলি নিম্নলিখিত কয়েক ধরনের।

(১) **উড়িবার পালক** (Flight feathers)—এই ধরনের পালক অন্যান্য পালকের চেয়ে বড়। প্রতিটি পালকের একটি করিয়া **মধ্য-অক্ষ** (Shaft) থাকে। মধ্য-অক্ষের শেষদিকে একটি **ফলক** (Vane) অংশ থাকে। মধ্য-অক্ষের প্রথমভাগ ফাঁপা এবং দেহ-সংলগ্ন। এই অংশকে **কুইল** (Quill) বলে। উড়িবার পালক আবার কয়েক ধরনের। যেমন—

(ক) রেমিজেস (Remiges)—ইহারা ডানার সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রতিটি ডানায় তেইশটি করিয়া বড় বড় রেমিজেস থাকে।

(খ) বাস্টার্ড পালক (Bastard quills)—ইহারা কয়েকটি ছোট ছোট উড়িবার পালক—ডানার বাহিরের দিকের অঙ্গুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

(গ) রেট্রিসেস* (Retrices)—ইহারা সংখ্যায় মোট বারোটি এবং লেজের তৈলগ্রন্থির নিকটে অর্ধ-চন্দ্রাকারে সাজানো থাকে।

উড়িবার পালকগুলি পায়রাকে উড়িতে সাহায্য করে।

১৭০নং চিত্র—ক. উড়িবার পালক, খ. ডাউন ফেদার, গ. ফাইলোপ্লুম।

(২) **দেহপালক** বা **কণ্টুর ফেদার** (Contour feathers)—ইহারা উড়িবার পালকেরই মতো, তবে আকারে অনেক ছোট; দেহের বিভিন্ন অংশে নির্দিষ্ট রীতিতে সজ্জিত থাকে। ইহারা দেহের তাপ-সংরক্ষণ করে।

(৩) **ফাইলোপ্লুম** (Filoplumes)—ইহারা দেখিতে লোমের মতো। এই ধরনের পালকে একটি লম্বা অক্ষের শেষপ্রান্তে কতকগুলি সূক্ষ্ম পালকাংশ থাকে। দেহ-পালকের ফাঁকে ফাঁকে ফাইলোপ্লুম সাজানো থাকে। ইহারাও দেহের তাপ-সংরক্ষণে সাহায্য করে।

সদ্যোজাত পায়রার বাচ্চার দেহ একধরনের পালকে আবৃত থাকে। এই পালককে **ডাউন ফেদার** (Down feathers) বলা হয়। এই ধরনের পালকে একটি হ্রস্ব মধ্য-অক্ষের শেষপ্রান্তে কতকগুলি পালকাংশ থাকে।

বাহির হইতে দেখিলে, পায়রার দেহের সব জায়গায় পালক আছে বলিয়া

* বহুবচন ; রেট্রিক্স (Retrix) — একবচন।

মনে হয়। বস্তুতঃপক্ষে, দেহ-পালকগুলি সব জায়গায় চর্মকে ঢাকিয়া রাখে না, কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই উহারা সীমাবদ্ধ।

পায়রার গুরুত্ব (Importance of Pigeon)

শিক্ষিত গৃহপালিত পায়রা জরুরী সংবাদ আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়। পায়রা পোষা অন্যতম সৌখিন বিলাসিতা। সাদা পায়রা শান্তির প্রতীক। কোনও কোনও অঞ্চলে পায়রা পবিত্র পাখি বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ কেহ পায়রার মাংস মুখরোচক খাদ্য বলিয়া মনে করেন। পায়রার বিবরণ দিয়া অধিকাংশ দেশে পক্ষি-বিজ্ঞান(Ornithology)-এর হাতেখড়ি হয়। পরীক্ষাগারে গৃহপালিত অথবা অর্ধ-গৃহপালিত পায়রা ব্যবচ্ছেদ করা হয়।

গিনিপিগ
(Guineapig)

গিনিপিগ-ও একধরনের গৃহপালিত প্রাণী। ইহাদের পূর্বপুরুষ দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা। বন্য গিনিপিগ বালুকাময় প্রান্তরে গর্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে বাস করে ; স্যাঁতসেঁতে অঞ্চলে লম্বা লম্বা ঘাসের ফাঁকে ইহারা লুকাইয়া থাকে। ইহারা উদ্ভিদের কোমল অংশ খায় এবং এককালে একটি অথবা দুইটি বাচ্চা প্রসব করে। বন্য গিনিপিগের স্বভাব ও বসতি সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। ইউরোপীয়রা দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছানোর আগে, স্থানীয় অধিবাসীরা গিনিপিগকে সম্পূর্ণরূপে গৃহপালিত করিয়া ফেলিয়াছিল। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত সমস্ত গিনিপিগ-ই গৃহপালিত। কাজেই, নিচের বিবরণ গৃহপালিত গিনিপিগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

স্বভাব ও বসতি (Habit and Habitat)

পরীক্ষাগারে তারের জাল-দেওয়া কাঠের বাক্সে, গৃহস্থের সুরক্ষিত গৃহকোণে অথবা শহরের পার্কে কৃত্রিম পর্বতগুহায় গিনিপিগ স্বচ্ছন্দে বাস ও বংশবৃদ্ধি করে। স্বভাবে ইহারা খুব নিরীহ এবং ভীতু। ইহারা অন্ধকার পছন্দ করিলেও, আলোকে আসিতে দ্বিধাবোধ করে না।

খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ (Food and Feeding)

গিনিপিগ মুখ্যতঃ তৃণভোজী হইলেও, অন্যান্য উদ্ভিদের কোমল অংশ খাইয়া থাকে। খাদ্যগ্রহণকালে ইহারা খাদ্যকে সোজাসুজি মুখে তুলিয়া নেয়।

গমন (Locomotion)

দুই জোড়া পদের সাহায্যে ইহারা হাঁটিয়া অথবা ছোট ছোট লাফ দিয়া চলাফেরা করে। গিনিপিগ দ্রুত চলিতে পারে না।

জনন (Reproduction)

গিনিপিগ খুব দ্রুতহারে বংশবৃদ্ধি করে। স্ত্রী-গিনিপিগ তেষট্টি হইতে একাত্তর দিন গর্ভধারণ করিয়া, এককালে চারটি হইতে বারোটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। সদ্যোজাত শাবক চোখ খুলিতে পারে এবং উহার দেহ লোমে আবৃত থাকে। জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শাবক দৌড়াইতে পারে এবং প্রায় তিন সপ্তাহ পরে মাতৃদুগ্ধ পান করা ত্যাগ করে। গিনিপিগ প্রায় ছয় বছর বাঁচে।

বহিরাকৃতি (External features)

গিনিপিগের **মস্তক** (Head) কিছুটা লম্বাটে। মস্তকের অগ্র-প্রান্তে অবস্থিত **মুখ** (Mouth) দিয়া ইহারা খাদ্য গ্রহণ করে। মুখের উপরে ও নিচে যথাক্রমে মাংসল **ঊর্ধ্বোষ্ঠ** (Upper lip) এবং **নিম্নোষ্ঠ** (Lower lip) থাকে। ঊর্ধ্বোষ্ঠের মাঝ-বরাবর চেরা (Cleft)। মুখের উপরে, ঊর্ধ্বোষ্ঠের পিছনে অবস্থিত **নাসারন্ধ্র** (Nostrils) দুইটি ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়। শ্বসনের সময় নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া বায়ু প্রবেশ করে এবং বাহির হয়। নাসারন্ধ্রের দুই পাশে কতকগুলি শক্ত ও লম্বা লোম থাকে। ইহাদের **গুম্ফ** (Vibrissae) বলে। ইহারা সুবেদী এবং গিনিপিগের স্পর্শেন্দ্রিয়। **চক্ষু** (Eyes) দুইটি গিনিপিগের দর্শনেন্দ্রিয়। **ঊর্ধ্ব-নেত্রপল্লব** (Upper eye-lid) এবং **নিম্ন-নেত্রপল্লব**(Lower eye-lid)-এর সাহায্যে ইহারা চক্ষুকে বন্ধ করিতে পারে। ধূলাবালি ও তীব্র আলোক হইতে চক্ষুকে রক্ষা করা নেত্রপল্লবের কাজ।

কর্ণছত্র (Pinna) শব্দ-তরঙ্গ সংগ্রহ করে। কর্ণছত্র-সংলগ্ন **কর্ণকুহর** (Auditory meatus) শব্দ-তরঙ্গকে অন্তঃকর্ণে পৌছাইতে সাহায্য করে।

গ্রীবা(Neck)-র সাহায্যে গিনিপিগ মস্তকটিকে ঘুরাইতে পারে।

গিনিপিগের **অগ্রপদ** (Fore limbs) ও **পশ্চাৎ-পদ** (Hind limbs), ব্যাঙের মতো, বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। পশ্চাৎ-পদ অগ্রপদের চেয়ে সামান্য লম্বা। অঙ্গুলির প্রান্তদেশে অবস্থিত **নখর** (Claw) দিয়া গিনিপিগ মাটি আঁচড়াইতে পারে। আত্মরক্ষার কাজে নখরগুলি বিশেষ সাহায্য করে না।

উদরের অঙ্কদেশে এক জোড়া **স্তনবৃন্ত** (Teats) থাকে। পুরুষ-গিনিপিগে

ঐগুলি অপুষ্ট এবং ছোট। সন্তানবতী স্ত্রী-গিনিপিগের স্তনবৃন্ত পুষ্ট এবং বড়। স্তনবৃন্তে কয়েকটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। বাচ্চা গিনিপিগ যখন মায়ের স্তনবৃন্ত চুষিয়া দুগ্ধপান করে, তখন ঐ সমস্ত ছিদ্রপথে দুগ্ধ বাহির হইয়া আসে।

দেহকাণ্ডের শেষপ্রান্তে, কিছুটা অঙ্কদেশ ঘেঁষিয়া **পায়ু** (Anus) অবস্থিত। পায়ু দিয়া মল বাহির হয়।

পুরুষ-গিনিপিগের পায়ুর সামনে একটি নলাকার, পেশীবহুল **পুং-জননেন্দ্রিয়** (Penis) এবং ইহার শীর্ষদেশে **পুং-জননছিদ্র** (Male genital aperture) থাকে। পুং-জননছিদ্র দিয়া যৌন-সঙ্গমকালে শুক্রাণু এবং অন্য সময়ে মূত্র বাহির হয়। পুং-জননেন্দ্রিয়ের গোড়ায় **অণ্ডকোষ** (Scrotum) নামক একটি থলির মতো অঙ্গ দেখা যায়। শুক্রাশয় দুইটি (Testes) ঐ থলিতে থাকে।

স্ত্রী-গিনিপিগের পায়ুর সামনে একটি অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্র থাকে। ইহাকে **ভাল্‌ভা** (Vulva) বলে। প্রসবকালে ঐ ছিদ্রপথে বাচ্চা বাহির হয়। ভাল্‌ভার সামনে একটি মাংসল অংশ থাকে; উহাকে **ক্লাইটরিস** (Clitoris) বলা হয়। ক্লাইটরিসের পিছনে আর একটি ছোট ছিদ্র থাকে। ইহা **মূত্রছিদ্র** (Urinary aperture)। মূত্রছিদ্র দিয়া মূত্র বাহির হয়।

গিনিপিগের গুরুত্ব (Importance of Guineapig)

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্য পৃথিবীর অনেক দেশে গিনিপিগকে বাছিয়া নেওয়া হয়। বিভিন্ন পরীক্ষাগারে প্রতি বছর অনেক গিনিপিগ ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী

১। কেঁচোর বহিরাকৃতির বিবরণ দাও। কেঁচো কিভাবে মানুষের উপকার করে, তাহা বল। [H. S. 1962 ; *cp*. 1971]

Give an account of the external features of earthworm. State how earthworms are beneficial to man.

২। কেঁচো(ফেরিটিমা)-র নিম্নলিখিত অংশগুলির অবস্থান, গঠন এবং কাজ বর্ণনা কর :—

(ক) প্রস্টোমিয়াম [H. S. 1964] ; (খ) ক্লাইটেলাম [H. S. 1964 (Comp.)] ; (গ) বিভিন্ন ছিদ্র [*cp*. H. S. 1970 (Comp.)]।

Describe the position, structure and function of the following in earthworm (*Pheretima*) :—

(*a*) Prostomium ; (*b*) Clitelum ; (*c*) Different openings.

৩। আরসোলার স্বভাব ও বসতি বর্ণনা কর। [*cp*. H. S. 1962 (Comp.)]
Describe the habit and habitat of cockroach.

৪। আরসোলার বহিরাকৃতির বিবরণ দাও এবং প্রাণি-রাজ্যে উহার স্থান নির্দেশ কর।
[H. S. 1961 (Comp.)]

Describe the external features of the cockroach and mention its position in the animal kingdom.

৫। পেরিপ্লানেটার গমনের সঙ্গে যুক্ত গঠনাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
[H. S. 1968; *cp.* 1963 (Comp.)]

Give a short description of the various structures associated with locomotion in *Periplaneta.*

৬। স্ত্রী ও পুরুষ পেরিপ্লানেটার বহিরাকৃতির পার্থক্য উল্লেখ কর।
[*cp.* H. S. 1971 (Comp.), 1968 (Comp.), 1964 (Comp.)]

Mention the external differences between a male and a female *Periplaneta*

৭। প্যালিমনের নিম্নলিখিত অংশগুলির অবস্থান, গঠন ও কার্যকারিতা বর্ণনা কর :—
(ক) পুঞ্জাক্ষি [H. S. 1969]; (খ) চোয়াল [H. S. 1969]; (গ) মুখ।

Describe the position, structure and function of the following in *Palaemon* :—
(*a*) Compound eye ; (*b*) Mandible ; (*c*) Mouth.

৮। স্ত্রী ও পুরুষ প্যালিমনের বহির্গঠনের পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর।
[*cp.* H. S. 1971, 1968, 1965 (Comp.), 1962]

Mention the external differences between a male and a female *Palaemon.*

৯। রুই মাছের বহিরাকৃতির বিবরণ দাও এবং বর্ণিত প্রতিটি অঙ্গের কাজ উল্লেখ কর।
[H. S. 1961 ; *cp.* 1965 (Comp.)]

Describe the external features of Rohu fish and mention the function of each structure that you mention.

১০। একটি অস্থিময় মৎস্যের গমন-প্রণালী এবং গমনের অঙ্গগুলি বর্ণনা কর।

Describe the method of locomotion and the locomotory organs in a bony fish.

১১। কুনো ব্যাঙ এবং কোলা ব্যাঙের বসতি ও বহিরাকৃতির তুলনা কর।
[H. S. 1963 (Comp.)]

Compare and contrast the habitat and external features of a toad (*Bufo*) and a frog (*Rana*).

১২। কুনো ব্যাঙ অথবা কোলা ব্যাঙের শিকার ধরার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
[*cp.* H. S. 1966 (Comp.), 1963]

Mention how the toad (*Bufo*) *or* the frog (*Rana*) catches the prey.

১৩। কুনো ব্যাঙ অথবা কোলা ব্যাঙের গমন-প্রণালী এবং গমনের অঙ্গগুলি বর্ণনা কর।

Describe the method of locomotion and the locomotory organs of the frog *or* the toad.

১৪। পায়রার বহিরাকৃতির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর ও উহার বিভিন্ন গঠনাদির কার্যকারিতা সম্বন্ধে লেখ।
[H. S. 1968 ; *cp.* 1961]

Draw and label the external features of a pigeon and mention the function of each structure.

১৫। গিনিপিগের বহিরাকৃতির সাধারণ বিবরণ দাও।
[H. S. 1962 (Comp.)]

Give an account of the gross external features of the guineapig.

প্রদর্শন ও পরীক্ষা

(Demonstration and Experiment)

পাঠ্য-বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া, এই পরিচ্ছেদে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রদর্শন ও পরীক্ষা বর্ণনা করা হইল।

(১) মশার জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা প্রদর্শন (Demonstration of the different stages in the life-history of mosquito)—

মশা পতঙ্গ-শ্রেণীর প্রাণী। ইহার জীবন-বৃত্তান্তে চারটি দশা দেখা যায়। যেমন—(ক) ডিম (Egg), (খ) শূককীট বা লার্ভা (Larva), (গ) মূককীট বা পিউপা (Pupa) এবং (ঘ) সমঙ্গ বা ইমাগো (Imago)। ডিম হইতে শূককীট, শূককীট হইতে মূককীট এবং মূককীট হইতে সমঙ্গ মশা বাহির হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কয়েক রকমের মশা দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কিউলেক্স (*Culex*) এবং অ্যানোফিলিস (*Anopheles*) খুব পরিচিত। এই দুই রকম মশার জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশার মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য আছে। নিচের তালিকায় ইহাদের উল্লেখ করা হইল। এই পার্থক্যগুলির সাহায্যে কোনটি কোন মশার জীবন-বৃত্তান্তের দশা, তাহা সহজে চেনা যায়।

জীবন-বৃত্তান্তের দশা	কিউলেক্স	অ্যানোফিলিস
(ক) ডিম	দলবদ্ধভাবে ভাসে।	আলাদা-আলাদা ভাবে ভাসে।
(খ) শূককীট	দেহ লম্বা এবং কয়েকটি দেহ-খণ্ডক নিয়া গঠিত। গায়ে কয়েক গুচ্ছ শক্ত রোম থাকে। শ্বাসনলের সাহায্যে বায়ু নিয়া শ্বসন করে। দেহ জলের উপরিতলের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণে ঝুলিয়া থাকে।	মোটামুটি কিউলেক্সের শূককীটের মতো, তবে দেহ জলের উপরিতলের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল হইয়া থাকে।

জীবন-বৃত্তান্তের দশা	কিউলেক্স	অ্যানোফিলিস
(গ) মূককীট	দেহে রোম থাকে, দেখিতে কতকটা 'কমা' চিহ্নের মতো।	কিউলেক্সের মূককীটের মতো, তবে দেহের অগ্রভাগ নিচের দিকে অপেক্ষাকৃত বেশি ঘুরানো।
(ঘ) সমঙ্গ মশা	ডানায় কালো দাগ থাকে না, দেহকে বসার স্থানের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল করিয়া রাখে এবং পশ্চাৎ-পদ জোড়া উদরের উপরের দিকে তোলা থাকে।	ডানায় কালো দাগ থাকে, দেহকে বসার স্থানের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণ করিয়া বসে, পশ্চাৎ-পদ জোড়া উদরের দুই পাশে থাকে।
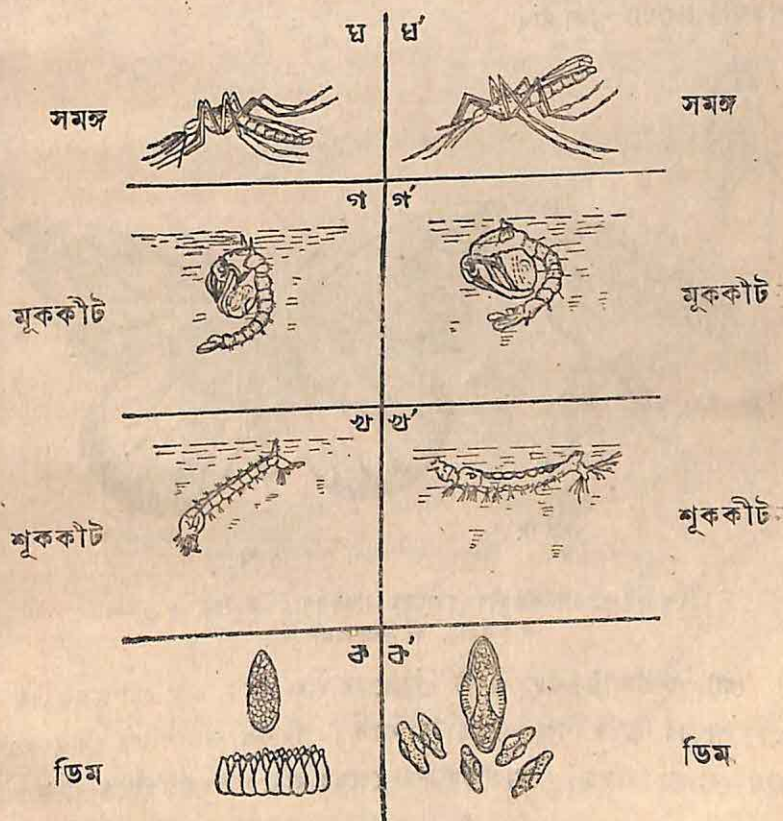
১৭১নং চিত্র—মশার জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা : ক., খ., গ. ও ঘ. কিউলেক্স ; ক'., খ'., গ'. ও ঘ'. অ্যানোফিলিস।

(২) **প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা প্রদর্শন (Demonstration of the different stages in the life-history of butterfly)—**

মশার মতো, প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্তেও চারটি দশা দেখা যায়। যেমন—

(ক) **ডিম**—প্রজাপতি পাতার নিচের পিঠে ডিম পাড়ে। একসঙ্গে অনেক ডিম পাতার গায়ে পাশাপাশি আট্‌কাইয়া থাকে।

(খ) **শূককীট**—দেহ লম্বা এবং কয়েকটি দেহ-খণ্ডক দিয়া গঠিত। অধিকাংশ প্রজাপতির শূককীটের গায়ে অসংখ্য শক্ত শুঁয়া থাকে বলিয়া, ইহাদের **শুঁয়াপোকা (Caterpiller)** বলা হয়। কোনও কোনও প্রজাপতির শূককীটে শুঁয়া থাকে না। দেহের অঙ্কভাগে কয়েকটি পদ থাকে। শূককীট ক্রমাগত পাতা খায়।
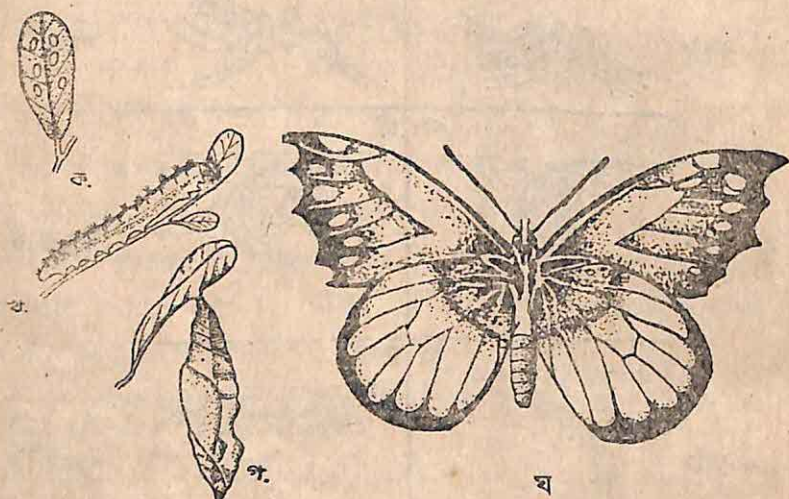
১৭২নং চিত্র—প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা: ক. ডিম, খ. শূককীট, গ. মূককীট, ঘ. সমঙ্গপ্রজাপতি।

(গ) **মূককীট**—দেহ একটি খোলকের মধ্যে থাকে এবং খোলকের এক প্রান্ত পাতার নিচের পিঠে আট্‌কাইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রজাপতির খোলকের গঠন এবং রঙ বিভিন্ন। খোলকের মধ্যে দেহের নানা পরিবর্তন হইতে থাকে।

(ঘ) **সমঙ্গ প্রজাপতি**—মস্তক, বক্ষ এবং উদর—এই তিন খণ্ডে দেহ বিভক্ত। বক্ষের অঙ্কদেশে তিন জোড়া পদ এবং পৃষ্ঠদেশে দুই জোড়া বর্ণাঢ্য ডানা থাকে। বিভিন্ন প্রজাপতির ডানার আকার এবং বর্ণ বিভিন্ন রকমের।

(৩) জিওল মাছকে জলে ডুবাইয়া মারার পরীক্ষা (Drowning experiment with air-breathing fish)—

মাছ ফুলকার সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়া শ্বসন করে। কিন্তু অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র-যুক্ত মাছেরা ফুলকার সাহায্যে যেমন জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে, তেমনি আবার অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে বায়ু হইতেও অক্সিজেন নিয়া থাকে। এই দুই উৎস হইতে প্রাপ্ত অক্সিজেন দিয়া ইহারা সুষ্ঠুভাবে শ্বসন সমাধা করে। বস্তুতঃপক্ষে, বায়ুর অক্সিজেন না পাইলে, ইহারা বেশিক্ষণ বাঁচিতে পারে না। কাজেই, জিওল মাছ, অর্থাৎ অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র-যুক্ত মাছকে জলের বাহিরে না আসিতে দিয়া, অর্থাৎ জলে ডুবাইয়া, মারিয়া ফেলা যায়।

পরীক্ষা (Experiment)—দুইটি একই মাপের কাচের জারের প্রায় $\frac{3}{4}$ অংশ পুকুরের জল দিয়া পূর্ণ করা হইল এবং প্রত্যেক জারে একটি করিয়া সুস্থ, সবল জিওল (কৈ, মাগুর অথবা শিঙি) মাছ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয়
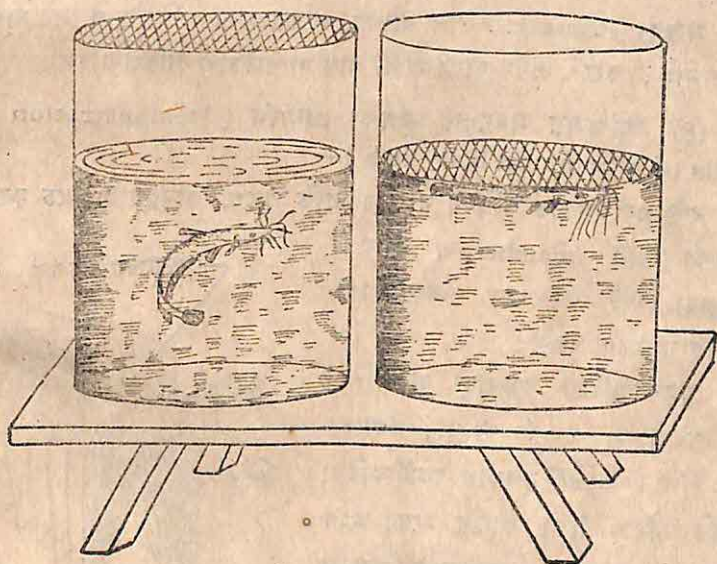
১৭৩নং চিত্র—জিওল মাছকে জলে ডুবাইয়া মারার পরীক্ষা : (বাঁয়ে) প্রাথমিক ও (ডাইনে) শেষ অবস্থা।

জারের জলের উপরিতল-বরাবর এক টুক্‌রা তারের জাল শক্তভাবে আটকাইয়া দেওয়া হইল। যাহাতে মাছটি লাফাইয়া পলাইয়া না যায়, সেইজন্ম প্রথম পাত্রের মুখটিও (চিত্রের মতো) এক টুক্‌রা তারের জাল দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এই অবস্থায় পাত্র দুইটিকে পাশাপাশি রাখিয়া দেওয়া হইল।

নিরীক্ষা (Observation)—প্রথম পাত্রের মাছটিকে মাঝে মাঝে জলের উপরে উঠিয়া বায়ু নিতে দেখা গেল। দ্বিতীয় পাত্রের মাছটিও একইভাবে বার বার বায়ু নিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তারের জালে বাধা পাইয়া আবার নিচে নামিয়া গেল এবং মুখ দিয়া বেশি করিয়া জল নিতে থাকিল। মাছটি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিল এবং কয়েক ঘণ্টা পরে মরিয়া গেল।

সিদ্ধান্ত (Inference)—পাত্রের জলে অক্সিজেন দ্রবীভূত ছিল। কেবল জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়া দ্বিতীয় পাত্রের জিওল মাছটি বেশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে শ্বসন করিতে পারিল না। ক্রমশঃ উহার শ্বাসকষ্ট শুরু হইল এবং জল হইতে বেশি করিয়া অক্সিজেন নেওয়ার জন্য বেশি জল মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করাইতে লাগিল। কিন্তু শুধুমাত্র জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনে তাহার প্রয়োজন মিটিল না, বায়ুর অক্সিজেনের অভাবে শেষে মরিয়া গেল। সুতরাং, জিওল মাছ ফুলকা দিয়া জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়া, এবং অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র দিয়া বায়ু হইতে অক্সিজেন নিয়া শ্বসন করে।

মন্তব্য (Remarks)—বলা বাহুল্য, খাদ্যের অভাবে দ্বিতীয় পাত্রের মাছটি মরে নাই; কারণ, প্রথম পাত্রে মাছটি খাদ্য না পাইয়াও বাঁচিয়া রহিল।

(৪) **অস্থিময় মৎস্যের ফুলকা প্রদর্শন (Demonstration of gills of a common bony fish)**—

রুই এবং অন্যান্য অস্থিময় মৎস্যের প্রতি পাশে, কান্‌কুয়ার নিচে ফুলকা-প্রকোষ্ঠ(Gill chamber)-এ চারটি করিয়া মোট চার জোড়া ফুলকা পাশাপাশি সাজানো থাকে।

ফুলকাগুলিতে রক্তবাহী নালী(শিরা ও ধমনী)-র প্রাচুর্য থাকায়, ইহাদের রঙ লাল। প্রতিটি ফুলকায় একটি করিয়া অস্থি-নির্মিত বাঁকা কাঠির মতো অংশ থাকে। ঐ অংশকে **ফুলকার খিলান** (Gill arch) বলা হয়। ফুলকার খিলানের উত্তল পৃষ্ঠে পাশাপাশি দুই সারি **ফুলকার পাতা** (Gill lamellae) বইয়ের পাতার মতো সাজানো থাকে। ফুলকার খিলানের অবতল পৃষ্ঠ মাছের গ্রাসনালীর দিকে থাকে।

১৭৪নং চিত্র—অস্থিময় মৎস্যের ফুলকার অংশ-বিশেষ।